রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা

আদিত্য ওহদেদার

॥ এভারেস্ট বুক হাউস। কলিকাতা-৩০ ॥

প্রকাশক : শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ
ভারেষ্ট বুক হাউস
সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-৩০

প্রথম সংস্করণ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

সূচী

১ ।	১২৮০-১২৮৭ ,	১৮৭৩-১৮৮০	১
২ ।	১২৮৮-১২৯২ ;	১৮৮১-১৮৮৫	১৭
৩ ।	১২৯৩-১২৯৪ ,	১৮৮৬-১৮৮৮	২১
৪ ।	১২৯৫-১৩০০ ;	১৮৮৮-১৮৯৩	২৮
৫ ।	১৩০০-১৩০৬ ;	১৮৯৪-১৮৯৯	৩৪
৬ ।	১৩০৬-১৩০৮ ;	১৯০০-১৯০২	৪৭
৭ ।	১৩০৯-১৩১৩ ;	১৯০৩-১৯০৬	৫২
৮ ।	১৩১৪ ;	১৯০৭-৮	৬১
৯ ।	১৩১৫-১৩১৬ ;	১৯০৮-১৯১০	৬৭
১০ ।	১৩১৭-১৩১৯ ;	১৯১০-১৯১২	৭৩
১১ ।	১৩২০-১৩৩০ ;	১৯১৩-১৯২৩	১১২
১২ ।	১৩৩০-১৩৪০ ,	১৯২৪-১৯৩৪	১৫০
১৩ ।	১৩৪০-১৩৫০ ;	১৯৩৪-১৯৪৪	১৯৬
১৪ ।	১৩৫০-১৩৬০ ;	১৯৪৪-১৯৫৪	২৫২
	উপসংহার		২৯৩
	রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থপঞ্জী		৩০৯
	নির্দেশিকা		৩১৩

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার অন্যান্য বহু—বোধ করি অগণনীয়—ফলশ্রুতির মধ্যে একটি বিশেষ ফলশ্রুতি হল এই যে, এই সাহিত্য আমাদের দিয়েছে এক অবাধ সুযোগ এবং তারই সঙ্গে বিরাট দায়িত্ব-ও। রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের কাছে এক সুবিপুল চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ আহ্বান। এ আহ্বান হল বাংলাভাষায় সমালোচনা সাহিত্য গ'ড়ে তোলার। সমালোচনার জন্যে চাই সাহিত্য। উচ্চাঙ্গের সমালোচনার জন্যে চাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন সেই সাহিত্য; আর সেই সাহিত্যের কত না রূপ, কত না বিভাগ! এ সাহিত্যে আছে কবিতা ও গান; আছে উপন্যাস ও ছোটগল্প; আছে নাটক ও প্রহসন,—নাটকের মধ্যে আবার কাব্যনাট্য, রূপকনাট্য, নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য; আছে চম্পূ—গদ্য ও কবিতায় বোনা কাহিনী; আছে প্রবন্ধ, সমালোচনা, লোকসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্র। এইসব সাহিত্যসৃষ্টির সমগ্র রূপ, কিংবা তাদের আপন আপন বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে বোঝা ও বোঝানো, পাঠকচিত্তে তাদের রসাস্বাদের ক্ষেত্র প্রশস্ত করা—এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে আমাদের সমালোচনাকে। এই দায়িত্বপালনের দ্বারাই বাংলা-সমালোচনার মূল্য যাচাই হবে। রবীন্দ্রসাহিত্য হল আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের কষ্টিপাথর।

রবীন্দ্রসাহিত্যের শুরু থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনাও শুরু হয়েছে। যে সাহিত্য-সৃষ্টি যথার্থ শক্তিধর, যা মনকে নাড়ায়, চিত্তকে দোলায়, সে-সাহিত্য সম্পর্কে লোক উদাসীন থাকতে পারে না। তাকে নিয়ে আলোচনা হবেই। সাহিত্যের শক্তি অনুযায়ী পাঠকচিত্তে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং এই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতিভেদে সেই সাহিত্য সম্বন্ধে অনুকূল প্রতিকূল সব রকম বিচার-আলোচনা চলে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের আবির্ভাব অভিনব শক্তি-বিধৃত হয়ে দেখা দেয়। ভাষায় এবং ভাবে, গঠনে ও প্রকৃতিতে এবং বহু শাখায়িত বৈচিত্র্যে এ-সাহিত্য পূর্ব-গামী বাংলাসাহিত্যের আদর্শ, শিল্পকর্ম ও মর্মকেন্দ্র থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যে, দেশের রসশিক্ষা এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়—এ-সাহিত্যের

রসোপলব্ধি ও মূল্যায়ন করার ব্যাপারে একটা দিশাহারার ভাব দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান ও বৈচিত্র্যময় রবীন্দ্রসাহিত্য সমকালীন সুধীজনচিত্তে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারও ক্রমবর্ধমানতা ও বৈচিত্র্য বড় কম নয়। এই প্রতিক্রিয়া-জনিত যে অনুরাগ-বিরাগ এ-সাহিত্যকে ঘিরে দেখা দেয়, কী বিপুল তার তরঙ্গ, কী প্রচণ্ড তার আবর্ত। আজ তার অনেকটাই বিস্মৃতির কুক্ষিগত, এবং তার ইতিবৃত্ত বহুলাংশে ঔৎসুক্যের সামগ্রী।

কিন্তু সে ইতিবৃত্ত জানা প্রয়োজন, তাতে দেশের রসশিক্ষার ইতিহাস জানা যায়। রসশিক্ষার ওপর সমালোচনার দোষগুণ নির্ভর করে;—আমাদের রসশিক্ষার দ্বারাই আমাদের রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার গতি-প্রকৃতি নির্ণীত হয়েছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে।

বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার আদি বিকাশ থেকে হাল-আমল পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। হাল-আমলের সীমা হল বাংলা তেরশ ষাট সন পর্যন্ত। এই ইতিবৃত্ত মারফৎ বিগত সত্তর-আশী বৎসর ধ'রে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে দেশের সুধীজনচিত্তের প্রতিক্রিয়া তথা রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার অভিব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ করা সুবিধে হবে। আলোচনা বাংলাভাষায় লিখিত বইগুলির মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে। সুতরাং টম্‌সন সাহেবের বইও বাদ পড়েছে।

গ্রন্থের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে মূল সমালোচনার অংশ-বিশেষ যথেচ্ছা উদ্ধৃত করতে হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা-বিবরণীতে এমন উদ্ধৃতির একান্তই প্রয়োজন। তবে মূল থেকে যথাশক্তি সেই সব অংশই গৃহীত হয়েছে যা মূলের বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য অভিব্যঞ্জিত করে।

রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার এই পরিচয়-গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার কিছু সমীক্ষা ও মূল্যায়নও আছে। যে-সব ক্ষেত্রে সমালোচনা-পদ্ধতির দোষ-ত্রুটি দেখানো হয়েছে, তা যে ছিদ্রান্বেষী-দৃষ্টিসম্ভূত নয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই দোষ-ত্রুটি দেখাতে যে যুক্তি-বিচারের অবতারণা করা হয়েছে তার মধ্যে। এই সমীক্ষা ও মূল্যায়নের মধ্যে ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচকগণ আপন কর্তব্যের কিছু দিশা পেতে পারেন।

বাংলাভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ এই প্রথম। রবীন্দ্রসাহিত্য-পঠন-পাঠন ও সমালোচনার পক্ষে এমন একটা গ্রন্থের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে আশা করি এ কথা অনেকেই স্বীকার করবেন। বর্তমান গ্রন্থ যদি সেই প্রয়োজন কিছুটা মেটাতে পারে তাহলেই নিজের পরিশ্রম সার্থক মনে করব। অবশ্য এ গ্রন্থের অন্য কোনো মূল্য স্বীকৃত না হলেও এ গ্রন্থে সমাহৃত রবীন্দ্রসাহিত্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমালোচনার বিশিষ্ট উদ্ধৃতি ও তাদের কালানুগ পরিবেশন একটা বিশেষ মূল্য নিশ্চয়ই দাবী করবে, কারণ এই উদ্ধৃতিগুলির এইরূপ একত্র সমাবেশ থেকে একাধিক প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে যাঁদের মনে পড়বে ইংরেজিভাষায় লিখিত Shakespeare Criticism কিম্বা Chaucer Criticism জাতীয় গ্রন্থগুলি, তাঁদের কাছে এটাও আশা করি ধরা পড়বে বর্তমান গ্রন্থের সঙ্গে উক্ত ইংরেজি গ্রন্থগুলির মিল-অমিল কোথায়।

এ গ্রন্থ রচনার কাজে নানাভাবে, বিশেষ ক'রে নকলনবিশী ক'রে ও প্রুফ দেখে, সাহায্য করেছেন শ্রীমতী মিনতি ওহদেদার। লেখার চিন্তা যাতে সাংসারিক চিন্তার দ্বারা ব্যাহত ও খণ্ডিত না হয় সেদিকে তাঁর প্রখর সদা-জাগ্রত দৃষ্টিটাই আমার কাছে তাঁর দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়তা।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুশোভন সরকার 'পরিচয়' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা দেখতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। সহকর্মী শ্রীসত্যজিৎ দাশ আমাকে অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

বন্ধুবর সুলেখক শ্রীনিখিল সেনের জন্যেই এ গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যাপারে আমাকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা মুখের ভাষায় জানানো চলে না।

প্রকাশক শ্রীবিভূতি ঘোষ গ্রন্থটির সুষ্ঠু প্রকাশনের জন্যে যেভাবে কষ্ট ও যত্ন স্বীকার করেছেন তাতে সকৃতজ্ঞচিত্তে শুধু বিস্ময় বোধ করেছি।

কলিকাতা
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬

আদিত্য ওহদেদার

॥ ১ ॥

[১২৮০-১২৮৭ ; ১৮৭৩-১৮৮০]

কবির নিজের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। 'জীবন-স্মৃতি'তে কবি লিখেছেন, "আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ[১] আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যাম্‌লেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষরে যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

"পদ্য জিনিসটিকে এ পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে একথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না।...গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল তখন পদ্যরচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না।

"ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীলকাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।"

---

১ জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৯), গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী কাদম্বিনী দেবীর পুত্র।

এই হল কবির কবিতালেখার ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের আগেরও ইতিহাস থাকে। এক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই কবিতালেখার পূর্বে কবি তাঁর শিক্ষারম্ভের সময় পড়েছিলেন, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'।—"আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কাজের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

শিক্ষারম্ভকালে স্বতঃস্ফূর্ত এই কাব্যবোধই জ্যোতিঃপ্রকাশের অনুজ্ঞায় কবির রচনাশক্তি দানা বাঁধল।

এরপর চলল লেখা এবং সঙ্গে সঙ্গে লোককে ধ'রে শোনানো। কবির পরম সৌভাগ্য, এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে উঠলেন তাঁর দাদা[১]। তিনি ছোট ভাইয়ের রচনায় গৌরব অনুভব ক'রে সকলকে সে-সব রচনা শোনাতে লাগলেন। কবি সকৌতুকে এ বিষয়ে লিখে গেছেন, "হরিণ-শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। মনে আছে একদিন একতলায় আমাদের জমিদারি কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি এমন

---

১ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯-১৯২৩)।

সময় তখনকার 'ন্যাশানাল পেপার' পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিয়া কহিলেন, 'নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন না।' শুনাইতে বিলম্ব হইল না। কাব্যগ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারি হয় নাই। কবিকীর্তি কবির জামার পকেটে পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক এই তিনে-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন। পদ্মের উপর একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেটা দেউড়ির সামনে দাঁড়াইয়াই উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে, কিন্তু ঐ 'দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কী।"

কবির কাব্যচর্চার প্রথম উৎসাহদাতা হলেন তাঁর দাদা, আর প্রথম সমালোচক হলেন নবগোপাল মিত্র। সেদিন যে শব্দটার উপরেই সমস্ত কবিতার আশা ভরসা কবির ছিল, সে শব্দ নবগোপালবাবুকে লেশমাত্র দুর্বল করতে পারল না, বরং তার জন্যে তিনি হেসে উঠলেন—এতে কবির দৃঢ় বিশ্বাস হল, নবগোপালবাবু সমঝ্দার লোক নন। তাঁকে কবি আর কখনো কবিতা শোনান নি।[১]

বালক কবির লেখার বিরাম নেই। "সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল।" তাঁর কবি-খ্যাতি স্কুলে ছড়িয়ে পড়ল। স্কুল-শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত কবিকে উৎসাহ দেবার জন্যে প্রায়ই দুই এক পদ কবিতা দিয়ে তা পূরণ ক'রে আনতে বলতেন। কিন্তু এই স্নেহের চেয়ে গোবিন্দবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার ঘটনাটি ছিল আরও

১ জীবন-স্মৃতি।

মহত্ত্বপূর্ণ ও গৌরবমণ্ডিত। ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ এই গোবিন্দবাবু। ইনি ছিলেন স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্। ছেলেরা সকলেই এঁকে ভয় করত। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন ইনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ঘরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি নাকি কবিতা লেখো ?' নিজের কবিতালেখার কৃতিত্ব অন্যের কাছে কবুল করতে বালক কবির কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। গুরুগম্ভীর গোবিন্দবাবু বালককে আদেশ দিলেন একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে কবিতা লিখে আনতে। কবি পরদিনই লিখে আনলেন। গোবিন্দবাবু তাঁকে নিয়ে ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, পড়ে শোনাও।

সমালোচনা যা হল তা উল্লেখযোগ্য। "এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কবির প্রতি কিছুমাত্র সদ্ভাবসঞ্চার হয় নাই। অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল এ লেখা নিশ্চয়ই আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে।"

ঈর্ষাপ্রসূত এই সব মন্তব্যের মধ্যে বালকের কবিত্বশক্তিকে স্বীকার করাই হয়েছিল।

বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তির যে উন্মেষ হয়েছিল তা কোনো প্রতিকূলতা বা বিরুদ্ধাচরণের দ্বারা ব্যাহত হবার দুর্ভাগ্যে পতিত হয় নি। বরং তা অনুকূল পরিবেশ এবং স্নেহ ও উৎসাহের মধ্যে বেড়ে ওঠার সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা' ব'লে কবির রচনা ছাপা হয়। তারপর তাঁর নিজ নামে প্রথম ছাপা হয় 'হিন্দুমেলার উপহার'—দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়। এরপর থেকে ছাপার অক্ষরে বেরুতে থাকে লেখার পর লেখা। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হল বনফুল (আখ্যায়িকা কাব্য) ও প্রলাপ

(কবিতাগুচ্ছ)। পত্রিকাখানি সামান্য ছিল না। এতে যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেদিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামদাস সেন, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রভৃতি।

বালকের প্রতিভা বিকাশের সহায়ক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী—কবির নূতন বৌঠান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কবি জীবনসন্ধ্যায় লিখেছেন, "পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়ত ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হোত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হোত না।"[১]

বালক কবির শক্তিকে নিজের মতো বাড়তে দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সে শক্তিতে স্নেহবারি সিঞ্চন করেছিলেন কবির নূতন বৌঠান। তখন ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে কবি বিহারীলালের খুব সম্মান এবং সমাদর। কাদম্বরী দেবী তাঁর বিমুগ্ধ ভক্ত। তিনি আশা করতেন তাঁর পরম স্নেহের দেবর একদিন বিহারীলালের সমকক্ষ কবি হবেন।

বাইরেও বালক কবির সম্মান স্বীকৃত হয়েছিল। সেদিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নবীনচন্দ্র একদিনেই বুঝতে পেরেছিলেন বালক

---

১ আত্মপরিচয়, ১৩৫০, পৃ. ৮৯।

রবীন্দ্রনাথ একটি স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা। 'আমার জীবন'-এ তিনি এ সম্বন্ধে এক বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।—"স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনো উদ্যানে 'নেশনাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্বে আমার 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একজন সদ্যপরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নব-যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স[১] ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন, 'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।' তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোশাক। সহাসিমুখে করমর্দন কার্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই এক দিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়িতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি 'নেশনাল মেলায়' গিয়া একটি অপূর্ব নব-যুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয়বাবু

১ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রকৃতপক্ষে ১৫।

লিলেন—'কে ? রবি ঠাকুর বুঝি ? ও ঠাকুরবাড়ির কাঁচামিঠে যাব।' তাহার পর ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ। আমার ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হল 'কবিকাহিনী'। 'ভারতী'র ১ম বর্ষ ১২৮৪ পৌষ থেকে চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১২৮৫ সালে। তখন 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া প্রতিষ্ঠাপন্ন পত্রিকা বলতে 'বান্ধব'কেই বোঝাত। 'বান্ধব' ঢাকা থেকে বেরুত। সম্পাদক ছিলেন সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ। তিনি তাঁর কাগজে কবিকাহিনীর বিস্তৃত সমালোচনা করেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী থেকে কবি এই প্রথম খ্যাতিলাভ করেন।

কালীপ্রসন্নবাবু তাঁর সমালোচনায় বলেন, "শব্দে কবিতার গঠন, ছন্দে উহার ভঙ্গি কিংবা গতির ঠাম, কিন্তু ভাবগত রসই উহার প্রাণ। নিম্নলিখিত পদাবলীতে কবিতার শব্দ আছে ও ছন্দ আছে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা নাই। যথা—

আয়লো আলি, সবায় মিলি
কুসুম তুলি, মনের সুখে।

অথবা—

বকুল বনে আকুল মনে
দুকুল উড়ায় গোকুল চোরে।
বাজলো বাঁশী, গলায় ফাসি,
ঘরে আসি কেমন কো'রে।

এইরূপ ললিত পদাবলীতে শ্রুতিরঞ্জন হয়, কিন্তু মানবহৃদয়ের অন্তস্তল কখনও স্পৃষ্ট কিংবা আলোড়িত হয় না। বাঙ্গালি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তরলমতি বালিকাদিগের মত, এইরূপ পদাবলীরই ভক্ত এবং এই নিমিত্তই এদেশে ঈশ্বর গুপ্ত ও হরিশ মিত্র প্রভৃতি

ললিত-পদব্যবসায়িদিগের এত আদর ছিল। আর একশ্রেণীর পাঠক ললিত পদ অপেক্ষা পদ-বিন্যাসের মুন্সিয়ানা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারা 'আয়লো আলি কুসুম তুলি' শুনিবার জন্য অধীর হন না, এবং বকুল বনেও দুকুল উড়াইতেও ভালোবাসেন না। তাঁহাদের রুচি 'নিপট কপট শঠ লম্পট ঝম্পটে!' দাসুরায় তাঁহাদিগের কালিদাস, গোবিন্দ অধিকারী তাঁহাদিগের জয়দেব এবং বর্তমান কালের যাত্রাওয়ালাবর্গ তাঁহাদিগের কবিসম্প্রদায়। এই তিন শ্রেণীর পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনীতে অণুমাত্রও সুখানুভব করিবেন না। কিন্তু যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার নূতন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে। যে কবিতা ঘনান্ধ নভোমণ্ডলে দামিনীর মত রূপের ছটায় নয়ন ধাঁধা দেয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে কবিতা দৃষ্ট হইবে না। যে কবিতা প্রগল্‌ভা রসিকার মত আপনার ভারে আপনি ঢুলিয়া পড়ে, ইহাতে তাহার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু যে কবিতা, শিশির-সিক্ত কমল-কলির মত কথা না কহিয়াও মনুষ্য-হৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন করে; যে কবিতা ফোটে ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরিস্ফুট সৌন্দর্যে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়, এই কবিকাহিনীর প্রায় সর্বত্রই সেইরূপ প্রীতিময়ী পবিত্র কবিতা সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে। এদেশের কত সহস্র কবিই ভালবাসা প্রসঙ্গে কত সহস্র কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু কবিকাহিনীতে অতি অল্প কএকটি পংক্তিতে ভালবাসা কিরূপ বর্ণিত ও সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন।[১]...হিমাচল বর্ণনার আরম্ভভাগ নিম্নে তুলিয়া

১ কবিকাহিনীর অংশ উদ্ধৃত।

দিলাম। যাহাদিগের হৃদয় আছে, এবং হৃদয়ে প্রকৃতির প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি আছে, তাঁহারা এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মোহিত হইবেন।...[১]

"বাঙ্গালা কবিতার পঙ্কিল জলে এইরূপ নির্মল পুষ্প কি প্রীতিপ্রদ! ইহাতে সৌন্দর্য আছে, অথচ সে সৌন্দর্যে কোন অংশেও রুচির বিকার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে সৌরভ আছে, অথচ সে সৌরভে কোন অংশেও মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা নাই। ভাষা ইহার কোথাও শোভাবর্ধনের জন্য কৃত্রিম কারুকার্যে বিভূষিতা হয় নাই; এবং ভাব-লহরী ক্ষীণ-সলিলা পয়স্বিনীর ক্ষীণলহরীর মত, যারপরনাই মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইলেও, কোন স্থানে প্রাণ-শূন্য হইয়া পড়ে নাই। এইরূপ নির্মল কবিতায় অনুরাগ জন্মিলে বঙ্গীয় কাব্যশাস্ত্রের অধোগতি না হইয়া উপকার হইবে, এবং যাঁহারা কবিতায় ইদানিং বীতস্পৃহ, তাঁহাদিগের শুষ্ক মনেও কাব্যে পুনরায় প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকিবে।

"কবিকাহিনী-রচয়িতা অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় মাইকেলের ন্যায় সর্বত্র মিলটনের অনুসরণ এবং হেমবাবুর ন্যায় সংস্কৃত কবিদিগের ছন্দানুবর্তন না করিয়া, কোন কোন স্থানে কিয়ৎ পরিমাণে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যদি তাঁহার কবিতা সুন্দর না হইত, তাহা হইলে এইরূপ পদ্য কাহারও নিকট ভাল লাগিত না। কিন্তু তাঁহার যেমনই কেন না হউক, উহা কবিতার গুণে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে।"

এই প্রশংসমান সমালোচনা বালক কবির প্রতি নিছক স্নেহ বা অন্য কোনো পরিচয়ের খাতিরে করা হয় নি। ঢাকাস্থ কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না।

১ কবিকাহিনীর অংশ উদ্ধৃত

কবিকাহিনীকে সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করেই এ সমালোচনা করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা সত্যই প্রতিভা-স্বাক্ষরিত ছিল। সে রচনা নিজ গুণেই তৎকালীন সুধী রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কালীপ্রসন্নের সমালোচনায় বিশ্লেষণ করে দেখান হল কবিকাহিনীর বিশেষত্ব। সমালোচক মুগ্ধ হ'য়ে ঘোষণা করলেন কবিকাহিনীতে আছে প্রকৃত কাব্য, অল্প কথায় গভীর ভাব, ইঙ্গিত-আভাসের চিত্তহারী সৌন্দর্য। তখনকার পাঠকের বিকৃতরুচির পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা কতখানি নূতন ও উচ্চমানের তা যত্নের সঙ্গে দেখান হল, এবং কবিকে সাদরে স্বাগত জানানো হল। কবিকাহিনীতে ছন্দ নিয়েও যে পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তা সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় নি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র প্রচলিত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে অনুসরণ না ক'রে বালক কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের এক নূতন শ্রী নির্মাণ করেছেন—সমালোচক সে কথাও জানালেন।

মোট কথা, কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ অভিনবভাবেই অভ্যর্থিত হয়।

কবির যশ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। 'ভগ্নহৃদয়' কবির আঠার বৎসর বয়সের রচনা। এ লেখা সম্বন্ধে কবি স্বয়ং জীবন-স্মৃতিতে লিখে গেছেন, "তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়াটা অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে, এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন,

কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।”

কবি তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়ভাষণে ইঙ্গিত করেছেন যে ভগ্নহৃদয় তখনকার পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর জীবনীকার জানিয়েছেন, “ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্য রবীন্দ্রনাথকে সে যুগের যুবমহলে যশস্বী করিয়াছিল; অনেকে এই কাব্যের অংশ বিশেষ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইরূপ একজন সমসাময়িক যুবককে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে দেখিয়াছি, তিনি কাব্যের বহু অংশ আবৃত্তি করিয়া গেলেন।”[১]

কিন্তু এ কাব্য একজন বিদগ্ধ সাহিত্যরসিককে সন্তুষ্ট করে নি। তিনি হলেন প্রিয়নাথ সেন। তিনি নাকি এ লেখা পড়ে কবির সম্বন্ধে সকল আশা ত্যাগ করেছিলেন।[২] এঁর সমালোচনা তুচ্ছ করার নয়। এঁর সম্বন্ধে কবি জানিয়েছেন, “তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা।...তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি। এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।”[৩]

প্রিয়নাথ সেন কী বলেছিলেন জানি না। তাঁর মন্তব্য জানা গেলে এ কাব্য সম্বন্ধে তাঁর বিচারটা ধরা পড়ত। জীবন-স্মৃতিতে

১ রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড (১৩৫৩ সং), পৃ. ৯৬।

২ জীবন-স্মৃতি। ‘প্রিয়বাবু’ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩ জীবন-স্মৃতি। ‘প্রিয়বাবু’ পরিচ্ছেদ।

রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের মধ্যে ফেনায়িত হৃদয়াবেগের আতিশয্য সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলেছেন। সম্ভবত প্রিয়নাথ 'ভগ্নহৃদয়' পছন্দ করেন নি এ কাব্যের তীব্র উত্তেজনা ও হৃদয়াবেগের সংযমহীনতার জন্যে। অবশ্য এ আমাদের একান্তই অনুমান।

ভগ্নহৃদয়ের পর 'রুদ্রচণ্ড'। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা নাট্যরূপে কাব্য। কবির নাটক রচনার প্রথম প্রয়াস। এ লেখার যে সমালোচনা বান্ধব পত্রিকায় বের হয়, তার খানিক উদ্ধৃত করা গেল—"বাবু রবীন্দ্রনাথ এদেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম।···আমাদিগের বোধ হয় বাঙ্গালায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাশীতল, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না।"[১]

এ সমালোচনায় এমন ঘোষণা করা হল যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার অ-দ্বিতীয় কবি। কবির বয়স তখন বিশ বৎসর মাত্র। বাংলা কাব্যজগতের পরিস্থিতি তখন এইরকম।—হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার', নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' সবই সাত আট বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হ'য়ে গেছে। অবশ্য সারদামঙ্গল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে দু বৎসর আগে, কিন্তু গ্রন্থ-প্রকাশের পাঁচ ছ' বৎসর পূর্বে 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় এবং খ্যাতিলাভ করে। এতদিনে এই সব কাব্যগ্রন্থের খ্যাতিতে

১ বান্ধব, ১২৮৮, ৩য় সংখ্যা।

ভাটা পড়েছে, এবং এ তিনজন কবি তেমন অভিনব কিছু আর লিখতে পারছেন না। তাছাড়া এঁদের, বিশেষ ক'রে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য-প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকৃতির যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দিল। যে সব বিশেষণে রবীন্দ্র-কাব্যকে বিভূষিত করা হয়েছে সেগুলি এঁদের কাব্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না।

অর্থাৎ রোম্যান্টিক কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন।

কবি তাঁর বালকবয়সের রচনার দ্বারা সমকালীন সাহিত্যক্ষেত্রে যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কবিত্বশক্তিতে তাঁর সমকক্ষ হওয়া অন্যের পক্ষে দুষ্কর এমন কথা তখনকার সমালোচনায় জোর করেই জানানো হল! কিন্তু একালে যে দুটি রচনায় তাঁর প্রকৃত অভিনবত্ব ছিল—সে বিষয়ে তখনকার কোনো সমালোচক সচেতন হন নি। এ দুটি রচনা হল 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'।

ঠাকুরবাড়িতে স্থাপিত 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'র বার্ষিক অধিবেশনে ১২৮৭, ১৬ই ফাল্গুন বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনীত হয়। উপস্থিত বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন। নাটকের অভিনয় সকলের ভালো লাগে। তখনকার এক প্রতিষ্ঠাবান কবি রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর ভালো লাগা প্রকাশ করলেন আর্যদর্শন পত্রিকায় কবিতা লিখে।[১] গুরুদাস রচনা করেন একটি গান।—

উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।

---

১ বালিকা-প্রতিভা। আর্যদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ। কবিতাটি বিশেষভাবে রচিত হয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভার অভিনয় দর্শনে।

উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভ'রে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর।[১]

সাহিত্যক্ষেত্রে বাল্মীকি-প্রতিভা অন্যের রচনার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল বঙ্গদর্শনের সমালোচক এমন কথা জানিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সদ্য প্রকাশিত 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হল, "যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকি-প্রতিভা পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রবাবুর অনুগমন করিয়াছেন"।[২]

কিন্তু সঙ্গীতে ও নাট্যের দিক থেকে বাল্মীকি-প্রতিভায় কবি যে অভিনবত্ব এনেছিলেন—যার কথা জীবন-স্মৃতিতে কবি নিজে বিস্তারিত বলেছেন—সে দিক থেকে কোনো রসবিচার সেদিন হয় নি। তার কারণ এমন বিচার করতে গেলে যে রসশিক্ষার প্রয়োজন তা তখনো জাগ্রত হয় নি।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের বেলাতেও সেই কথা। এই পত্রধারা যখন ভারতীতে বের হয় (১২৮৬) তখন তা নানা দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবশ্য পত্রের বিষয়বস্তুর জন্যই এই

---

১ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষের জয়ন্তী উৎসবের সময়ে (১৩১৮, মাঘ ১৪) গুরুদাস এই গান জনসমাজে প্রকাশ করেন।

২ বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, আশ্বিন। এ সমালোচনা যে বঙ্কিমচন্দ্রের তা অনুমান করা যায়।

প্রতিক্রিয়া। যেমন, তখনকার ইঙ্গ-বঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি কবির তীব্র কটাক্ষের জন্য সমসাময়িক বিলাত-ফেরতাদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ এবং য়ুরোপীয় স্ত্রী স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি তরুণ কবির আসক্তি ও সে বিষয়ে নিজের অনুকূল মত ঘটা করে প্রকাশ করায় বাড়ির অভিভাবকশ্রেণীর সঙ্গে বিরোধ। কনিষ্ঠের এই সব মতের প্রতিবাদে জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের দীর্ঘ মন্তব্য পত্রধারার পাদটীকা হিসেবে ভারতীর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে।

এই রচনার বিষয়বস্তুর দিকে সমস্ত নজর ছিল বলে এর আকৃতিগত অভিনবত্বের দিকটা কারো চোখে ধরা পড়ে নি। গ্রন্থ হিসেবে এ রচনা যখন প্রকাশিত হয় (১২৮৮) তখন ভূমিকায় এ রচনার ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েই লেখক জানিয়েছিলেন, "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিৎ সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে! আত্মীয়স্বজনের সহিত মুখামুখী এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।" ভাষার এই নূতনত্বের দিকটা সেদিন কোনো সুধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি কেন—ভাবতে বিস্ময় লাগে। ভাষার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একদা বলেছেন, "নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। ......বাংলা চলতি ভাষায় সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।[১]

বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষার এই প্রথম ও সফল প্রয়োগ সম্বন্ধে সেদিন কেউ সজাগ হলে, এবং এ বিষয়ে একটু আন্দোলন হলেই বাংলাসাহিত্যে চলতি ভাষার চলন 'সবুজপত্রে'র বহু পূর্বেই দাঁড়িয়ে

পাশ্চাত্য ভ্রমণ।

যেত, এমন ধারণা অনায়াসে করা চলে। কিন্তু সেদিনের সমালোচনা এই বিষয়ে কোনো সূক্ষ্ম রসদৃষ্টির পরিচয় দেয় নি।

তবে রবীন্দ্রনাথের তখনকার সাহিত্য-সাধনার পেছনে যে বিদেশী প্রভাব ও অনুপ্রেরণা ছিল সেটা সমকালীন সমালোচনায় উল্লিখিত হয়েছিল। 'রুদ্রচণ্ডে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়ট্ জানালেন যে লেখক ইতিপূর্বে বিলেত গিয়েছিলেন এবং তাঁর বিলেত দেশ ও বিলেতের অধিবাসীদের প্রতি গভীর প্রীতি আছে। নিশ্চয়ই 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' এ মন্তব্যের কারণ। তবে সমালোচক একথা জানালেন যে কবি বিদেশী ফুলবনমধু আহরণ করছেন ঘরের সঞ্চয় সমৃদ্ধ করবার জন্যে, কিন্তু তাঁর রচনায় বিজাতীয়তার ভাব নেই।—"He is culling honey from foreign flowers to enrich his home, but is quite national in his tone and feeling."[১]

১ Hindu Patriot, May 23, 1881.

॥ ২ ॥

[১২৮৮-১২৯২ ; ১৮৮১-১৮৮৫]

রচনা ঃ

সন্ধ্যাসঙ্গীত	১২৮৮	১৮৮২
কালমৃগয়া	১২৮৯	১৮৮২
(জোড়াসাঁকোভবনে বিদ্বজ্জন সভার অধিবেশন উপলক্ষে ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮২, অভিনীত হয়)		
বৌঠাকুরাণীর হাট	১২৯০	১৮৮৩
প্রভাত সঙ্গীত	১২৯০	১৮৮৩
বিবিধ প্রসঙ্গ	১২৯০	১৮৮৩
ছবি ও গান	১২৯১	১৮৮৪
প্রকৃতির প্রতিশোধ	১২৯১	১৮৮৪
নলিনী	১২৯১	১৮৮৪
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	১২৯১	১৮৮৪
(১২৮৪-১২৮৮, ১২৯০ সালের ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত)		
রামমোহন রায়	১২৯২	১৮৮৫
আলোচনা	১২৯২	১৮৮৫
রবিচ্ছায়া	১২৯২	১৮৮৫

সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনাকে স্বীকার করেন। এর আগের রচনাগুলি প্রথম প্রকাশের পর কবির ইচ্ছায় অচলিত হয়ে যায়। কারণ, কবির ধারণায় এগুলিতে তাঁর কল্পনা ও শক্তির স্বাধীনবৃত্তির পরিচয় নেই—এগুলি পরমুখাপেক্ষী হয়ে লেখা। বিশেষ ক'রে তাঁর জ্যোতিদাদা ও তাঁর নূতন বৌঠান যাঁর আদর্শ ছিল বিহারীলালের রচনা,—এঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছাঁচে কবির কাব্য-রচনার সংস্কার গড়ে উঠেছিল। এই সংস্কারের মধ্যে কবির নিজস্বতা চাপা পড়ে ছিল।

কী করে কবি তাঁর নিজস্বতা প্রাপ্ত হলেন তার মনোজ্ঞ বিবরণ জীবন-স্মৃতিতে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন "এক সময়ে জ্যোতি-দাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতলার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

"এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনায় যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেইসকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।"

কবি এখন শ্লেট নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করলেন। কারণ, "শ্লেট জিনিসটা বলে, ভয় কী তোমার, যাহা খুশি তাহাই লেখো না হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।" এমনি করে দুএকটা কবিতা লিখতেই কবির মনের মধ্যে ভারী আনন্দ উপস্থিত হল।—"আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।"

মনের এই স্বাধীন আবেগে সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলি রচিত হয়। ছন্দসম্বন্ধেও কবি স্বাধীনতা অর্জন করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা খালের মতো সিধা চলে না—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল।" কবি পূর্বে বিহারীলাল প্রবর্তিত তিনমাত্রার ছন্দ বেশি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যাসঙ্গীতে এ ছন্দ তিনি পরিত্যাগ করেন। "সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।"

এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবি বলেছেন, "কাব্যহিসাবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব, মূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে না। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি।"

কবির এই যা খুশি তাই লেখা পড়ে ভারি খুশি হ'য়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন কবির বাল্য বয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী। এবং এই লেখা দিয়েই কবি 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন যিনি ইতিপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়ে কবির সম্বন্ধে সকল আশা ত্যাগ করেছিলেন—তাঁর মন জিতে নিলেন।

এই কাব্যগ্রন্থের জন্যেই কবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে প্রগাঢ় অভিনন্দন লাভ করেন। কবি নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন।—রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা কমলার সেদিন বিবাহ (১৮৮২, জুন-জুলাই) প্রমথনাথ বসুর সহিত। বিবাহ সভার "দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন। রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য—রমেশ তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ ?' তিনি বলিলেন, 'না।' তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্র বৌঠাকুরাণীর হাটেরও প্রশংসা করেন। বৌঠাকুরাণীর হাট রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থকারে প্রকাশিত উপন্যাস।[২] বঙ্কিমচন্দ্র

১ জীবন-স্মৃতি, পৃ. ২২৩।

২ ইতিপূর্বে 'করুণা' নামে একটি উপন্যাস ভারতীতে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্ন করক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিজে নিন্দে করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলো।...তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"[১]

নিজস্বতার ওপর ভর ক'রে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই যা লিখলেন তা তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার দ্বারা অভিনন্দিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলার মালা রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দিয়ে আগামী দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে বরণ করলেন।

[১] রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড (৪র্থ সং), পৃ. ৩৭৩।

॥ ৩ ॥

[১২৯৩-১২৯৪ ; ১৮৮৬-১৮৮৮]

রচনা ঃ

কড়ি ও কোমল	১২৯৩	১৮৮৬
রাজর্ষি	১২৯৩	১৮৮৭
চিঠিপত্র	১২৯৩	১৮৮৭
সমালোচনা	১২৯৪	১৮৮৮
মায়ার খেলা	১২৯৪	১৮৮৮

এতদিন কবি তাঁর রচনার জন্য অগাধ খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, সম্মান এবং সাহিত্যক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে উৎসাহ অভিনন্দন পেয়ে এসেছেন কিন্তু 'কড়ি ও কোমল'-এ এসে প্রথম বিরূপতার সম্মুখীন হলেন। ইতিপূর্বে চন্দ্রনাথ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মসীযুদ্ধ চলেছিল (১২৯১), কিন্তু তা সাহিত্য সম্পর্কিত ছিল না, তা ছিল হিন্দুধর্ম সংস্কার ও আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে উভয়পক্ষের মতবাদের জন্য। কিন্তু এবার কাব্য ও রচনাদর্শই হল বিরোধের বিষয়বস্তু।

রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমলের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কাব্যচর্চার পর্বকে বলেছেন বর্ষার দিন, আর কড়ি ও কোমলের কালকে শরৎ। —"আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রং নহে সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।"[১]

---

১ জীবন-স্মৃতি, পৃ. ২৮৪।

বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে কবিকল্পনার কপালে জুটল বেশ কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা।

প্রথমে কবির কাব্যকে পরোক্ষে ব্যঙ্গ করলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার—'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি নবজীবন, ১২৯৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'কাব্যি-সমালোচনা' নামে এক নিবন্ধে জানালেন, "কল্পনা কি ছায়াময়ী? আমি ত বলি, কল্পনা সুস্পষ্ট-অবয়ব, সুদৃষ্ট-ভঙ্গিমতী এবং উজ্জ্বল-বর্ণা। কল্পনার প্রিয় সহচরী কবিতাও ত ছায়াময়ী নহে; তবে তোমরা এরূপ কুয়াসার কুহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গসাহিত্য গো-ধূলি গোধূলি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন?"

রবীন্দ্রনাথকে তখন বাংলার শেলী বলে অভিহিত করা শুরু হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র এর পরে যা লিখলেন তা যে কা'র ওপর প্রযোজ্য সহজেই অনুমেয়। "তোমাদের কথায়, শেলির সেই নদীগর্ভে নৌকার উপর ন-পুং ন-স্ত্রী জীব সৃষ্টি মনে পড়ে। তোমাদের গুরুভক্তি ধন্য; তোমাদের মহাগুরুর আদর্শ—তোমাদের কবিতার সর্বত্রই বিরাজমান। তোমাদের উচ্ছ্বাস—ন কাব্য, ন কবিতা। কেবল কাব্যি। না মরদ, না মহিলা। কেবল কাব্যি।···

"শেলি শেলি, শেলি—কেবল শেলির দোহাই দিয়া কি এই কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জনের পরিপুষ্ট ও পরিত্যক্ত অপূর্ব সাহিত্য-সম্পত্তি নষ্ট করিবে?"

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দেন ভারতী ১২৯৩ চৈত্র সংখ্যায় 'কাব্য, স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' প্রবন্ধে। তিনি বলেন, "ভাবগম্য সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে অধিকাংশ লোক সাহিত্যকেই দোষী করে। ···কাব্যে অনেক সময় দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না কেবল লক্ষ্য করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এইপ্রকার

ভাষাকে কেহ বলেন 'ধুঁয়া', কেহ বলেন ছায়া, কেহ বলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা, এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে 'কাব্যি' নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি অথবা নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।'

"অত্যন্ত স্পষ্ট কবিতা নহিলে যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা স্পষ্ট কবিতার একটি নমুনা দিয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিকাসমেত উদ্ধৃত করি। 'বাঙ্গালার মঙ্গল কাব্যগুলিও জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণের দারিদ্র্য দুঃখ বর্ণনা—যে কখন দুঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

'দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।'

এ দুটি পদের ভাষ্য করিয়া লেখক[১] বলিয়াছেন,—'ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা; সার্থক প্রতিভা।' পড়িয়া সহসা মনে হয় এ কথাগুলা হয় গোঁড়ামি, না হয় তর্কের মুখে অত্যুক্তি। আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতেও পারে কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়। দুটো ছত্র কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই। ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয়, তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে', সে ত আরও কবিত্ব।"

বাংলা পুরনো কবিতায় ভাষার অস্পষ্টতা, এমন কি অর্থের দোষ থাকতেও কবিতার কাব্য-প্রসিদ্ধি লাভ করতে ব্যাঘাত ঘটে নি সে-কথাও কবি জানালেন, "বলরাম দাস লিখিয়াছেন—

১ অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

'আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।'

ইহাতে যে কেবল ভাষার অস্পষ্টতা তাহা নহে—অর্থের দোষ। 'আধ চরণ' অর্থ কি? কেবল পায়ের আধখানা অংশ? বাকি আধখানা না চলিলে সে আধখানা চলে কি উপায়ে? একে ত আধখানি চলনি, আধখানি হাসি, তাহাতে আবার আধখানা চরণ; এগুলো পুরা করিয়া না দিলে এ কবিতা হয়ত অনেকের কাছে অসম্পূর্ণ ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে যা বলুক—উপরিউদ্ধৃত দুটি পদে পরিবর্তন চলে না। 'আধ চরণে আধ চলনি' বলিলে ভাবুকের মনে যে একপ্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।"

পরিশেষে কবি আত্মপক্ষ সমর্থনে জানালেন, "বুদ্ধিমানের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ন্যায় প্রকৃতিতে যে সমস্তই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার তাহা নহে। সমালোচকেরা যাহাই মনে করুন প্রকৃতি অতিবৃহৎ, অতিমহৎ, সর্বত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেক্ষা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রমাণের অপেক্ষা অপ্রামাণ্যই অধিক। অতএব যদি কোন প্রকৃত কবির কাব্যে ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুদ্ধিমান সমালোচক যেন ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে তাহা এই অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী রহস্যচ্ছায়া।"

কাব্যে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট নিয়ে এই যে লেখালেখি এর পেছনে ছিল ক্লাসিক্যাল ও রোম্যান্টিক আদর্শের বিরোধ। অক্ষয়চন্দ্র ক্লাসিক্যাল আদর্শে বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্র-কাব্যে পেলেন অস্পষ্টতা, ধোঁয়া ও ছায়া। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও কবিকঙ্কন-মুগ্ধ সমালোচক ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাময় ভাবগর্ভ প্রকৃত কবিতাকে 'কাব্যি' বলে ব্যঙ্গ করলেন।

এরই বৎসরখানেক পরে প্রকাশিত হল কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের 'মিঠেকড়া' (১৮৮৮)। কাব্যবিশারদ মশাই 'রাহু'

ছদ্মনামে কড়ি ও কোমলের কয়েকটি কবিতা প্যারডি ক'রে এই পুস্তিকা ছাপালেন। আখ্যাপত্রে সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হল, 'ইহা কড়িও নহে, কোমলও নহে, পূরো সুরে মিঠেকড়া।' প্যারডিগুলিতে রবীন্দ্র-কাব্যের নিন্দার ঢাক পেটানো হল। এ ঢাকের আওয়াজ চারিদিকেই বেশ ছড়াল। পুস্তিকার মূল্য মাত্র এক আনা। এমন স্বল্প মূল্যে মুখরোচক কিছু খাদ্য যদি পাওয়া যায়, তার হু-হু কাটতি রোকে কে। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসকার জানিয়েছেন, "যাহাদের চোখে কখনো কড়ি ও কোমল পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না তাহারাও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নিতান্ত তুচ্ছ 'মিঠেকড়া'র নাম শুনিয়াছিল।"[১]

কালীপ্রসন্ন লিখলেন,

উড়িস্‌নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোর বক্ বকম্ আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা!
তাও ছাপালি, গ্রন্থ হলো
নগদ মূল্য এক টাকা!!

ইনিও স্পষ্ট কাব্যের পক্ষপাতী। তাই কবির 'পুলক নাচিছে গাছে গাছে'[২] পংক্তিকে প্যারডি করা হল—

মানুষের মনে মনে
এতদিন ছিলে ভাল।
কেনরে পুলক আজ
তোমার এ দশা হলো?

১ সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ১৩৫৯, পৃ. ৪৮।

২ 'যোগিয়া' কবিতা (কড়ি ও কোমল, ১ম সং)।

কবির লেখনি অগ্রে
কি জানি কি শক্তি এ যে!
গাছে গাছে নেচে নেচে
ভ্রমিতেছ যার তেজে !!

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃতি কিরূপ তা জানানো হল—

না হয় না হবে মানে
রস চাই—কবিতার।
মিষ্টি হলে বেঁচে যাই
ভাবনা থাকে না আর।

গ্রাম্য কথা শুদ্ধ কথা,
একত্র মিলায়ে ধরে'
শকটচড়া, গাড্যারোহণ
গড়িব সমাস করে'।

কিন্তু তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ তখন যে বাংলাসাহিত্যে একটা আদর্শের স্থান করে নিয়েছেন তার স্বীকৃতি এই প্যারডিতেও আছে—

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ
বঙ্গের আদর্শ কবি।
শিখেছি তাঁহারি দেখে
তোরা কেউ কবি হবি ?

মিঠেকড়ার উত্তর দেন রবীন্দ্র-ভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। তিনি 'কাকাতুয়া দেবশর্ম্মা' ছদ্মনামে 'সাহিত্যে'র ১২৯৮, আষাঢ় সংখ্যায় 'রবিরাহু' নামে কবিতায় লেখেন—

…বায়স কহিল হর্ষে, "শোন পক্ষী সব,
আম্রের মদিরা-পিয়ে ওই যে ডাকিছে,
উহু! উহু! শুনে ওর কুহু কুহু রব,
আমার বায়স-প্রাণ ফাটিয়া যাইছে!"

এখানে বলা প্রয়োজন কাব্যবিশারদ কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রকেও ছাড়েন নি। তাঁর 'বঙ্গীয় সমালোচক (কাব্য)'[১]-গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রকে কুৎসিত গালাগালি দিয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন ছিলেন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের শিষ্য, এবং কিছুদিন সোমপ্রকাশের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। এই সোমপ্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের দলকে 'শব-পোড়া মড়াদাহের দল' বলে ব্যঙ্গ করত। বঙ্কিমচন্দ্রও সোমপ্রকাশের দলকে 'ভট্টাচার্যের চানা' বলে ব্যঙ্গ করতেন।[২] সোমপ্রকাশ-ঐতিহ্যে পুষ্ট কালীপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের সর্বতোভাবে নূতন কবিতাকে ব্যঙ্গ করবেন, বিচিত্র কি !

১ ১২৮৭।

২ শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

॥ ৪ ॥

[১২৯৫-১৩০০ ; ১৮৮৮-১৮৯৩]

রচনা ঃ

রাজা ও রাণী	১২৯৬	১৮৮৯
বিসর্জন	১২৯৭	১৮৯০
মানসী	১২৯৭	১৮৯০
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ১ম খণ্ড	১২৯৮	১৮৯১
চিত্রাঙ্গদা	১২৯৯	১৮৯২
গোড়ায় গলদ	১২৯৯	১৮৯২
গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা	১৩০০	১৮৯৩
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ২য় খণ্ড	১৩০০	১৮৯৩

করলেন। তাঁর এইকালীন মানস-দশার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙ্গার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙ্গাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন।'[১]

কবি জীবনের মর্মে প্রবেশ করে লিখলেন নাটক ও কবিতা। প্রশংসা পেতে বিলম্ব হল না। সম্ভ্রান্ত মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সাহিত্য, ১২৯৮ বৈশাখ সংখ্যায় লিখলেন 'মানসী এবং রাজা ও রাণী' প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী হিসেবে তিনি নাম নিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল ও ঈশানচন্দ্রের।

১ জীবন-স্মৃতি।

তারপর লিখলেন—"ইঁহাদের পর রবীন্দ্রবাবুর নূতন সৃষ্টি; ইনি বঙ্গসাহিত্যের গলে পারিজাত পুষ্পের হার প্রদান করিয়া কর্ণে যেন দুইটি সহকারমঞ্জরী পরাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে যেন আধ-আলো আধ-ছায়া, আধ-স্বর্গ, আধ-মর্ত্ত্য দেখিতেছি। ইঁহার 'মানসী' পাঠ করিতে করিতে চোখের সম্মুখে যেন একখানি স্বপ্নরাজ্য ভাসিয়া আসে; পুস্তক, স্থান, কবিতা, সমস্ত ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া যাইতে হয়; আমরাও যেন দীর্ঘশুভ্র পাখা খুলিয়া রাজহংসের মত অপার আকাশে ভাসিয়া যাইতেছি, মনে হয়। ইঁহার কবিতার প্রাণ অতৃপ্তি, মানবজীবনও অতৃপ্তি; তাই বুঝি রবীন্দ্রবাবুর কবিতার সহিত পাঠকের প্রাণের সুর এত মিলিয়া যায়।"

'রাজা ও রাণী'র সপ্রশংস বিশ্লেষণ ক'রে লেখিকা জানালেন, "বস্তুতঃ, 'রাজা ও রাণী' ভাবের গাম্ভীর্যে, শব্দমাধুর্যে ও পূর্ণ-প্রাণতায় সাহিত্য-সংসারে একখানি উচ্চদরের গ্রন্থ। আমরা রবীন্দ্রবাবুর নিকট এক্ষণে গীতিকবিতা অপেক্ষা এইরূপ গ্রন্থের অধিক আশা করিয়া থাকি।"

'রাজা ও রাণী' পাঠক সমাজে রীতিমত সাড়া আনে। এ নাটক সম্বন্ধে পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু আলোচনা দেখা দেয়। একজন লেখক সপ্রশংস আলোচনায় জানালেন "রাজা ও রাণীর নায়ক-নায়িকা চরিত্র ভিন্ন সকল চরিত্রগুলিই সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।" রচনারীতির প্রশংসায় জানালেন, "সকল স্থান পড়িতে পড়িতে এত মুগ্ধ হইতে হয় যে, একবার, দুইবার, দশবার পড়িলেও তৃপ্তি হয় না, আবার পড়িতে ইচ্ছা করে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার রচনার একটা সমকালীন উল্লেখযোগ্য

---

১ রাজা ও রাণী—অনুশীলন, শৈলেন্দ্রনাথ সরকার। প্রয়াস, ১৮৯৯, জুলাই-আগষ্ট।

আলোচনা পাই নিত্যকৃষ্ণ বসুর ডায়েরীতে। নিত্যকৃষ্ণ সেকালে একজন বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবক ছিলেন। এঁর ডায়েরী লিখিত হয় ১৩০০ থেকে ১৩০২ সালের মধ্যে, যদিও তা ছাপা হয় বছর সাত আট পরে 'সাহিত্য' পত্রিকায়। 'রাজা ও রাণী' প্রসঙ্গে ইনি জানালেন, "রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের আলোচনা প্রায়ই' করিয়া থাকি।...সমগ্র পুস্তকের মধ্যে চারিটি কি পাঁচটির বেশি ভাল এবং spirited passage নাই। আমি সেই চারিটি পাঁচটি স্থল সর্বদাই পড়িয়া থাকি।"[১] নাটকের চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল, "রাজা ও রাণীর অধিকাংশ চরিত্রই কতকটা রহস্যময়। যেন আগা-গোড়া সঙ্গতি নাই।...আমরা বিক্রমকে অব্যবস্থিতচিত্ত দেখিবার আশা করি নাই। কুমার সেনের চিত্রও এইরূপ অসঙ্গত। বাহুবল ও প্রেমবলের আধার বীর কুমার সেনের মুণ্ডটা যে আমরা অবশেষে একটা থালের উপর আম জামের "তত্ত্বের" ন্যায় দেখিব, এমন আশা করি নাই। আর সুমিত্রা যে শেষে ভাতৃহত্যারূপ একটা মহাপাপ করিবে, ইহাও নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যক। নাটক লিখিতে হইলে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির প্রয়োজন। রবীন্দ্রবাবু আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার চরিত্রগুলিতে তাঁহাকেই ছদ্মরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।"[২]

সমালোচক তাঁর শেষ কয়টি কথায় নাট্য-কল্পনার মূল সূত্রের উল্লেখ করেছেন, এবং তাঁর বিচারে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা নাট্যোপযোগী বিষয়মুখীতায় সার্থক হয়ে ওঠে নি।

নিত্যকৃষ্ণ তাঁর ডায়েরীতে আর একটি বিশেষ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, তা হল এই নাটকের ভাষা ও তার ছন্দ। তাঁর মতে,

১ সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী। সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩১০, পৃ. ৪৭২

২ ঐ, পৃ. ৪৭৬-৭।

"রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর অধিকাংশ স্থলেই চতুর্দশাক্ষরপরিমিত মাপকাটির সাহায্যে কাটিয়া লওয়া সাধারণ গদ্য মাত্র। বাক্যের আরম্ভ এবং শেষ সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই দৃষ্টিহীন। মাঝখানটাকেও সব সময়ে বাদ দেওয়া যায় না। স্বীকার করি, গল্পের গদ্যময় সামান্য অংশগুলাকে কাব্যের ভাষায় আবৃত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। আর অসম্ভব না হইলেও তাহা সর্বস্থলে বাঞ্ছনীয় নহে। উহাতে ভাষা যেন কতকটা কৃত্রিম (affected) হইয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস যে, কবি সাবধান হইলে উভয় দিক বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন।"[১]

এই ডায়েরীতে চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। আলোচনাটি সংবেদনশীল। ভাষা ও ভাব উভয় দিক থেকেই লেখক এই রচনার প্রশংসা করেছেন।—"ইহার স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বিষয়টিও বেশ চিত্তাকর্ষক। মহাভারতের মহাকবির অমর চরিত্র দুইটিকে কোনও অংশে হীন না করিয়া, কবি ইহাদের উপর আপনার কবিত্ব ও গুণপনার বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম যখন গ্রন্থখানি পাঠ করি, মনে হইয়াছিল, ইহার বুঝি কোনও প্রকার গূঢ় উদ্দেশ্য নাই;—কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্রের সমাবেশ। কিন্তু পুনর্বার পাঠ করিয়া আমার ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল। কবি ইহাতে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের একটি ইতিহাস বর্ণিত করিয়াছেন। প্রেমের মূলে যে সৌন্দর্যানুভূতি ও আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল, ইহাতে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যে মানুষের মন বেশী দিন শান্তিলাভ করিতে পারে না। আর সে শোভা স্থায়ীও নহে। প্রেমিক স্বীয় বাঞ্ছিতের শারীরিক সৌন্দর্যোপভোগে অতি অল্প দিবসেই নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে,

---

১ ঐ, পৃ. ৪৭২

আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, কর্মহীন বিলাসলীলা প্রেমের আদর্শ নহে ; কর্তব্যপালনের পথে সাহচর্যই ইহার চরম উদ্দেশ্য। ইহাই প্রেমের বিষম পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে দম্পতী তাঁহাদের মিলন বজায় রাখিতে পারিলেন, তাঁহারাই ধন্য।' কারণ, 'শ্রান্তিহীন সে মিলন চিরদিবসের।' এইরূপে প্রথমতঃ সৌন্দর্যের মোহ, যৌবনের ভ্রান্তি, উপভোগের অরুচি, তৎপরে 'ভূষণবিহীন' সত্যের অভ্যুদয়, ইহাই প্রেমের প্রকৃত ইতিহাস। যে কবি এই মহান ইতিহাস এমন সুন্দর ও মধুর করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তিনি সহস্র সাধুবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

"ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাল,
তখন প্রকাশ পায় ফল।"—

এই একটিমাত্র বাক্যে সমগ্র গ্রন্থের উপদেশ নিবদ্ধ রহিয়াছে।"[১]

১৩০০ সালে সাহিত্য পত্রিকায় মানসীর আলোচনা করেন প্রিয়নাথ সেন, মানসীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রকৃত কাব্যরস-বোধের পরিচয় দিয়েছেন এই আলোচনার প্রতিটি ছত্রে। তিনি জানালেন, "আমাদের বিবেচনায় মানসী একখানি অতি উৎকৃষ্ট, অপূর্ব গ্রন্থ। অপর কোনও ভাষাতে এরূপ একখানি গ্রন্থের ভিতর এত উচ্চদরের অথচ বিভিন্ন প্রকৃতির এতগুলি কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কুড়ি বৎসরের ভিতর ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় এমন কোনও কবিতা-পুস্তক দেখিয়াছি কি ?

"মানসীর ভাষা এবং ভাব—যেন একই ছাঁচে একেবারে প্রকৃতির হাত হইতে বাহির হইয়াছে।······এই কবির ভাব ও ভাষা যেন

১ সাহিত্য, ১৩১১, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৩-৪।

এক সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ সৃষ্টির হৃদয় হইতে তাঁহার হৃদয়-মধ্যে যে সৌন্দর্যের বার্তা আসিয়াছে, তাহা একেবারে কবিত্বের আকার ধরিয়াই আসিয়াছে। সেইজন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ আহরণ করিতে হয় নাই—ভাবপ্রকাশের জন্য ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই।···

"মানসীতে তাঁহার ছন্দ-রচনা-ক্ষমতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি নূতন মিল, নূতন মাত্রা, নূতন পদ-বিভাগ, যতি-সংস্থাপন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নূতন ছন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার সুপ্ত অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, এবং আরও বিস্ময়কর ব্যাপার—পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন।··· মানসীর উত্তরার্ধে মিত্রাক্ষর পয়ারে যে সকল কবিতা আছে (মেঘদূত, অহল্যা-বিদায়) তাহাদেরও ঠিক এইরূপই প্রশংসা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক এইসকল কবিতায় রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালা পয়ারকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, তিনি তাহাকে অভিনব জীবন প্রদান করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত তাঁহার নিজের সামগ্রী। তাঁহার পূর্বে কোন বঙ্গীয় কবি এইরূপে পয়ার রচনা করেন নাই। তাঁহার হস্তে ইহা এক অপূর্ব জীবন্ত দর্পিত গতি লাভ করিয়াছে। কবিতার তীব্র স্রোতে একটি চরণ কেমন আর একটির উপর তরঙ্গায়িত হইয়া উছলিয়া পড়িয়াছে।······রবীন্দ্রবাবুই এই প্রথমে বাঙ্গালা মিত্র পয়ারের পায়ের বেড়ী খুলিয়া দিলেন, এবং তাহাতে যে বাঙ্গালা সাহিত্যের বল এবং সৌন্দর্য কতদূর বর্ধিত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাকেই বলে প্রতিভার বিক্রম।"

॥ ৫ ॥

[১৩০০-১৩০৬ ; ১৮৯৪-১৮৯৯]

রচনা ঃ

সোনার তরী	১৩০০	১৮৯৪
ছোটগল্প	„	„
বিচিত্র গল্প	১৩০১	„
কথা-চতুষ্টয়	„	„
গল্প-দশক	১৩০২	১৮৯৫
নদী	„	১৮৯৬
চিত্রা	„	„
কাব্য-গ্রন্থাবলী [সত্যেন্দ্রপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত]	১৩০৩	„
[এই গ্রন্থাবলীতে 'চৈতালি' প্রথম প্রকাশিত হয়]		
বৈকুণ্ঠের খাতা	১৩০৩	১৮৯৭
পঞ্চভূত	১৩০৪	„
কণিকা	১৩০৬	১৮৯৯

'সোনার তরী'র কালে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা লেখেন নি। তাঁর ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত এই সময়ে, এবং পর পর অনেক ছোটগল্প তিনি লেখেন। অল্প সময়ের মধ্যে চারখানি গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করা সেই কারণেই সম্ভব হয়। তাছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা হল যে, এই সময়ে কবি ছোট কবিতা লেখারও পরীক্ষা করেন, চৈতালীর চতুর্দশীপদী কবিতা ও কণিকার টুকরো কবিতা যার প্রমাণ। এখন দেখা যাক সমকালীন সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই নূতন সাহিত্যকৃতির বিচার কীভাবে হয়েছে।

নিত্যকৃষ্ণের ডায়েরীতে সোনার তরীর আলোচনা আছে। তিনি লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র আলোচনা করিতেছি। ইহাতে কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা স্থান পাইয়াছে। 'বসুন্ধরা'

শীর্ষক কবিতায় কবির ভাবের বিশালতায় পাঠকের হৃদয় উদার ও প্রসারিত হইয়া উঠে। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া না পড়িলে এই কবিতাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। দীর্ঘতা-দোষ সত্ত্বেও ইহাই সোনার তরীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। 'সমুদ্রের প্রতি' আর একটি চমৎকার কবিতা। ইহা বিশালতা ও গাম্ভীর্যে বায়রণের সমুদ্র-সম্বোধনের সহিত তুলনীয়। কিন্তু, কল্পনার নূতনত্বে এবং আধ্যাত্মিকতার মহত্ত্বে ইহা বায়রণের রচনাকেও পরাজিত করিয়াছে। ইহার ভাষার গাম্ভীর্যে সমুদ্র-গর্জনেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। যে কবি মহত্ত্ব ও উদারতার এরূপ সমুচ্চ শিখরে আপনাকে উত্তোলিত করিতে পারেন, তিনি যে অনেক সময়ে অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ভাবের বর্ণনে তাঁহার মূল্যবান সময় ও প্রতিভার অপব্যবহার করেন, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। বর্তমান্ গ্রন্থে দুই একটি দুর্বোধ কবিতা দেখিলাম। 'ঝুলন', 'অনাদৃত' প্রভৃতি কবিতার উদ্দেশ্য কি, তাহা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। 'প্রতীক্ষা' নামক কবিতায় কবি দেশ-কালের অতীত, সৃষ্টির পরপ্রান্তস্থিত সেই মহা-অন্ধকার রাজ্যের কি সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন! তাঁহার কল্পনার অনুগমন করিতে করিতে আমরা দিশাহারা হইয়া যাই; এই মর্ত্য-কারাগারের সহস্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আপনাদিগকে যেন অন্তহীন মহাশূন্যে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত দেখিতে পাই; মানব-জন্মের এই সমুচ্চ অধিকার স্মরণ করিয়া দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত সংসার-সংগ্রামে অগ্রসর হই। ইহা অপেক্ষা কবিতার সার্থকতা আর কি হইতে পারে?"[১]

উপরোক্ত অংশে সমালোচকের যে মত প্রকাশ পেয়েছে সে মতের কিছু পরিবর্তন হ'তে বিলম্ব ঘটে নি। এবার 'বসুন্ধরার' চেয়ে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি অধিকতর ভালো লাগল।

১ সাহিত্য, ১৩১১, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৪।

ডায়েরীর কয়েক পাতা পরেই নিত্যকৃষ্ণ লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতাটি মনোযোগসহকারে পাঠ করিলাম। এখন ইহার রচনা-পদ্ধতির বিবিধ দোষ লক্ষিত হইতেছে। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পদ্ধতির এরূপ সম্মিলন বড় সহজসাধ্য নহে। মিলের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া, অমিত্রাক্ষরের প্রধান অবলম্বন ও প্রাণস্বরূপ যে অনায়াস স্রোতোগতি তাহা রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। বর্তমান কবিতার অনেক স্থলেই স্রোতোভঙ্গ হইয়াছে। এখন বুঝিতেছি, এ বিষয়ে 'বসুন্ধরা' অপেক্ষা 'বিদায় অভিশাপ' শ্রেষ্ঠ। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের ভাষা 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যেই পূর্ণ না হউক, প্রকৃষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ, 'চিত্রাঙ্গদা'য় মিলের শৃঙ্খলে কবির হস্তপদ বদ্ধ নহে ; তিনি স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে আপনার শক্তি প্রকাশিত করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন,—নিজের উপরে একটা সংযম ও বন্ধন রাখিবার জন্যই তিনি অমিত্রাক্ষরের সহিত মিত্রাক্ষর মিলাইয়াছেন। সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারিলে, ইহাতে ভালই হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু, সে সাফল্য বহুলসাধনসাপেক্ষ। সে যাহাই হউক, এখন 'বসুন্ধরা'র কথা।

"এই কবিতার প্রধান দোষ এই যে, ইহা অতীব দীর্ঘ। আদ্যোপান্ত পুনরুক্তি ও ভাববিস্তৃতিদোষে পরিপূর্ণ। নহিলে, কবিতার মৌলিক ভাবটি যেরূপ মহান ও সুন্দর, ভাষার যেরূপ গাম্ভীর্য, ইহা একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপাটী শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। সমগ্র 'সোনার তরী'র ভিতর আমি এক্ষণে 'সমুদ্রের প্রতি'কেই প্রাধান্য দিতে চাই। কারণ, একমাত্র 'ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ' ছাড়া ইহাতে অপর কোনও দোষ লক্ষিত হয় না। গ্রন্থের মধ্যে 'বসুন্ধরা' দ্বিতীয় স্থান পাইবার যোগ্য। 'জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি, যুগল মিলিয়াছে আগে।' কবিতা সম্বন্ধে

সেই যুগল, কবিতা ও পাঠকের হৃদয়। কবি কতকটা নিজে বলিয়া কতকটা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়া একটি সম্পূর্ণ কবিতার সৃষ্টি করেন। সব কথা বলিয়া দিয়া কখনও বা সব কথার অপেক্ষাও বেশী কথা বলিয়া কবিরা অত্যন্ত অবিবেচনার পরিচয় দেন। রবীন্দ্রবাবুরও এ বিষয়ে সাবধানতা প্রার্থনীয়। কবিতাটির আর একটি দোষ এই যে, ইহাতে জড় প্রকৃতির প্রতি কবির সহানুভূতি যেরূপ জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক অন্তর্জগতের প্রতি সেরূপ হয় নাই। প্রকৃত কবিতায় আধ্যাত্মিকতারই প্রাধান্য থাকা উচিৎ।"[১]

সোনার তরীর এই আলোচনায় 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা দুটির যে প্রশংসা করা হয়েছে তার মুখ্য কারণ হল, কবিতা দুটির ভাবার্থের স্পষ্টতা। যেখানে ভাবার্থ স্পষ্ট নয়, সেখানে সমালোচক কাব্যের রসাস্বাদ করতে পারেন নি। তাই 'ঝুলন', 'অনাদৃত' প্রভৃতি কবিতা তাঁর কাছে বাতিল হয়েছে। 'সোনার তরী' কবিতাটির তো কোনো উল্লেখই করেন নি। কবিতায় ভাব অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না হলেও যে কবিতা কাব্যের দিক থেকে প্রশস্ত হতে পারে—সোনার তরীতে এমন কবিতা স্থান পেয়েছে—নিত্যকৃষ্ণের সমালোচনায় এটা স্বীকার করা হয় নি।

তবে তাঁর রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ বেশ যত্নের। তাই রবীন্দ্রনাথের রচনা-শৈলীর দিকেও তাঁর দৃষ্টি পড়েছে। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পদ্ধতির সম্মিলন ত্রুটিপূর্ণ। এবং তাঁর সমালোচনায় একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও পরিচয় আছে—তা হল রবীন্দ্রনাথের রচনায় অতিভাষণতা-দোষ লক্ষ্য করা।

চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবির নিজেকে বিলাস-

---

১ সাহিত্য, ১৩১১, আষাঢ়, পৃ. ২০১-২।

পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করার আগ্রহ এবং জীবন-সংগ্রামের রাজপথে দাঁড়াবার বাসনাকে নিত্যকৃষ্ণ অভিনন্দিত করলেন।—"…রবীন্দ্রবাবুর প্রত্যাবর্তনে আমার ন্যায় আর কাহারও হৃদয়, বোধ করি, এতদূর উৎফুল্ল নহে। আমি আজীবন তাঁহাকে এবং তাঁহার সহধর্মী কবিদিগকে যে কথা বলিয়া আসিতেছি, আজ তাহারই সাফল্য দেখিলাম। উদাসীন বিলাসপ্রিয় জীবন, কবির যোগ্য নহে। কবি যদি একজনেরও হৃদয় হইতে দুঃখদৈন্যের পাথরখানা নামাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার জন্ম সার্থক।"[১]

'চৈতালি'র সমালোচনা করেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।[২] চৈতালি তথা রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতি সম্পর্কে এটি আর একটি সমকালীন বিরূপ সমালোচনা। সমালোচক অভিযোগ করলেন যে 'সোনার তরী'র পর থেকে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ভাষার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়েছেন, এবং অতিরিক্ত আদরে ধনীর ঘরের সন্তানের মত তাঁর ভাষা কেমন বিগড়ে যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'চিত্রা' থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা হল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যমানস সম্পর্কেও অভিযোগ ক'রে বলা হল, "রবীন্দ্রবাবুর কবিতাসিন্ধু মন্থন করিলে অতি অল্প স্থানেই বিষাদভরা করুণ স্বর ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়।" চৈতালির কবিতার অপকর্ষতা প্রমাণ করতে গিয়ে বিদেশী কবিতার সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করা হল, এবং বেশ কয়েকটি ইংরেজি কাব্যাংশ উদ্ধৃত করা হল।

এ ধরনের সমালোচনার ত্রুটি কোথায়, তা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ

১ সাহিত্য, ১৩১০, অগ্রহায়ণ, পৃ. ৪৬৬।

২ দাসী, ১৮৯৭, ডিসেম্বর। প্রভাত মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে এ রচনা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।—রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।

'স্বয়ং 'সাধনা'য় এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বর্তমান বাঙ্গালা লেখকেরা বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ভিত্তি নির্মাণে প্রবৃত্ত আছেন। সুতরাং যাঁহারা ইংরাজি গ্রন্থস্তূপ-শিখরের উপর চড়িয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা ইঁহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে করিতে পারেন।...যে শ্রেণীর সমালোচকের কথা বলিতেছি, তাঁহারা যখন বাঙ্গালা পড়েন, তখন মনে মনে বাঙ্গালাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লন, সুতরাং সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।...মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সকল সাহিত্যই ম্লান নির্জীব ভাব ধারণ করে, তখন তাহার প্রতি সমালোচন-শর প্রয়োগ করা কেবল 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দেওয়া মাত্র।"[১]

সাধনায় রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লেখেন—'বাঙ্গালা শব্দ ও ছন্দ'। এই প্রবন্ধে কবি বাংলা কবিতার একটা বিশেষ অভাবের উল্লেখ করেন। এ অভাব হল বাংলা ছোট কবিতা। এবং এ অভাবের কারণ কি, তাও তিনি জানান। চৈতালির সমালোচক এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গ তুলে অভিযোগ করলেন, "রবীন্দ্রবাবু একবার সাধনায় লিখিয়াছিলেন—'ইংরাজীতে অনেক সময় আটদশ লাইনের একটি ছোট কবিতা লঘুবাণের মত ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ছোট কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না।' এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইহা মনে করিবার কারণ ছিল যে, রবীন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র কবিতায় এই অভাব দূর হইবে। কিন্তু 'চৈতালি'র অনেক কবিতা পাঠ করিয়া তাহা বোধ হয় না।"

১ সাধনা, ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, পৃ. ৪৭১-৩।

চৈতালির সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেন কবি রমণীমোহন ঘোষ।[১] তিনি উপরোক্ত অভিযোগের উত্তর দেন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে অন্য অংশ তুলে। তিনি লিখলেন, "উল্লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছিলেন যে 'বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই,' বাঙ্গালা শব্দে অক্ষরের গুরুলঘুও নিরূপিত নাই, এবং 'বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি।···সেইজন্য সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়।' সুতরাং ইংরাজি কবিতার ন্যায় বাঙ্গালা ছোট কবিতা যে সহজে আমাদের মর্মে বিদ্ধ হইয়া থাকে না, তাহা বঙ্গীয় কবির অক্ষমতাজনিত নহে; পরন্তু বাঙ্গালাভাষার মজ্জাগত কয়েকটি ত্রুটির জন্য।"

চৈতালি-সমালোচককে ব্যঙ্গ ক'রে ছড়া বাঁধলেন রবীন্দ্র-ভক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে গিয়ে শালীনতা বর্জন করলেন। প্রদীপ, ১৩০৫ আষাঢ় সংখ্যায় তিনি 'প্রশ্ন' কবিতায় লিখলেন—

···ভাসিছে নবীনরবি নভঃ উজলিয়া
তাহে কেন কুক্কুরের পরাণ বিকল?
নাড়িয়া লাঙ্গুলখানি ঊর্ধ্বপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকারিয়া।
তবু ত রবির আলো ম্লান হোল নাহি,
নাহি হোল অন্ধকার জগতের হিয়া!
হে কুক্কুর ঘোষ কেন আক্রোশ নিষ্ফল
অত ঊর্ধ্বে পৌঁছে কি কণ্ঠ ক্ষীণবল?

'কণিকা'র সপ্রশংস আলোচনা করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তিনি এই নূতন কাব্যগ্রন্থের বিশেষত্ব দেখাতে চেষ্টা করেন।—" 'কণিকা'

১ প্রদীপ, ১৩০৫, আষাঢ়।

কণককণিকার ন্যায় জ্যোতির্ময়ী ;—কবিতাগুলি জলের মত সরল, জ্যোৎস্নার মত নির্মল, প্রিয়জনের মত সুন্দর। তন্মধ্যে কতকগুলি শিশির-কণার মত নিতান্তই 'একরত্তি', কিন্তু শিশিরকণার মতই সমুজ্জ্বল।...

"স্বল্পাক্ষর কবিতায় সৌন্দর্য সমাবেশ করা, ভাবোদ্দীপন করিয়া চিত্তবিনোদন করা এবং লেখকের বক্তব্য না বলিয়াও পাঠকের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দেওয়া, বিলক্ষণ ক্ষমতার কথা। সুদীর্ঘ প্রবন্ধে যাহা হয় না, সংক্ষিপ্ত কবিতায় তাহা সাধন করিতে কত ক্লেশ ? অথচ কণিকার কবি সহজে সরল ভাষায় স্বল্পাক্ষরে এমন কত তর্কের মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন।...ভাষার সৌন্দর্য একরূপ, তাহাতে কবিতাকে শ্রুতিমধুর করে ; ভাবের সৌন্দর্য আর একরূপ, তাহাতে কবিতাকে ভাবুকের নিকট মনোজ্ঞ বেশে উপনীত করিয়া দেয় ; ভাবপ্রকাশের কৌশলের সৌন্দর্য ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাতে ভাবুককে ভাবিতে না দিয়া একেবারেই সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র কবিতায় সে কৌশল বিস্তার করিবার স্থান অতি অল্প। সে অল্পের মধ্যে যিনি শিল্পনৈপুণ্যে প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি ধন্য। কণিকার কবি এ বিষয়ে সুনিপুণ।...

"কণিকার কবি—মাচার কুষ্মাণ্ড, কাঁসার ঘটি, গোহালের মহিষ, হালের লাঙ্গল, চাকের মৌমাছি, বনের টুনটুনি, গ্রন্থের কীট, মাথার ছাতা, চকোরীর কাঁদা, কুকুরের লেজনাড়া, কচুগাছের শিকড়-গাড়া,—এলোচুল, বাঁধা খোঁপা, কাক, কোকিল, ময়ূর, ভ্রমর, প্রজাপতি,—কঞ্চির বেড়া, বাবলার শাখা,—কত কি ছোট বড় প্রতিদিনের চিরপরিচিত বস্তুর উপলক্ষ করিয়া কত বিভিন্ন বিষয়ের কৌতূহলপূর্ণ উপদেশের সঙ্গে কৌতুক বিতরণ করিয়াছেন, তাহা কণিকা না পড়িলে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিবার উপায় নাই।"[১]

১ প্রদীপ, ১৩০৬, মাঘ।

'মানসী'র কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ অক্ষরগণনা পদ্ধতি বর্জন করে ধ্বনিগত কালপরিমাণের ওপরই বাংলা ছন্দকে গড়ে তোলেন। এমন করা সম্ভব হয়েছিল যেহেতু তিনি বাংলাভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এই সর্বপ্রথম ও সার্থক আবিষ্কারের ফলে তিনি বাংলাভাষার সর্ববিধ ধ্বনিকে অফুরন্ত ছন্দ-বৈচিত্র্যে লীলায়িত করেন। মানসীর 'ভুলভাঙা' কবিতায় কবি সর্বপ্রথম, বাংলা ছন্দকে অক্ষরসংখ্যার বন্ধনপাশ থেকে মুক্ত করেন, এবং তারপর আর সে বন্ধনে তাকে বদ্ধ হতে দেন নি। মানসী, সোনার তরী, চিত্রায় কবির ছন্দ-বৈচিত্র্য ও তাঁর প্রবর্তিত নূতন ছন্দ-রীতি সম্পর্কে আলোচনা হতে বিলম্ব ঘটে নি।

'ভারতী'তে একজন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বৈচিত্র্য সম্পর্কে লিখলেন, "ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষার এত বৈচিত্র্য প্রবেশ করাইতেছেন যে, তিনি কোকিলের 'কুহুধ্বনি'তে মুগ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরাও তাঁহার নূতন ছন্দের ভঙ্গীতেও নব নব ছন্দের সঙ্গীতে মোহিত হইয়া তাঁহার কবিতার উদ্দেশে তাহাই বলিতে পারি।—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সঙ্গীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি।
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে ;
জটিল সে ঝঞ্ঝনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সঙ্গীতে।"[১]

১ ভারতী, মাঘ, ১৩০৭, পৃ. ৯১০ [লেখক : শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী]।

উক্ত সমালোচক অন্য এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নূতন ছন্দরীতি নিয়ে আলোচনা করেন। সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে স্বরবর্ণের সুনির্দিষ্ট লঘুগুরু উচ্চারণপদ্ধতি বাংলাভাষায় না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার যুগ্মধ্বনিকে (closed syllable) ছন্দের প্রয়োজনে দীর্ঘতা দান করার যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, সে পদ্ধতির একটা বাঁধাধরা ছক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সমালোচক পরিশেষে বলেন, "মোটের উপর এই দাঁড়াইতেছে যে, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ বাঙ্গালায় গদ্যে ও পদ্যে উভয়এই গুরু—পদ্যে যুক্ত বর্ণটি পদের মধ্যে বা শেষে থাকা চাই; প্রথমে থাকিলে, পূর্বপদের শেষ অক্ষর গুরুলঘুভেদ-পদ্যে গুরু হয় না, অক্ষরগণিত-পদ্যে গুরু হয়। কিন্তু পূর্বপদের শেষ বর্ণ হসন্ত উচ্চারিত হইলে হইবে না। অনুস্বার বিসর্গ যুক্তবর্ণ এবং ঐ ও ঔকার গুরু হয়; কিন্তু অপরাপর দীর্ঘস্বরের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না।"[১]

এই আলোচনার সমালোচনা বার হয় সাহিত্যে।[২] সমালোচক দেখালেন যে রবীন্দ্রনাথ কোনো বাঁধাধরা নিয়মে বর্ণকে দীর্ঘ-হ্রস্ব করেন নি। উদাহরণত, লেখক জানালেন, রবীন্দ্রনাথ "ঈ বর্ণের পূর্ববর্ণকে কখন বা হ্রস্ব, কখন বা দীর্ঘ ধরিয়াছেন। হ্রস্ব, যথা—

নয়ন যদি মুদিয়া থাক,
সে ভুল কভু ভাঙ্গিবে নাক। —মানসী

দীর্ঘ, যথা—

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি। —সোনার তরী

---

১ ভারতী, ১৩০৭, কার্তিক, পৃ. ৬৬৭।

২ রবিবাবুর কবিতার ছন্দ, সাহিত্য, ১৩০৮ চৈত্র [লেখক : শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়]।

ঔকারকে প্রায় সর্বত্রই দীর্ঘ করিয়াছেন, কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে হ্রস্ব করিয়াছেন ; যথা—

দূর হৌক যা বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের ভাণ !
সবারে চাহে বেদনা দিতে,
বেদনা ভরা প্রাণ। —মানসী

সাধারণতঃ কবি অনুস্বারের পূর্ববর্ণকে দীর্ঘ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে হ্রস্ব ধরিয়াছেন।—

"বিহারীবাবু লিখিয়াছেন, 'আট অক্ষর চরণ বিশিষ্ট দীর্ঘ ত্রিপদী কি চৌপদীতে কবিবর কেবল অক্ষর গণনা করিয়াই প্রায় লেখেন।' অতঃপর তিনি আপনার কথা প্রমাণিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে। ইত্যাদি

আমরা তাঁহার কথার খণ্ডনের জন্য নিম্নলিখিত কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতে পারি কি না ?

শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি।

স্থূল কথা এই যে, কবি কোন স্থলে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে কবিতা লেখেন, এবং কখন লেখেন না, তাহা আলোচনা করিবার এখনও সময় আসে নাই। তিনি সবে সে দিন এই নূতন প্রণালীতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; কালে যে তিনি প্রায় সকল রকম কবিতায় এই প্রণালীর প্রবর্তন না করিবেন, তাহার নিশ্চয়তা কি ?

"বিহারীবাবু···একটি কথা তুলিয়াছেন যে, 'বাঙ্গলা ছন্দে যদি দীর্ঘস্বরের সমস্তই গুরু উচ্চারিত হয়, তবে অত্যন্ত শ্রুতিকটুত্ব দোষ

ঘটে।' এই জন্যে তিনি রবিবাবুর অবলম্বিত নিয়ম (যাহাতে কেবল ঐকার, ঔকার, অনুস্বার ও বিসর্গ, সংযুক্ত বর্ণ, এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ দীর্ঘ ধরা হইয়াছে) অনুকরণ করাই সঙ্গত মনে করেন।

"এ বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। সংস্কৃত গুরু-লঘু রীতি অবিকল অবলম্বন করিলে শ্রুতিকটুত্ব দোষ ঘটিবে কেন? সম্ভাবশতক :

নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে
নম বিস্ময় সত্য সনাতন হে।
গ্রহ তারক মণ্ডিত নীল নভঃ
ধন ধান্য ভরা রমণীয় ধরা।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর 'কর্ণবিমর্দনকাহিনী'র

জান না কি কদাচন মূঢ়
কর্ণ-বিমর্দন-মর্ম কি গূঢ়

প্রভৃতি কবিতা যদি শ্রুতিমধুর না হয় তো শ্রুতিমধুর কবিতা কি? কবিতাগুলি রবিবাবুর নিয়মে লিখিলে এই সৌন্দর্য থাকিত কি?"

বাংলা ছন্দরীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত পদ্ধতি যে কতখানি গুরুত্ব ও সম্ভাবনাপূর্ণ—তা যে প্রকৃতপক্ষে বাংলা ছন্দের মুক্তিদাতা সে সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি এ সমালোচনায় ধরা পড়ে নি। তবে রবীন্দ্রনাথের নূতন ছন্দপদ্ধতি দেখে সমালোচক বাংলা ছন্দের পরিভাষা নির্দেশীকরণে সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে তাঁর আলোচনার উপসংহার-অংশটি উল্লেখযোগ্য।—"এই প্রবন্ধে অনেক স্থলে 'গুরু লঘু ভেদে লিখিত' 'গুরু লঘু ভেদ প্রণালীতে লিখিত' এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে, উহার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত অল্পাক্ষরে গ্রথিত সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে ব্যবহৃত 'মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত' এইরূপ ভাষার ব্যবহার করিতে পারিতাম। ফলতঃ,

যেখানে গুরু লঘু বিচার করিয়া মাত্রা হিসাবে লেখা হয়, তাহাকে জাতিচ্ছন্দঃ মাত্রাবৃত্তি বা মাত্রাবৃত্তচ্ছন্দঃ বলা হয় ; যেখানে কেবল অক্ষর গণিয়া লেখা হয়, তাহাকে বর্ণবৃত্তচ্ছন্দ, অক্ষরবৃত্তি বা শুধু 'বৃত্ত' বলা হয়।" খুব সম্ভব এই প্রথম বাংলা ছন্দের দুই জাত নির্দিষ্ট করে তাদের নামকরণের চেষ্টা করা হল। পরিভাষা সৃষ্টির দিক থেকে সমালোচক যে প্রবোধচন্দ্রের[১] অগ্রবর্তী—একথা স্বীকার করতে হবে।

চার খণ্ড ছোটগল্প সংগ্রহের মধ্যে এই সময়ে প্রকাশ পেল রবীন্দ্রনাথের এক নূতন সাহিত্যকৃতি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে গল্পগুলি 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' কাগজে বেরিয়েছিল। সমগ্র দৃষ্টির বিচারে এই সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে 'সাহিত্য' মন্তব্য করলেন, "আমরা সেদিন একখানি বিলাতী কাগজে পড়িতেছিলাম রুসিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কাউণ্ট টলষ্টি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'একজন প্রকৃত ভাল লেখকের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ কিছু ভাল বলিবার থাকা চাই, দ্বিতীয়তঃ, তাহা ভাল রকমে বলা চাই, তৃতীয়তঃ, অন্তরের সহিত বলা চাই। ডিকেন্সের এই তিনটি গুণই ছিল। থ্যাকারের বলিবার বিষয় বড় বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু কেমন করিয়া বলিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন ; কিন্তু তাঁহারও আন্তরিকতা ছিল না।' রবীন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়, তাঁহারও শেষ দুটি গুণ যথেষ্ট আছে, তাঁহার বলিবার প্রণালী চমৎকার ; তিনি নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লিখিতে পারেন, সুতরাং তাহাতে বেশ আন্তরিকতা থাকে ; কিন্তু তাঁহার বলিবার বিষয়ের বড় অভাব।"[২]

---

১ প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫২, পৃ. ৮ দ্রষ্টব্য।

২ সাহিত্য, ১২৯৮, পৌষ, পৃ. ৪৬২-৩।

॥ ৬ ॥

[১৩০৬-১৩০৮ ; ১৯০০-১৯০১]

রচনা

কথা	১৩০৬	১৯০০
ব্রহ্মোপনিষদ	"	"
কাহিনী	"	"
কল্পনা	১৩০৭	"
ক্ষণিকা	"	"
গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড	"	"
ব্রহ্ম মন্ত্র	"	১৯০১
গল্প [গল্পগুচ্ছের ২য় খণ্ড]	"	"
নৈবেদ্য	১৩০৮	"
ঔপনিষদ ব্রহ্ম	"	"
বাঙলা ক্রিয়া-পদের তালিকা	"	"

এই পর্বে কবি ভারতের ঐতিহাসিক কীর্তিকাহিনীকে কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেন, যার ফলে রচিত হল 'কথা' এবং 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ। 'কথা'র সমালোচনা করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।[১] তিনি এই কাব্যগ্রন্থের অভিনবত্ব পরিস্ফুট করতে সচেষ্ট হন। তিনি বলেন, "কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রণীত কতকগুলি অভিনব কবিতা 'কথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সম্প্রতি রচিত হইলেও, কবিতা-নিবদ্ধ বিষয়গুলি অতি পুরাতন ইতিহাসের সম্পত্তি। বৌদ্ধগ্রন্থে, রাজস্থানের কিম্বদন্তীতে, শিখসমাজের শৌর্যগাথায়, মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিক্রমকাহিনীতে ও ভক্তমালের পুণ্যকথায় এতদিন যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহারই ছায়া লইয়া কবিতাগুলি গঠিত। যে সকল

---

১ প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩০৮।

ঐতিহাসিক কীর্তিকাহিনী এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা কিরূপে কাব্য-সৌন্দর্যের উপাদান হইতে পারে, কবি তাহার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পদ-লালিত্য-গৌরবে, রস-সমাবেশ-কৌশলে, চিত্তবিনোদন-চাতুর্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত; তাঁহার প্রতিভা বিষয় নির্বাচনের জন্য যে স্বদেশের পুরাতন পুণ্য-কথা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছে, ইহা দেশের ও দেশীয় সাহিত্যের পক্ষে আনন্দের সংবাদ।

"ভারতবর্ষ বহু পুরাতন সভ্যজনপদ বলিয়া সকল দেশেই সুপরিচিত। তাহার পুরাকাহিনীর লুপ্তোদ্ধার করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্য-সেবকগণ অতুল অধ্যবসায়ে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু বিলুপ্তপ্রায় শিলালিপি বিশদীকৃত ও মরু-মরীচিকা-নিহিত স্মৃতিচিহ্ন উদ্ঘাটিত হইতেছে। কিন্তু সে সকল প্রত্নতত্ত্ব সাধারণ্যে সুপরিচিত হইতে পারিতেছে না। তাহার সৌন্দর্য ভোগ করিতে হইলে যেরূপ অধ্যবসায় ও অধ্যয়ন-ক্লেশের প্রয়োজন, আমাদের দেশের পাঠক সাধারণের মধ্যে সেরূপ পাঠানুরাগ এখনও বর্ধিত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং দুই দশজন স্বদেশের বা বিদেশের পুরাতত্ত্ববিৎ জীবনপাত করিয়া যে সকল তথ্যাবিষ্কারে কৃতকার্য হইতেছেন, দেশের লোকের নিকট সহসা তাহার সমাদর হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের-সযত্ন সংকলিত পুরাতত্ত্বের সারাংশ কবিতানিবদ্ধ হইলে, তৎপ্রতি সহজে লোকচক্ষু পতিত হইতে পারে। সেকালের ইতিহাসে যে সকল চরিত্রেরা আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিরকালই কাব্যসৌন্দর্যের উপাদান রূপে গণ্য হইতে পারিবে। কবি সেইরূপ আদর্শ লইয়া কয়েকটি 'কথা' রচনা করায়, বঙ্গসাহিত্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। এক সময়ে স্বদেশের এবং বিদেশের পুরাতন পুস্তকের ভাষানুবাদ করা বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর কল্পনার

প্রাবল্যে সে লক্ষ্য ভাসিয়া গেলে, কিছুদিন বঙ্গসাহিত্য বহুপথে ধাবিত হইয়া অবশেষে কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও মানভঞ্জনের তরল তরঙ্গের রঙ্গরসেই সমধিক মত্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখন সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুরোধে কল্পনার উচ্ছৃঙ্খল নখরাঘাতে বহু ঐতিহাসিক চরিত্র শতধা বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং স্বদেশের ইতিহাস হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অক্ষত কলেবরে কবিতা-নিবদ্ধ করিলেও যে সৌন্দর্য সৃষ্টির বাধা হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কবি বঙ্গসাহিত্য-সেবকগণের সম্মুখে এক অভিনব চেষ্টার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।”

কাহিনী, কল্পনা ও ক্ষণিকার অন্তর্গত যে-সব কবিতা মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাদের কয়েকটির সমালোচনা ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় করা হয়। এ-সব সমালোচনায় নিন্দা ও প্রশংসা দুইই ছিল, যদিও নিন্দার ভাগটাই বেশি। এ সমালোচনার প্রধান ত্রুটি এই যে এর মানদণ্ড কি, তা বোঝা যায় না। কাহিনী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতীতে—১৩০৫ সাল ‘ফাল্গুন ও চৈত্র’ সংখ্যায়। এই সংখ্যা সমালোচনাকালে সমালোচক লেখেন, “প্রথমেই আটচল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ নামক নাটকাকারে গ্রথিত একটি সুদীর্ঘ পদ্য। মানবচরিত্রের যে দুর্বলতার চিত্র আঁকিবার জন্য লেখক এত বড় চিত্রপট প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বোধ করি, ইহা অপেক্ষা অল্পপরিসর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইলে সমধিক সঙ্গত ও শোভন হইত। এই বিপুল পদ্যসমষ্টির কোনও বিশেষত্ব নাই; পক্ষান্তরে, অতিবিস্তৃতি দোষে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ও বিরক্তির সঞ্চার হয়।”[১]

১ সাহিত্য, ১৩০৬, বৈশাখ।

কিন্তু কল্পনা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ভ্রষ্টলগ্ন' যখন মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তার ভাগ্যে প্রশংসা জুটল। সমালোচকের ভাষায়, "কবি অতি সুকৌশলে কতিপয় ছত্রের মধ্যে কোন্ অজ্ঞাত উপকথা-নন্দনের অধীশ্বরী স্বপ্নময়ী লীলাময়ী তরুণীর তরুণ হৃদয়ের মধুর করুণ প্রেমকাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন। কবিতার সঙ্কীর্ণ আয়তনে যতখানি পরিব্যক্ত, তদপেক্ষা অনেক অধিক অব্যক্ত কাহিনী কল্পনায় প্রতিবিম্বিত হয়। কবির কলাকৌশলে পাঠকের কল্পনা জাগিয়া উঠে, তখন সুপ্তোত্থিতা কল্পনা কখনও আবেগে অধীর হইয়া সেই প্রেমময়ী লাজময়ী মায়াময়ী মানসী স্বপ্নরাণীর আকাঙ্ক্ষা-চঞ্চলহৃদয়ের তালে তালে নাচিতে থাকে, পরক্ষণে নায়িকার সরমে সঙ্কোচে মুগ্ধ হইয়া আপনাতে আপনি নিমগ্ন-মৌন হইয়া যায়। যখন 'অরুণ-ধূসর পথে রাজরথে তরুণ পথিক দেখা দিয়া' কাতরস্বরে ডাকিয়া যায়—'সে কোথায়', 'সে কোথায়'—তখন 'সরমে মরিয়া' মানসী মূক হইয়া থাকে—বলিতে পারে না—'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।' তারপর, যখন ফিরিয়া ফিরিয়া বার বার ডাকিয়া বাঞ্ছিত চলিয়া যায়, তখন চিরবিরহকাতরা 'শূন্য রাজপথ পানে চাহিয়া' জানলার তলে ধূলায় বসিয়া 'ত্রিযামা যামিনী' জাগিয়া একাকিনী গাহিতে থাকে—'হতাশ পথিক, সে যে আমি!' ইহাই মানবহৃদয়ের যুগযুগান্তব্যাপী বিরহকাব্য—জগতের নিষ্ঠুর সত্য। এই নিষ্ঠুর চিরসত্যের প্রতি তৃষিত মানবের কি প্রবল আকর্ষণ। কবি কাব্যকলার কুহকে যেন সেই চিরসত্যের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ঢাকিয়া দিয়াছেন ;—যেখানে করুণার অশ্রুমন্দাকিনী জগতের মরুক্ষেত্র সিক্ত সরস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে, কবি সেই পুণ্য-বিরহতীর্থে সেই চিরপুরাতন চিরনবীন চিরন্তন তৃষিতার মন্দির গড়িয়াছেন।"[১]

১ সাহিত্য, ১৩০৬, কার্তিক, পৃ. ৪৫৮-৯।

ভ্রষ্টলগ্ন কবিতার রস যে সমালোচক এত গভীরভাবে উপভোগ করতে পারলেন, তিনিই আবার লিখলেন, "'পসারিণী' একটি সৌখীন কবিতা। ইহার ভাষার সৌন্দর্য প্রশংসনীয়, কিন্তু সমগ্র কবিতাটির অভিধেয় কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না",[১] এবং "'ক্ষণিকের গান' হয় নিতান্তই ক্ষণিক, নয় আমরা রসগ্রহণ করিতে পারিলাম না।"[২] 'নববর্ষা' কবিতার

"ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে॥

অতি সুন্দর। কিন্তু অবশিষ্ট ভাগ অত্যন্ত সাধারণ; কৃত্রিমতাদুষ্ট ও কেবল শব্দঝঙ্কারে মুখরিত। বিশেষতঃ হৃদয়-ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া হাস্যরসের উদ্রেক হয়।"[৩]

১ সাহিত্য, ১৩০৬, অগ্রহায়ণ, পৃ. ৫২৩।
২ সাহিত্য, ১৩০৭, আষাঢ়, পৃ. ১৯২।
৩ সাহিত্য, ১৩০৭, শ্রাবণ, পৃ. ২৫৫।

॥ ৭ ॥

[১৩০৯-১৩১৩ ; ১৯০৩-১৯০৬]

রচনা :

চোখের বালি	১৩০৯	১৯০৩
কাব্য-গ্রন্থ (মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত)		১৯০৩-৪
কর্মফল	১৩১০	১৯০৩
রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী (হিতবাদীর উপহার)	১৩১১	১৯০৪
আত্মশক্তি	১৩১২	১৯০৫
বাউল	"	"
স্বদেশ	"	"
ভারতবর্ষ	"	১৯০৬
খেয়া	১৩১৩	"
নৌকাডুবি	"	"

এই পর্বের বিশেষত্ব হল কবির নূতন ধরনের উপন্যাস রচনা, 'চোখের বালি'র দ্বারা যার সূত্রপাত। অন্যদিকে তাঁর সমগ্র রচনাবলীর একত্র প্রকাশ। মোহিতচন্দ্র সেন কবির কবিতা, গান ও কাব্য-নাট্য একত্রিত ক'রে ও তাদের ভাবানুগ বিভাগ ক'রে নয়টি খণ্ডে প্রকাশ করেন, এবং হিতবাদীর পক্ষ থেকে কবির গদ্যরচনা ও গান একত্র ক'রে সুবৃহৎ একখণ্ডে প্রকাশ করা হল। ইতিপূর্বে অবশ্য মোহিতচন্দ্র কবির কবিতাসংগ্রহ কাব্য-গ্রন্থাবলী নামে প্রকাশিত করেছিলেন, কিন্তু তাতে কবিতাগুলির এমন শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তাছাড়া 'কাব্য-গ্রন্থাবলী'র এই দ্বিতীয় সংস্করণ আর এক কারণেও উল্লেখযোগ্য, তা হল এই যে এতে মোহিতচন্দ্র যে ভূমিকা লেখেন, সে-ভূমিকাই হল রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম মর্মগত ভূমিকা। কবির কবিতাগুলিকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখে কোনো আলোচনা ইতিপূর্বে কেউ করেন নি।

মোহিতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিকে আদর্শ কবিতা ব'লে গ্রহণ ক'রে তার কারণ জানালেন। তিনি বলেন, "আদর্শ কবিতার লক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হইলেও এরূপ কবিতা চিনিয়া লওয়া যে খুব শক্ত তাহা বোধ হয় না। যাহা যথার্থ কবিতা, দিব্য কল্পনা যাহাকে জন্ম দিয়াছে, অকৃত্রিম ছন্দঃ-সৌন্দর্য তাহাকে বাহিরে ভূষিত করে এবং ভাবের গভীরতা তাহাকে অন্তরে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ কল্যাণকে আবাহন করে এবং সৌন্দর্যে তাহা জগতের নিত্যসুন্দর অনির্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল হয়। সাধারণভাবে সংক্ষেপে সঙ্কেতস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, যে কবিতা অনির্বচনীয়তায় সঙ্গীতের যত সদৃশ এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসারতা যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ। যিনি কথার সাহায্যে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন, তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যিনি শুধু চিত্রাঙ্কনে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার ছন্দের মর্মে মর্মে সঙ্গীতের অপূর্ব অপরূপ ঝঙ্কারগুলি আনিতে পারেন। যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার কবিতায় সমগ্র জীবনের সুগম্ভীর বিজয়গীতি শ্রুত হয়।···

"এইখানেই রবীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব। ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ কবিতা তিনি এত রচনা করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ তাঁহার কাছে অশেষ ঋণে ঋণী।"

তবু কবি সাধারণের নিকট গানের দ্বারা যত পরিচিত, কবিতার দ্বারা তত নন—এই পরিস্থিতির জন্যে দুঃখ প্রকাশ ক'রে সম্পাদক বলেন, "যাঁহার কবিতা এই দেশের ও সময়ের উপযোগী একটি সুমহান্ সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, সর্ববিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ দিব্য কল্পনা যাঁহার কবিতাকে বরণ করিয়াছে, যিনি আমাদের

আধুনিক জটিল, কর্মক্লিষ্ট জীবনসমস্যার উপর নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যথার্থভাবে গ্রহণ না করিয়া আমাদের দেশ শুধু নিজের হতভাগ্যতারই পরিচয় দিয়াছে।”

এই আলোচনায় মোহিতচন্দ্র কবির প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, প্রেম সম্বন্ধীয় ধারণা ও জীবন-দেবতার মর্মার্থ উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেন। এবং পরিশেষে কবি-কর্মের মূল্যায়ন করে বলেন, “রবীন্দ্রবাবুর কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেটি তাঁহার সমুদয় কবিতার অন্তরের কথা এবং সেটি ভারতবর্ষেরও কথা। ভারতবর্ষের সাধনা কি? শান্তং শিবমদ্বৈতং। ভারতবর্ষই বলিয়াছেন,—“যোবৈভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।” আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রবাবু যে বিষয়েই অবতারণা করেন, তাঁহার প্রয়োগ-কৌশলে তাহা আপনার সামান্যতা পরিহার করিয়া সেই ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা সামান্য কথা নহে। কারণ দেখিতে পাই আনন্দকে আনন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখকে উচ্চতর সুখের বিদ্রোহী করিয়া চিত্রিত করা, প্রতিযোগিতা বিষে কলুষিত করিয়া আনন্দকে কেবলমাত্র একটি জাতি বা দেশের উপভোগ্য করা, সৌন্দর্যকে সীমাবদ্ধ করিয়া সৌখীন ক্ষুদ্রতা সৃজন করা, ইত্যাদি আজকালকার অবনতশীল (বিশেষতঃ ইউরোপীয়) আর্টের একটা খেয়াল দাঁড়াইয়া গেছে। আমাদের কবি তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের শিক্ষা আমরা শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, মঙ্গল এবং যে আনন্দ চিরন্তন, গভীর ও সার্বজনীন তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারি না। এমন কেহই নাই যিনি তাঁহার কবিতায় মর্ম বুঝিতে পারিয়া আর্দ্রচিত্ত, শান্ত, শ্রদ্ধান্বিত ও আনন্দিত হন নাই।”

রবীন্দ্র-কাব্যকে সমগ্র দৃষ্টিতে বিচার করার প্রথম প্রয়াস যদি

করেন মোহিতচন্দ্র, গোটা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে এই রকম একটা বিচার প্রথম করেন শশাঙ্কমোহন সেন। ইনি 'সাহিত্যে' এই সময় (১৩১২ সাল) 'বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির একটা মূল্যায়ন করেন। তিনি জানালেন রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রতিভাবলে বঙ্গ-সাহিত্যকে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের সমকক্ষ ক'রে তুলেছেন। তাঁর ভাষায়,—"কবি রবীন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। এখনও তাঁহার সমালোচনার সময় আসে নাই। সে সময় বহু দূরবর্তী থাকুক—বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভায় কৃতার্থ, সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হউক। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে সে সকল মৌলিক উপকরণ ও স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা ইতিপূর্বে কোনও কবি কিংবা লেখক পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা নিত্য নব নব পথে খেলিতেছে। তিনি বঙ্গসাহিত্যকে এমন শব্দসম্পদ, ভাবের উপাদান, রচনার কারুকার্য, চরণের গাম্ভীর্য, অলঙ্কারের পারিপাট্য ও ছন্দের শত সহস্র প্রকার বৈচিত্র্যে ভূষিত করিয়া যাইতেছেন যে, বঙ্গভাষা স্পর্ধা করিয়া পৃথিবীর অন্য সাহিত্যকে আপন কুটীরে নিমন্ত্রণ করিতে পারে।"

সমালোচক রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের কারণ বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হন। তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের এই উন্নতির মূল কারণ স্বাধীনতা। তিনি শৈশব হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার, এমন কি, সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া, স্বীয় শক্তির অনুসরণ করিতেছেন ; সমস্ত শক্তিশালী মানবের চরিত্রে প্রকৃতি এক অপূর্ব দাম্ভিক উগ্রতা মিশ্রিত করিয়া দেন। তাঁহারা সমস্ত প্রশংসা অপ্রশংসা তুচ্ছ করিয়া অবিশ্রান্তপ্রবাহে আপন উদ্দেশ্যের দিকে ছুটিয়া যাইতে পারেন, আপনাকে চরিতার্থ করিতে পারেন। এই স্বাধীনতায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও অপ্রকৃতি উভয়ই চরিতার্থ হইয়াছে ; আমরা বঙ্গীয়

সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব অভিনেতার অভিনয় দেখিতেছি।" রবীন্দ্রনাথের দোষ[১] কোথায় তা দেখাতেও সমালোচক সচেষ্ট হলেন। তাঁর মতে, "রবীন্দ্রনাথ কায়া অপেক্ষা ছায়ারই অধিক পক্ষপাতী। রক্তমাংসময় শরীরী জীব অপেক্ষা তিনি ভাবময়ী প্রকৃতির অঙ্কনে অধিক অনুরাগী। এই এক কথাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত দোষ গুণ বুঝিতে পারা যাইবে। ইংলণ্ডে এই ভাবাপন্ন কবি শেলী। শেলী আকাশে উড়িতেন, অতি উর্ধ্বে উঠিয়া এই কুহেলিকাময়, ছায়াময় অবিভক্তাবয়ব পৃথিবীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই সৌন্দর্যের উপভোগ করিতেন। কায়া অপেক্ষা ছায়ার কোনও কোনও বিষয়ে মাহাত্ম্য অনেক অধিক; সুতরাং কবি সেখানে অপ্রতিহত প্রভাবে আপনার ঐন্দ্রজালিক জগতের সৃষ্টি করিয়া পরমানন্দে বিচরণ করিতে পারেন। এই রাজ্যে দাঁড়াইয়া কবি একটা সম্পূর্ণ অলীক কথা বলিলেও, মর্তবাসীর তাহার অস্তিত্বনাস্তিত্ব বিষয়ে দ্বিধা বাক্য প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং এই রাজ্যের কবি সৌভরাজের ন্যায় অদৃশ্য দুর্গে অবস্থান করিয়া যথেষ্ট দম্ভ ও অভিমানে স্ফীত হইতে পারেন। এদিকে মর্তবাসীও তাঁহাদের কথাকে তুচ্ছ করিয়া জলীয় বাষ্পের মতো উড়াইয়া দিতে পারেন। এইরূপ কবি একদেশ-দর্শী, সন্দেহ নাই। শুধু আকাশপথে উড্ডীন হইয়া শ্যেনের মতো তীব্রগামী হইলে চলে না। এই পাষাণকঠোর ধরণীর উপর দিয়াও তুরঙ্গের মতো দ্রুতপদে ছুটিতে হইবে; এবং অর্জুন-নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় রসাতলে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপ্রবাহিনী ভোগবতীর পাবনী ধারা মর্তমানবের জন্য উৎসারিত করিতে হইবে।

---

১ "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কথা, কাহিনী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বেকার রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করিয়া।—লেখক।"

অন্যথা, তিনি একশ্রেণীর পাঠকের হৃদয়চারী কবি হইতে পারেন, 'কবির কবি' হইতে পারেন, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির কবি হইতে পারেন না।

"ইদানীং রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভাবকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করিতেছে। 'চিত্রা'র কবিতাগুলি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছন্দের নৃত্যে, ভাষার ঝঙ্কারে, আকুলতার আবেগে, ভাবের সুচিক্কণ সুররশ্মি ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব করা দায় হইয়াছে। ভাষা ও ছন্দোবন্ধের উপর অতিমাত্রায় দখল জন্মিলে, সচরাচর অনেক কবির যে দোষ ঘটিয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তাহার বিপর্যয় ঘটে নাই।"

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্য-কর্ম সম্বন্ধে সমালোচকের সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছে এই রকম।—"বাঙ্গালায় সর্বপ্রথম প্রকৃত হাস্যরসের কবিতা রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'তে লিখিয়াছিলেন।...রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলি ভাবের উদ্দীপক ও বিরাট পুরুষের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক; তাই সঙ্গীত-সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু, ব্রহ্মের প্রাচীন যোগমূলক ধারণায় ও আন্তরিকতায় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত চিরঞ্জীব প্রভৃতি সাধু সাধকগণের সঙ্গীতকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।...এই ক্ষেত্রেও [ছোটগল্প] রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ক্ষুদ্রের ভিতর মহত্ত্ব-দর্শনে বিশেষ পটু। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে ও মানবচরিত্রের অধ্যয়নের ফলে তাঁহার অনেক গল্প সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীস্থ হইবার উপযুক্ত। এই সমস্ত গল্পে বঙ্গভাষার বর্তমান শক্তি ও গতি বুঝিতে পারা যায়।...প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি আমাদের দুর্গা-প্রতিমার মতো। সুতরাং রং, বিচিত্র গঠন, রাঙ্গতার চাকচিক্য—সকলই আছে, নাই কেবল প্রাণ। এত জাঁকজমক, এত বর্ণনার পারিপাট্য

সাহিত্যে অল্প নাটকেই আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অন্তরতম পদার্থের অভাবে সমস্ত নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত আমাদের অণুমাত্র সহানুভূতি হয় না; মনে হয়, একটাও যেন প্রকৃতিস্থ নহে। সকলেই অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত, আলঙ্কারিক বাক্য-বিন্যাসের জন্য একান্ত ব্যাকুল।...সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সমালোচনা করিয়াছেন,...সেই আদর্শের সমালোচনা এখন আর হইতেছে না।...রবীন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক সভায় ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশের সংমিশ্রণে যে ভাষা বহিয়াছে, তাহা বঙ্গভাষার রত্নৈশ্বর্যস্বরূপ সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিরসিঞ্চিত থাকিবে।"

'চোখের বালি' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময়েই এই রচনা সম্বন্ধে 'সাহিত্য' পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা বের হয়। দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়া আর একটি অভিযোগ করা হয়, যে অভিযোগ গুরুতর এবং আজকের দিনে এক নূতন তথ্য হিসেবে মূল্যবান ঠেকে। এ অভিযোগ হল চোখের বালির প্লট, নায়িকার নাম ও চরিত্র, এই উপন্যাস শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত একটি বইয়ের অবিকল অনুকৃতি। 'সাহিত্যে'র সমালোচনা ছিল এই—"যে বঙ্গদর্শনের চক্ষে একদিন বঙ্কিমবাবুর ও বাঙ্গলা ভাষার সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠতম নবেল 'বিষবৃক্ষ' ও 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই আজ রবিবাবুর 'চোখের বালি' বাহির হইতেছে। কর্তব্যানুরোধে এ বালি ঘাঁটিবার কর্মভোগ যখন আমাদের করিতে হইয়াছে, তখন তাহার উপযুক্ত আলোচনা অবশ্যই হইবে। কিন্তু আজ নয়, কয়েক দিন পরে। আপাততঃ মোটের উপর এই বক্তব্য যে, রবিবাবু নির্ভীক স্বরে যে ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ ও সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য তাঁহার ও তদীয় বঙ্গদর্শনের পক্ষে 'অমার্জনীয়' প্রচার করিয়া তাহাদের সংস্পর্শবিরহিত হইতে প্রথমেই

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, সেই ভীরুতা সেই রুচিভ্রংশ, সেই সত্যের অপলাপ এবং সেই সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য ষড়যন্ত্রে একযোট হইয়া তাঁহার এই কুৎসিত আখ্যানের আরম্ভ হইতে উপস্থিত অধ্যায় পর্যন্ত পূর্ণগ্রাস করিয়াছে। ইহার প্লট এবং নায়িকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত এবং রবিবাবুর বঙ্গদর্শনের এই প্রথম সংখ্যাতেই সমালোচিত[১] একটি নবেলেরও নয়—'টেলে'র প্লট ও নায়ক নায়িকা চরিত্রের অবিকল অনুকৃতি :—সর্বত্রই একই আত্মায় উভয়ের একই রূপ গতি, এবং স্থানে স্থানে, এমন কি, একই শরীরে স্থিতি! সরলভাবেই বলিতেছি রবিবাবু অজ্ঞাতে এই গলিতপঙ্কময় প্রমাদে পড়িয়া থাকিবেন। নিশ্চয়ই অজ্ঞাতে তিনি ইহা করিয়া বসিয়াছেন, নহিলে জানিয়া শুনিয়া এমনতর কাজে কেহই প্রবৃত্ত হইতে পারে না।"[২]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' প্রকাশিত হয় ১লা ফাল্গুন, ১৩০৭ সালে। তখনও লেখক তেমন খ্যাতিলাভ করেন নি। নূতন লেখকই তাঁকে বলা চলে। এই লেখকের বই রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ করলেন, এমন সুস্পষ্ট অভিযোগ সাহিত্যের মতো পত্রিকায় উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও, এ নিয়ে তখন এবং তারপরে অন্য কোথাও কোনো প্রতিবাদ বা আলোচনা হয় নি—একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে। অবশ্য 'সাহিত্য'ও এ প্রসঙ্গের জের আর টানে নি। এটা ঠিক যে 'উমা'র প্লট ও প্রধান চরিত্র যথা বিনোদিনী, উমা ও যোগেশ্বর চোখের বালির মূল প্লট ও চরিত্রের মধ্যে বিনোদিনী,

১ উমা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

২ সাহিত্য, ১৩০৮, ফাল্গুন, পৃ. ৭০২-৩।

আশা ও মহেন্দ্র-এর সঙ্গে প্রায় মেলে।[১] কিন্তু এ মিল-এর অর্থ এ নয় যে রবীন্দ্রনাথ 'উমা'র নকল করেছেন। 'সাহিত্যে'র অভিযোগ নিতান্তই বিভ্রান্ত, বিদ্বেষপ্রসূত। যদি ধরাও যায় যে রবীন্দ্রনাথ উমা পড়েছিলেন ও তার থেকে সজ্ঞানেই চোখের বালির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, তা হলেও রবীন্দ্রনাথকে ততটুকুই অভিযুক্ত করা সম্ভব যতটুকু আমরা শেকস্‌পীয়রকে করি অন্যের বিষয়বস্তু থেকে তাঁর নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য।

১ আদিত্য ওহদেদার : চোখের বালি ও উমা, যুগান্তর, রবিবার—২৫শে মে, ১৯৫৮ দ্রষ্টব্য।

॥ ৮ ॥

[১৩১৪ ; ১৯০৭-৮]

রচনা ঃ

বিচিত্র প্রবন্ধ	১৩১৪	১৯০৭
চারিত্র পূজা	"	"
প্রাচীন সাহিত্য	"	"
লোকসাহিত্য	"	"
সাহিত্য	"	"
আধুনিক সাহিত্য	"	"
হাস্যকৌতুক	"	"
ব্যঙ্গকৌতুক	"	"
প্রজাপ্রতির নির্বন্ধ	"	১৯০৮

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু এই সময়েই ঘটে তাঁর কাব্যের সব চেয়ে বিরূপ সমালোচনা। এই রবীন্দ্র-বৈরূপ্যের পৌরোহিত্য করেন দ্বিজেন্দ্রলাল।

দ্বিজেন্দ্রলাল তখন 'দ্বিজু রায়' হয়ে বঙ্গসাহিত্যের আসর রীতিমত জমিয়েছেন। তাঁর হাসির ছড়া, স্বদেশী গান, ও দেশাত্মমূলক নাটক বহুজনচিত্ত মুগ্ধ করেছে। তাঁর লেখায় কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই; সে লেখা পাঠমাত্রই নিশ্চিত অর্থবোধের পরিতৃপ্তি ঘটায়। রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে যে অস্পষ্টতার অভিযোগ একদল পাঠকের মনে ধূমায়িত ছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের প্রতিভূ হয়ে রবীন্দ্র-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সমালোচনার নামে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণই চালালেন।

১৩১৩, শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'কাব্যের প্রকাশ' নামে অজিত চক্রবর্তীর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধকেই ছুতো করে

দ্বিজেন্দ্রলাল অস্ত্র ধরলেন। তিনি লিখলেন, "গত শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে 'কাব্যের প্রকাশ' নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। তাহা অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন। শুদ্ধ তাহা নহে, যাঁহারা স্পষ্ট কবি, লেখক তাঁহাদিগকে একটু ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়েন নাই। যদি এটি রবীন্দ্রবাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইত, তাহা হইলে ইহার এই প্রতিবাদ করিতাম না।···

"বঙ্গের অস্পষ্ট কবিগণ বড়ই অধিক শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও ব্রাউনিঙ্গের দোহাই দেন। এই ইংরাজ কবিগণ স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য বটে। কিন্তু (ব্রাউনিং ছাড়া) তাঁহাদের কাব্যের মূল বা কেন্দ্রস্থ ভাব ধরিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের বঙ্গীয় কবিগণের কাব্যে কোন ভাবই ধরা যায় না।··· আমাদের দেশে এই অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"রবিবাবুর ভক্তগণ রবিবাবুর 'সোনার তরী'কে তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন। সভায় সভায় ইহার আবৃত্তি হইয়াছে। একজন সমালোচক এইটি পড়িয়া লিখিয়াছিলেন যে, 'তাঁহার সোনার লেখনী অক্ষয় হউক।' দেখা যাক ইহার সৌন্দর্য কোথায় ও এ কাব্য হইতে কি ভাব সংগ্রহ করিতে পারি। বলা বাহুল্য কবিতাটি যার-পর-নাই অস্পষ্ট।

"প্রথমতঃ দেখা যাক কবিতার গদ্যার্থ কি দাঁড়ায়।

"কবিতাটির গদ্যার্থ এই :—

"একজন কৃষক শ্রাবণ মাসে রাশি রাশি ধান কাটিয়া নির্ভরসা হইয়া কূলে বসিয়া আছে। পরে সে দেখিল যে এক 'যেন চিনি' মাঝি পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া ধানগুলি দিল। পরে নিজেও যাইতে চাহিল। মাঝি তাহাকে লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। কৃষক শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া রহিল।

"এখন কবিতাটির গদ্যার্থ যা দাঁড়ায় তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কোন কৃষক রাশি রাশি ধান কাটিয়া, কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া, কূলে নির্ভরসা হইয়া বসিয়া থাকে না; সে ধান সে বাড়ী লইয়া যায়। এবং কোন কৃষক ধান কাটিয়া গৃহে না লইয়া গিয়া, স্ত্রীপুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া এক 'যেন মনে হয় চিনি' মাঝির সহিত পলাইয়া যাইতে চাহে না। কৃষকের নির্ভরসা হইবার কোনই কারণ কবিতার কোন স্থানে পাওয়া যায় না। বরং রাশি রাশি ধান কাটিয়া তাহার বিশেষ উৎফুল্ল হইবারই কথা। কবিতাটি নিশ্চয় রূপক। কবি তাঁহার 'বৃহৎ আইডিয়া' প্রকাশ করিবার জন্য যে উপমা বাছিয়া লইয়াছেন, তাহা মূলে অস্বাভাবিক।···

"ইহা হইতে আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে হইবে। এই কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিবার জন্য রবিবাবুর অনেক ভক্তের নিকটে গিয়াছি। তাঁহাদের—'এ্যা—ও—কি জানেন' ইত্যাদি প্রায়ই শুনিয়াছি। কোন আদ্যন্তসঙ্গত ব্যাখ্যা পাই নাই।···

"কৃষক ধান কাটিতেছেন বর্ষাকালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে ধান কেহই কাটে না; বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে।···শ্রাবণ মাসে 'এল বরষা' কিরূপ? বঙ্গদেশে আষাঢ় মাসেই বর্ষা আসে। তাহার পরে 'একখানি ছোট ক্ষেত' হইতে 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধান' হইয়াছে! ক্ষেত বড়ই উর্বরা! ক্ষেতের চারিদিকে 'বাঁকা জল করিছে খেলা।' ক্ষেতখানি তবে একটি দ্বীপ। তবে এ চর জমি। এরূপ জমিতে ধান করে না। এ সব জমি শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ডুবিয়া থাকে। শীতকালে নদীগর্ভ হইতে বাহির হয়। তাহার পরে এক শ্লোকে পড়িলাম মাঝি 'তরী বেয়ে' আসিতেছে। তাহার পরেই দেখি 'ভরা পাল'। এরূপ অবস্থায় অর্থাৎ ভরা পালে কেহই তরী বায় না। শ্লোকের এক ছত্রে দেখিলাম নৌকা 'আসে পারে'। পরে

এক ছত্রে দেখি সে যায় 'কোন্ বিদেশে'। নিশ্চয় মাঝি নৌকা হঠাৎ ফিরাইয়া লইয়াছে। পরপারে তরুছায়া মসীমাখা মেঘে ঢাকা গ্রামখানির ছবিখানি রবিবাবুর এই ভক্তদের নিশ্চয় বড়ই ভালো লাগিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেঘে ঢাকা গ্রামে তরুচ্ছায়া হয় না, অন্ততঃ এপার হইতে তাহা দেখা যায় না। রৌদ্র হইলেই ছায়া হয়। তাহার পরে 'শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘনমেঘ ঘুরে ফিরে'—কি শব্দ-বিন্যাস! আহা! তবে কি না শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ জমাট হইয়া একদিক হইতে আর এক দিকে আসে—সে লাঠিমের মত 'ঘুরে ফিরে' না।—রবিবাবুর অন্ধ ভক্তগণ বলিবেন, আঃ, ওসব ধরিতে নাই। কেমন শুনিতে বল দেখি 'শ্রাবণ গগন ঘিরে'—যেন কেহ ধাঁই করিয়া তবলায় চাঁটি দিল—তাহার পর হউক বেতালা। কিন্তু ললিত শব্দবিন্যাস হইলেই বর্ণনা উত্তম হয় না। যদি কেহ লেখেন 'মধুর আষাঢ় মাসে আহা কি মলয় বায়, সুনীল জলধি জল, কমল ফুটেছে তায়'; তাহার পর 'মরি হায়' ভিন্ন আর কিছু শীঘ্র মুখে আসে না।

"তাহার পর এ কবিতায় 'খরপরশা' 'কোন দিকে নাহি চায়' 'থরে বিথরে' ইত্যাদি সব 'ধরে ভত্রে' মিল, কোনই অর্থ নাই। রবীন্দ্রবাবু এই কবিতা লিখিতে যেন কলম এলাইয়া দিয়াছেন। সুর নাই, তাল নাই, অথচ এই কবিতা পড়িয়া তাঁহার অন্ধ ভক্তগণ মোহিত। কেন? কারণ শেলী বোঝা যায় না, এও বোঝা যায় না। তার উপর রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং এ কবিতা লিখিয়াছেন! এ কি হয় যে এ কবিতার অর্থ নাই? আর লেখকের মতে অর্থ যদি বোঝাই গেল সে ত পদ্য হইয়া গেল?—গভীর!

"আমি এ কবিতাটির একটু দীর্ঘ ও তীব্র সমালোচনা করিলাম। কারণ রবীন্দ্রবাবুর অনেক ভক্তদের মুখে এ অর্থহীন কবিতাটির বড়ই বেশী প্রশংসা শুনিতে পাই। আমার বলা উদ্দেশ্য যে, হেঁয়ালিতে

কবিতা লিখিলেই কবিতা উত্তম হয় না।...যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার অক্ষমতা। তাহাতে গর্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না; কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট, স্বচ্ছ হইলে shallow বা অগভীর হয় না; কারণ, সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ; অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরী করিয়া, 'miraculous' দাবী করিয়া, স্পষ্ট কবিদের ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ; গুণ নহে।"

এই সমালোচনার প্রত্যুত্তর হিসেবে যদুনাথ সরকার সোনার তরীর একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিলেন[১] এবং উপসংহারে মন্তব্য করেন,..."রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাবে প্রচার করিতেছে। ('সোনার তরী'কে এ ভাবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বা আদর্শ মনে করা ভুল।) এই ভাবগুলি আমাদের পুরাতন-স্মৃতি অভ্যস্ত-ভাব হইতে ভিন্ন, অনেকের পক্ষেই নূতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা করা যায় না; এবং না বুঝিতে পারিয়া অমনি নব বাণীর দূতের প্রতি অথবা রবি-ভক্তগণের মধুচক্রে ঢিল ছুড়িলে শুধু 'হাসির সমালোচনা' রচনা করা হয়।..."[২]

দ্বিজেন্দ্রলাল এবার একটি প্যারডি লিখলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল

---

১ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩, পৃঃ ৪৬৭-৮।

২ দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেছেন,"...একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য-সমালোচনার 'অছিলায়' 'সোনার-তরীর' একটা অদ্ভুত, আধ্যাত্মিক অর্থ খাড়া করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে 'চাষা' বলিয়া গালি দিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না।" (দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৩২৪, পৃ. ৫৭২)। লেখক নিশ্চয়ই যদুনাথ সরকারের এই লেখাটিকেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু যদুনাথ দ্বিজেন্দ্রলালকে 'চাষা' বলে গাল দিয়েছেন—এ লেখায় তার কোনো নজির দেখি না।

এই কথা জানানো যে যে-কোনো কবিতারই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলে।

একটি পুরাতন মাঝির গান।

(আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)

(১)

ঘাটে ডিঙ্গা লাগায়ে বন্ধু পান খায়ে যাও!
পান খায়ে যাও বন্ধু, পান খায়ে যাও!

(২)

কোন গেরামের লাও তোমার কোন গেরামের লাও?
এক্‌টা কথা কও বা না কও, পান খায়ে যাও।

(৩)

আমার গাছের পান সুপারি, তোমায় দিমু ভাও।
বাড়ির কথা শ্যাষে হবে—পান খাইয়া যাও!

ব্যাখ্যা

(১)

ঘাটে=সংসারে; ডিঙ্গা=করুণা (তরী); লাগায়ে=দান করিয়া; বঁধু=হরি; পান খায়ে=দেখা দিয়ে; যাও=যাও। অর্থাৎ হে হরি। আমাকে করুণা করিয়া দর্শন দিয়া যাও।

এখানে 'ডিঙ্গা' অর্থ ছোট নৌকা নহে। কারণ, যিনি ভব-সংসারের কাণ্ডারী তাঁহার নৌকা যে কেন ছোট হইবে, বোঝা যায় না। এখানে ডিঙ্গের অর্থ, দেশী তরী। ইহা জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ নহে; গোয়ালন্দ ঘাটের ষ্টীমারও নহে; ইহা একান্ত দেশী নৌকা। অতএব, অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভক্ত কোনও বিজাতীয় ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন না, আমাদের হরিকেই ডাকিতেছেন। আর কবি "পান খেয়ে যাও" কেন বলিলেন? অর্থাৎ পুত্র যেমন পিতাকে ডাকে, ছাত্র যেরূপ গুরুমহাশয়কে ডাকে, ভক্ত সেরূপ ডাকিতেছেন না; প্রেমিকা যেরূপ প্রেমিককে ডাকে, ভক্ত হরিকে সেইরূপ ডাকিতেছেন। 'বিহরতি হরিহরি সরস বসন্তে।'—জয়দেব।"... ইত্যাদি।

॥ ৯ ॥

[১৩১৫-১৩১৬ ; ১৯০৮-১৯১০]

রচনা ঃ

প্রহসন	১৩১৫	১৯০৮
রাজাপ্রজা	”	”
সমূহ	”	”
স্বদেশ	”	”
সমাজ	”	”
কথা ও কাহিনী	”	”
গান	”	”
শারদোৎসব	”	”
শিক্ষা	”	”
মুকুট	”	”
শব্দতত্ত্ব	”	১৯০৯
ধর্ম	”	”
শান্তিনিকেতন (১-৮ম খণ্ড)	”	”
প্রায়শ্চিত্ত	১৩১৬	”
চয়নিকা	”	”
শান্তিনিকেতন (৯ম-১১শ ভাগ)	”	১৯১০
গোরা	”	”

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতা সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার পর রবীন্দ্রকাব্যে দুর্নীতি নিয়ে পড়েন। ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সাহিত্যে' "কাব্যে নীতি" নামে আবার একটা তীব্র প্রবন্ধ লেখেন। এবার তাঁর বক্তব্য হল এই—"দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম ও নীতির দিকে তাঁহারা আমার সহায় হউন।...

"কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল-নাটকেও প্রায় তাই। যেন, পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই ;—সব নায়ক আর নায়িকা।…তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়। ইঁহাদের চাই—হয় বিলাতী কোর্টসিপ, নয়ত টপ্পার প্রেম। নহিলে প্রেম হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী চাই-ই।…ফল দাঁড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় ইংরেজী (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক) না হয় দুর্নীতিমূলক। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যক।…

"উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। 'সে আসে ধীরে,' 'সে কেন চুরি করে চায়,' 'দুজনে দেখা হ'লে পথেরি মাঝে' ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান সবই—ইংরেজী কোর্টসিপের গান। তাঁহার 'তুমি যেও না এখনই,' 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' ইত্যাদি গান লম্পট বা অভিসারিকার গান।

"আশ্চর্যের বিষয় এই, এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয্যা-রচনা করা, মালা-গাঁথা, দীপ-জ্বালা—এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ।…রবিবাবুর খণ্ড কবিতাতেও ঐ একইরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই। নায়িকা ছাড়া রমণীজাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়।…এ সম্বন্ধে একটি বড় উদাহরণ না দিলে চলে না। রবীন্দ্রবাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যটি লউন।…রবীন্দ্রবাবু কোর্টসিপের অবতারণা করিলেন। কোর্টসিপ নহিলে প্রেম হয়? এ কোর্টসিপে একজন সামান্যা ইংরাজ-নারী সম্মত হইত না; কিন্তু একজন হিন্দু রাজ-কন্যা তাহা যাচিয়া লইলেন। রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে জঘন্য পশু চিত্রিত করিয়াছেন।… রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন। অশ্লীলতা ঘৃণার্হ বটে; কিন্তু, অধর্ম ভয়ানক। ঘরে

ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার ‘আস্তাকুঁড়’ হয় ; কিন্তু ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তেমন বঙ্গদেশে কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেজন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।

“আমি ‘চিত্রাঙ্গদা’র সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমা-ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পরে এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।”

চিত্রাঙ্গদার এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেন প্রিয়নাথ সেন, এবং তাঁর প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ‘সাহিত্যে’ই[1] প্রকাশিত হয়। প্রিয়নাথ প্রথমে চিত্রাঙ্গদা কাব্য ‘পাঠকের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ’ করেন। অর্থাৎ কাব্যটি সম্যক আলোচনা ক’রে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করেন। তারপর দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্যের উত্তর দেন। দ্বিজেন্দ্রলালের যে তিনটি আসল অভিযোগ ছিল অর্থাৎ, (১) অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলন বিনা বিবাহে নিষ্পন্ন হয়েছিল, (২) চিত্রাঙ্গদা উপযাচিকা হয়ে অর্জুনের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল, এবং (৩) এ কাব্যে courtship প্রবর্তন করা হয়েছে—এই অভিযোগগুলির অসারত্ব যুক্তির দ্বারা মনোজ্ঞভাবে প্রমাণিত করেন। রবীন্দ্রকাব্যের রসগ্রাহী সমালোচনা হিসেবে প্রিয়নাথ সেনের এই ‘চিত্রাঙ্গদা’ প্রবন্ধটি একটি আদর্শবিশেষ।

দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগগুলি খণ্ডনপ্রয়াসে প্রিয়নাথ বলেন,

১ ১৩১৬, কার্তিক। ‘প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি’ পুস্তকেও ঐ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত আছে।

"অর্জুন যখন চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহার তখনকার শেষ কথাগুলি স্মরণ করুন—

ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জুন সে সময়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কারণ নির্দেশ করিয়া বিবাহে সম্মত হন নাই।...

"বিবাহ যে হইয়াছিল, তাহা পাত্র এবং পাত্রীর চরিত্র-গৌরবও আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে।

"তাহা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল? এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব বিবাহই প্রশস্ত ছিল। সে বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি আসক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন ছিল না। যখন অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা পরস্পরের প্রতি এইরূপ প্রবলভাবে আকৃষ্ট, তখন তাঁহারা বিবাহের এমন শাস্ত্রসম্মত, সহজ ও সমীচীন উপায় থাকিতে তাহা হইতে আপনদিগকে স্বেচ্ছাক্রমে বঞ্চিত করিলেন, এ কল্পনা উৎকট—অসঙ্গত—এবং অস্বাভাবিক। স্বীকার করি, কাব্যের কোথাও স্পষ্টাক্ষরে গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ নাই; কিন্তু কাল, পাত্র-পাত্রী, উভয়ের চরিত্রগৌরব, কুলশীল, এবং শাস্ত্রবিধান সমস্তই কি অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করিতেছে না যে, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা পরস্পরে গান্ধর্ব বিবাহে মিলিত হইয়াছিলেন? মহাভারতে এই চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যানের অব্যবহিত পূর্বে 'উলূপ্যর্জ্জুনসমাগমঃ' নামক অধ্যায় আছে। সে অধ্যায়ে অর্জুন এবং উলূপীর যৌন-মিলন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ নাই; অথচ ঐ অধ্যায়েই

উলূপী সাধ্বী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং মহাভারতের পরবর্তী অংশে উলূপী অর্জুনের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত।...

"দ্বিজেন্দ্রবাবুর আর এক অভিযোগ চিত্রাঙ্গদা উপযাচিকা হইয়া অর্জুনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। প্রবন্ধে পূর্বাংশে যে অবস্থায় এবং যে কারণপরম্পরার সংযোগে চিত্রাঙ্গদা এইরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, আমরা তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, চিত্রাঙ্গদার এবংবিধ আচরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। অন্তঃপুরবাসিনীর লজ্জা-সংকোচ-শিক্ষা চিত্রাঙ্গদা কখনও পায় নাই বরং তাহার চরিত্র পুরুষের ন্যায়ই গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার সে চরিত্রে রবিবাবু যদি শুদ্ধান্তচারিণীর লজ্জা সঙ্কোচের আরোপ করিতেন, তাহা হইলে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও অসত্য হইত।...

"এই উপযাচিকার ভাব, যাহা দ্বিজেন্দ্রবাবুর নৈতিক সত্তাকে এত বিচলিত করিয়াছে, তাহা ত মহাভারতের বর্ণিত যুগের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বড়ই প্রবল ছিল। মনোগত ভাব প্রকাশে তাহাদের কোনরূপই সংযম দেখা যায় না। কোন পুরুষের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইলে তাহা তাহারা স্পষ্ট প্রকাশ করিত—রাখিয়া ঢাকিয়া বলিত না। তাহা ত হইবেই। যখন যৌন-মিলনের গান্ধর্ব-বিবাহ-পদ্ধতি রূপ এমন প্রশস্ত রাজপথ পড়িয়া ছিল, তখন রাখা-ঢাকার প্রয়োজন কোথা? রাখিলে ঢাকিলে যে গান্ধর্ব বিবাহই ঘটে না।

"দ্বিজেন্দ্রবাবু ভক্তি-শ্রদ্ধা-গদ-গদ-কণ্ঠে বলিয়াছেন, 'লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম সব দেশেই নারীজাতির সম্পত্তি।" সকল দেশের হউক না হউক—সকল কালের ত নয়-ই। এই মহাভারত কালের নয়। 'দৃষ্টান্ত চাই?' উলূপীর আখ্যান দেখুন না।...

"দ্বিজেন্দ্রবাবু courtship-এর উপর একেবারে খড়্গহস্ত। সমালোচ্য কাব্যে রবিবাবু courtship-এর অবতারণা করিয়াছেন

বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন, এবং ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'Courtship না হইলে প্রেম হয় ?' ইহার উত্তরে আমরা মুক্তকণ্ঠে অসঙ্কোচে বলি, না—courtship না হইলে প্রেম হয় না—প্রেম অসম্ভব। পাঠক আমাদিগকে ভুল বুঝিবেন না—আমরা এমন বলিতেছি না যে, courtship না হইলে বিবাহ হয় না—বিবাহ courtship ভিন্নও হয়, প্রেম ভিন্নও হয়। কিন্তু courtship ভিন্ন প্রেম জন্মিতে পারে না।···আমাদের মধ্যে বিবাহ-কালে বর কন্যাকে বলিয়া থাকে—

যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

কিন্তু ইহাও মন্ত্রবলে হইবার নহে, ইহারও আয়োজন চাই। কে এমন অন্ধ দুর্ভাগ্য আছে যে, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রেমের ভূমিকার সুন্দর এবং কবিত্বপূর্ণ আয়োজন দেখে নাই ? দ্বিজেন্দ্রবাবু নীতির দোহাই দিয়া রবিবাবুর যে সকল নির্দোষ ও পবিত্র গানের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এই পূর্বরাগের মাধুরীতে পূর্ণ।

"আমাদের গুরুজনভুয়িষ্ঠ একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের মধ্যে অপর সকলের অজানিতভাবে নববধূর স্বামীর নিকট লাজসঙ্কুচিত ধীর-পদক্ষেপে গমন—দ্বিজেন্দ্রবাবুর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অভিসারই নয় বলিলাম—নববিবাহিত পাত্রপাত্রীর পরস্পরকে 'চুরি করিয়া' বা অপাঙ্গে দর্শন, পূর্বরাগের এ সমস্ত মধুময় লক্ষণ রবিবাবুর সেই সকল অতুলনীয় গীতগুলির মধ্যে 'পঞ্চম রাগিণী'তে নিত্য গুঞ্জরিত।···"

॥ ১০ ॥

[১৩১৭-১৩১৯ ; ১৯১০-১৯১২]

রচনা ঃ

গীতাঞ্জলি	১৩১৭	১৯১০
রাজা	”	”
শান্তিনিকেতন (১২-১৩ ভাগ)	”	১৯১১
আটটি গল্প (বালক-বালিকাদের উপযোগী আটটি গল্প)	”	”
ডাকঘর	১৩১৮	১৯১২
ধর্মের অধিকার	”	”
গল্প চারিটি	”	”
মালিনী	”	”
জীবন-স্মৃতি	১৩১৯	”
ছিন্নপত্র	”	”
অচলায়তন	”	”

রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রতিমাসেই প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি মহাশয় ক্রমশই যেন ক্ষিপ্ত থেকে ক্ষিপ্ততর হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ যা কিছু লেখেন তাই তাঁর খারাপ লাগে। প্রবাসীতে যখন 'গোরা' বেরয়, তার কয়েকটি অংশ দেখেই তিনি লিখলেন, "...গোরা নামক বিতর্ক-বাদ বা উপন্যাস। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে যাহা পড়িয়াছি, 'গোরা' নামক মনোগ্রাফেও সেই সকল পুরাতন 'গৎ' বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসেও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন—ভারতবর্ষের ধর্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। এবং এই ধর্মতন্ত্র ও অন্য বিবিধ তন্ত্রের উপদ্রবে 'গোরা' উপন্যাসের নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। 'উদ্দেশ্যমূলক' উপন্যাস বর্তমান

যুগের ফ্যাশান বটে; কিন্তু 'গোরা'র উদ্দেশ্য এক নয়, বহু—এবং কিছু গুরুতর। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে জগতের বহু তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে যে তর্কজালের উদ্ভব হইয়াছে, পাঠকের মন নিতান্ত নাচারভাবে সেই লূতাতন্তুজালে জড়াইয়া যাইতেছে।"[১] ...

"শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিষ্ঠা'[২] নামক প্রহেলিকার সমস্যাপূরণ সহজ বুদ্ধির সাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মড়া-দাহের প্রাচুর্য দেখিয়া কষ্ট হয়,—এই সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ঘটা, তাহার পর চলিত ভাষার—অপশব্দের বৃষ্টি। বাঙ্গালা ভাষা যে বেওয়ারিশ ময়দা এবং কবিরা যে নিরঙ্কুশ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।"[৩]

"শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রমে আমাদের 'অবোধ্য' হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একটি গানের প্রথম কলি এই—

আজি শ্রাবণ ঘন-গহন মোহে,
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

শ্রাবণের ঘন গহনে পরিণত হইল, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু চরণ কেমন করিয়া 'গোপন' হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সাপের পা 'গোপন' বটে। কিন্তু এ 'গোপন' চরণ কাহার? পরে আছে—'নীলাজ নীল আকাশ।' 'নীলাজ নীল' কি, বুঝিতে পারিলাম না।"[৪]

---

১ সাহিত্য, ১৩১৫, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১১৬-৭।

২ ভারতী, ১৩১৬, বৈশাখ।

৩ সাহিত্য, ১৩১৬, বৈশাখ, পৃ. ৬৪।

৪ সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩১৬, পৃ. ২৯৩-৪।

"স্বরলিপির গানে[১] 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ইতি 'লেবেল' না দেখিলে রচনাটিকে কোনও অনুকারীর রচিত 'হনুকরণ' বা হেঁয়ালি বলিয়াই মনে হইত।"[২]

প্রবাসী পত্রিকায় অজিত চক্রবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা ধারাবাহিক আলোচনা করেন। এই লেখাই পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ আলোচনা সম্পর্কে আমরা যথাসময়ে বলব। এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল এই রচনাপাঠে 'সাহিত্য' যে মন্তব্য করেন—"শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' পরমকৌতুকে উপভোগ করিয়াছি। এই রবীন্দ্র-চরিত সম্ভবতঃ inspired। লেখক রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র ব্যবহার করিয়াছেন, কোন্ কাব্য লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ কোথায় বাস করিতেন, কি দেখিতেন, এবং কি ভাবিতেন, তাহারও ফর্দ পাইয়াছেন। সুতরাং Authentic। ভক্তির দুধ মারিয়া যে 'খোয়া' বা 'ড্যালা' ক্ষীর হয়, তাহাকে আরও জমাট করিয়া, সেই উপাদানে ভক্ত অজিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিমা গড়িয়াছেন, এবং তাহার উপর এত ফুল বিল্বপত্র চাপাইয়াছেন যে, মর-জগৎচারী রবীন্দ্রনাথকে আদৌ দেখিবার যো নাই, তবে ধূপের গন্ধে, ঘণ্টার বাদ্যে একটা পূজার আভাস পাওয়া যায়। অতিভক্তি ও অত্যুক্তি বোধ করি শ্যামদেশোদ্ভবা যমজ ভগ্নীদের মত একসঙ্গে গ্রথিত। অন্ততঃ 'রবীন্দ্রনাথ' পড়িয়া তাহাই মনে হয়। রবীন্দ্র-ভক্তিতে বর্তমান লেখককে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না;—অতএব তাঁহার অ-জিত অভিধান এত দিনে সার্থক হইল।"[৩]

'অচলায়তন' সম্বন্ধে মন্তব্য করা হল—"···ন=নাস্তি আটকো

১ প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৬। 'জগত জুড়ে উদার সুরে' গান দ্রষ্টব্য।

২ সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬, পৃ. ৪৬২।

৩ সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃ ৩২৩।

যস্মিন্, তাহাই যখন নাটক, তখন বঙ্গীয় মহাকবিদের কল্পনাকে মস্তিষ্কের ফাটকে আটক রাখিবার কোনও কারণ নাই। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি,—'অচলায়তনে' রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। মেঘনাদ মেঘের আড়াল হইতে বাণ বর্ষণ করিতেন। আজকাল অনেক ব্রাহ্ম ও কালাপাহাড় লেখক সাহিত্যের অন্তরাল হইতে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিতেছেন। 'অচলায়তনে'র প্রধান প্রতিপাদ্য-হিন্দুধর্ম অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, হিন্দুর মন্ত্র ব্যর্থ বাগাড়ম্বর, হিন্দুর সমস্ত অনুষ্ঠান বিদ্রূপের উদ্দীপক। কূপমণ্ডূকের মক্‌মকে সুবিস্তৃত 'অচলায়তন' মুখরিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'মেটারলিঙ্ক' হউন, আমরা আনন্দিত লাভ করিব। কিন্তু না বুঝিয়া হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিবেন না।"[১]

'জীবন-স্মৃতি'কে বলা হল পল্লবিত রচনা।—'জীবন-স্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের আত্ম-জীবন-চরিত। রবীন্দ্রনাথ এবার 'ভৃত্যরাজক তন্ত্রে'র বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাত আট বৎসর বয়সে সংঘটিত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পড়িয়া কবিবরের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 'জীবন-স্মৃতি' পল্লবিত রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।"[২] কিছুদিন পরে এ মন্তব্যের জের টেনে বলা হল—"কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' উপন্যাসের মত মনোরম। রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের এক একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় তাহার ছবি আঁকিতেছেন। আপনার অতীতকে বর্তমান কালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত করিয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন। সুদূর অতীতে তখনকার রবীন্দ্রনাথ যে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, সেই সেই অবস্থাচক্রে পড়িলে এখনকার রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে ও

১ সাহিত্য, কার্তিক, ১৩১৮, পৃ ৫৭১।

২ ঐ।

ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতেন, কল্পনাকুশল কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সুখপাঠ্য সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে কবিত্ব আছে; সৌন্দর্যসৃষ্টি আছে; কল্পনার লীলা আছে। স্থানে স্থানে কৌতুক ও শ্লেষের আলোকপাতে রচনাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"[১]

এই সময় রবীন্দ্র-সমালোচনার আসরে নামলেন বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিন পাল তখন স্বাদেশিকতায় ও বাগ্মিতায় দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন। জনসাধারণের চিত্তে তাঁর তখন বিপুল প্রভাব ও অধিকার। তিনি রবীন্দ্র-সংবর্ধনার[২] অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৃতির একটা সামগ্রিক বিচার সম্বলিত রচনা 'বঙ্গদর্শন'-এ[৩] প্রকাশ করেন। রচনার নাম 'চরিত-চিত্র—রবীন্দ্রনাথ'। এ রচনার মূল বক্তব্য হল রবীন্দ্র-সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাব। কথাটি খুব জোর দিয়ে বলা হল, এবং জানানো হল যে রবীন্দ্র-সাহিত্য যে বস্তুতন্ত্র হতে পারে নি তার কারণ রবীন্দ্রনাথের কুলশীল ও পরিবেশ।

রবীন্দ্র-সংবর্ধনাও যে বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রতিভার জন্যে ঘটে নি—প্রথমেই বিপিনচন্দ্র তার উল্লেখ করলেন। "তাঁর কুলের গৌরব ও ধনের গৌরব, রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবিপ্রতিভার সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বর্ণ-সোহাগা যোগ সম্পাদন করিয়াছে। এরূপ যোগাযোগ সংসারে অতি বিরল। এই শুভযোগ না হইলে আজ রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর দ্বারা যে সমারোহসহকারে সম্বর্ধিত হইয়াছেন, সেরূপ ভাবে সম্বর্ধিত হইতেন কি না সন্দেহের কথা।"

এবার আমরা বিপিনচন্দ্রের রচনা থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি দিচ্ছি

১ সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩১৯, পৃ ৮৬।

২ ১৪ই মাঘ, ১৩১৮ (কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত)।

৩ চৈত্র, ১৩১৮।

তার থেকেই পরিস্ফুট হবে তাঁর আসল বক্তব্য। "…রসানুভূতির তীক্ষ্ণতা ও অধ্যাত্ম-দৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরে, বাংলায় জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।…তবে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অন্যদিকে সেই পরিমাণে তাঁর রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতা বৈষ্ণব-কবিদিগের অপেক্ষা হীন বলিয়াই মনে হয়।

"…যে ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা ও রসানুভূতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে, তাহাই আবার তাঁর দুর্বলতারও মূল কারণ হইয়া আছে।… এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বস্তু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগের ধর্ম-সংস্কারকদিগের ইহা একরূপ সাধারণ ধর্ম বলিলেও হয়। যে ব্যক্তিত্বাভিমান আমাদের দেশে ও অন্যত্র শাস্ত্রগুরুর প্রয়োজন ও প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া, আপনার ধর্মের প্রামাণ্যকে একান্ত ভাবেই প্রাকৃত বুদ্ধি-বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহা এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতারই ফল। এই অন্তর্মুখীনতার আতিশয্য হইতেই, ইংরাজীতে যাহাকে subjective individualism বলে, তাহার উৎপত্তি হয়। এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির উপরেই বহুদিন হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজে ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে।…

"রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির বা subjective individualismএরই রূপান্তর মাত্র। এ বস্তু তাঁর পৈতৃক ও সাম্প্রদায়িক। যে শিক্ষা ও সাধনাতে এই অন্তর্মুখীনতাকে বস্তুসংস্পর্শে সংযত ও শোধিত করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সে শিক্ষা ও সাধনা লাভ করেন নাই। কলিকাতার আধুনিক অভিজাত সমাজ একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন।

সহরের সমাজে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রমুক্ত মেশামেশির অবসর ও প্রবৃত্তি থাকিতেই পারে না।··· ইঁহাদের জীবনের অন্তঃপুরে জনসাধারণের প্রবেশপথ নাই। জনসাধারণের জীবনের অন্তঃপুরেও ইঁহাদের কোনো প্রবেশপথ নাই।···

"রবীন্দ্রনাথ এই ধনী-সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠেন। তার উপরে মহর্ষি আপনার ধর্মমতের জন্য সমাজচ্যুত হওয়াতে, তাঁর পরিবারবর্গের জীবন কলিকাতার সাধারণ ধনী-সম্প্রদায়ের জীবন অপেক্ষাও সংকীর্ণতর হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রের উদার প্রাণ, এই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক মুক্তভাব আস্বাদন করিবার জন্য, আশৈশবই এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে বিহার ও বিচরণ করিয়াছে। তাঁর আপনার পরিবারের দু-চারটী প্রাণের সঙ্গেই রবীন্দ্রের প্রাণের প্রত্যক্ষ ও সত্য যোগাযোগ ছিল। এই গুটিকয়েক আধারেই রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে লোকচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির এই গুটিকয়েক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের উপরেই রবীন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। এর বাহিরে তিনি যাহা গড়িতে গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই প্রকাশিত হইয়াছে, সত্যের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

"রবীন্দ্রনাথ শতরঞ্চগালিচামণ্ডিত ত্রিতল প্রাসাদকক্ষে বসিয়া মানসচক্ষে কর্দম-মর্দিত পিচ্ছিল পল্লীপথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুচিক্কণবপু সুমার্জিতরুচি, স্বজনবর্গে পরিবৃত থাকিয়া, সুদূর দরিদ্রপল্লীর শুষ্কদেহ, রুক্ষকেশ নরনারী সকলের অপূর্ব তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।···

"আমি ভুলি নাই যে, তাঁর পৈত্রিক জমিদারী তত্ত্বাবধানের

ভার কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথের উপরেই ন্যস্ত ছিল। এবং এই উপলক্ষে তিনি বহুকাল শিলাইদহ ও অন্যান্য স্থানে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে বাংলার পল্লীজীবন পর্যবেক্ষণ করিবার অবসরও পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বাহ্য যোগ-নিবন্ধনই যে সে জীবনের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, একেবারে এ মীমাংসা করা যায় না। বড় বড় জমিদারীর 'বাবুদের' সঙ্গে তাঁহাদের প্রজাসাধারণের কোনো প্রকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রযুক্ত মেশামেশি কুত্রাপি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ধনপদাদির অবস্থার আকস্মিক তারতম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রাণে টানিয়া লইবার জন্য একটা লালসা ধর্মপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যে সময় সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য।···কিন্তু এ সকল সাধুচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতা মাত্রই প্রকাশিত হয়, সে সকল চেষ্টার সফলতা তো আর সপ্রমাণ হয় না। বড় ছোট উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির উপরেই এ সকল চেষ্টার সফলতা নির্ভর করে। আর এ আত্মবিস্মৃতিলাভ কোনো পক্ষেরই সহজ নহে। বিশেষতঃ পাত্রিজনসুলভ সৌহার্দ্য ও বিশ্বমানবীপ্রেমে কিছুতেই এরূপ আত্মবিস্মৃতি জন্মানো সম্ভব হয় না।···এই ব্যবধান নষ্ট হয় নাই বলিয়াই, আপনার জমিদারীর পল্লীসমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও, ঔদার্যসাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও, বাংলার পল্লীজীবন ও বাঙালীর সাচ্চা প্রাণটা চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।

"রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই এইরূপ মায়িক। উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার

করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতেই অনেক সময় ভাবের ও রসের তত্ত্ব সকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্য যেমন কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, দুচারখানি বৃহদাকারের উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে কচ্চিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কেবল রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গের বা তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁর চরিত্রগুলি অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে 'গোরা'র হারাণবাবুটী অপূর্ব বস্তু হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুটিকতক চিত্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই মায়িক। আর যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মায়ার প্রভাব বেশী, সেইরূপ তাঁর সমাজ সংস্কারের প্রয়াস ও ধর্মের শিক্ষাও বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রহীন হইয়াছে।

"...রবীন্দ্রনাথের কাব্য অনেক সময়ই চিত্তকে মুগ্ধ করে, কিন্তু স্নিগ্ধ করিতে পারে না। জ্ঞানের, ভাবের, কর্মের পিপাসা বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু সে পিপাসার নিবৃত্তি করিতে পারে না।...রবীন্দ্রনাথ একবার 'ততঃ কিম্?' নামে একটী উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লেখাতেও প্রায় সর্বদাই ঐ দুর্দমনীয় প্রশ্নটী জাগিয়া রহে।"

বলা বাহুল্য, বিপিনচন্দ্রের এই রবীন্দ্র-স্বরূপ ব্যাখ্যা সমাজপতি মহাশয়কে তুষ্ট করে। তিনি তাঁর পত্রিকায় এই প্রবন্ধের উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন, "চরিত্র-চিত্রে শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ, তাঁহার কবিপ্রতিভা, তাঁহার অন্তর্মুখীনতা, তাঁহার মায়িক

ও মায়াশক্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে সকল বাঙ্গালী লেখক রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার সমস্ত রচনার মোসাহেবী করেন, এই প্রবন্ধপাঠে তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই প্রবন্ধের অনেক স্থলে অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব আশ্রিত-মাসিকে তাহার অবতারণা দেখিয়া আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছি।"[১]

'সাহিত্য' পত্রকে আর একটি রবীন্দ্র-সমালোচনা খুব উৎফুল্ল করল। রচনার নাম 'কাব্যে গন্ধ'। অমরেন্দ্রনাথ রায় নামক এক নবীন লেখকের লেখা। ১৩১৯ সালের 'অর্চ্চনা' নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। নবীন লেখকের হাতে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা হতে দেখে সমাজপতি মহাশয় রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠলেন। রচনাটির প্রতি 'সাহিত্য'-পাঠকদের দৃষ্টি বেশ করেই আকর্ষণ করলেন। তিনি লিখলেন, "এই প্রবন্ধে লেখক নিপুণভাবে কবিবর রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনাটি নির্ভীক সুস্পষ্ট ও সুযুক্তিপূর্ণ। আমরা সকলকে, বিশেষতঃ কবিবরের অন্ধ স্তাবকগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। লেখক লিখিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখা পড়িতে আমরা বড় ভয় পাই। তাঁহার পাকান ঘোরানো প্যাঁচওয়ালা ভাষাব্যূহ যদি বা কোন প্রকারে ভেদ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার মর্মকোষের গন্ধ, ঘনানন্দ প্রভৃতি কবিত্ব-কুহেলিকা মনে এমন একটা বিষম বিভীষিকা জন্মাইয়া দিয়াছে যে, সে জন্য তাঁহার আধুনিক রচনাগুলি পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত কবিবরের এই 'জীবন-স্মৃতি'র স্থলবিশেষ আমাদের কাছে দুরধিগম্য, যেন ভাষার গোলকধাঁধাঁ; এই কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ভক্তগণ হয়ত একটু মুচকি হাসিয়া

---

১ সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩১৯, পৃ. ২৭০।

বলিবেন—ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল:গন্ধ।—গন্ধই বটে! বিনয়ের বেড়ায় ঘেরা আত্মম্ভরিতার এমন ঝাঁজাল তীব্র গন্ধ আর কোথাও আজ পর্যন্ত পাই নাই।'—নিরপেক্ষ পাঠকেরা এ কথা অস্বীকার করিবেন না। তবে রবি-ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র। কবিবরের অসামান্য প্রতিভার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার মত 'নিতুই নব'; কবিবরের নিকট আজ যাহা 'হাঁ' কাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি, এমন কি কাব্যনীতিতেও কবিবরের মত নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। লেখক কবিবরের রচিত আধুনিক ও অতীত কালের নানা প্রবন্ধের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া 'চোখে আঙ্গুল' দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,—কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বে কবিবরের যে মত ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ পবিবর্তিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে স্বয়ং কাব্য কাহাকে বলে, কাব্যের উদ্দেশ্য কি, এবং তাহার অস্পষ্টতার কারণ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, আমরা আজ সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার আধুনিক মতের অসারতা 'প্রমাণ' করিয়া দিব। তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যাঁহাদের পক্ষে বেদবাক্য বলিয়া ধারণা তাঁহাদের সে ভুল ধারণা ভাঙ্গিতে পারে।'—কিন্তু ভাঙ্গিবে কি? যাহারা জাগিয়া ঘুমায়, তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিবার নয়। রবীন্দ্রনাথ বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, একদিন কোনও নবীন লেখক তাঁহারই অস্ত্রে তাঁহাকে জর্জরিত করিবে। ইহাকেই বলে, 'যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া'।"[১]

'অচলায়তন' সম্বন্ধে 'সাহিত্যে' যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করা হয়েছে এই ধারণাবশেই রবীন্দ্রনাথের উপর তিরস্কার বর্ষিত হয়। এই ধারণাই

---

১ সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩১৯, পৃ. ৩৬২-৩।

প্ররোচিত করে তখনকার বিখ্যাত রস-সমালোচক অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অচলায়তনে'র সমালোচনা করতে। এই সমালোচনা প্রকাশিত হয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায়।[১] লেখক বলেন, "সাধনার যে উচ্চস্তরে পৌঁছিলে শিবদুর্গা, কালীকৃষ্ণ ভেদবুদ্ধি থাকে না, সেই স্তরে পদন্যাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুটরূপে দেখাইতেছেন যে, আচারনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের গুরুদেব এবং পতিত আচরণীয় (নমঃশূদ্র) দর্ভকগণের গোঁসাই এবং আহারবিহারে অনাচারী ম্লেচ্ছযবনের দাদাঠাকুর একই বস্তু। ভেদ কেবল উপসনার প্রণালীতে। দাস্য ও মাধুর্য, পূজা-অর্চা জপতপ হোমযজ্ঞ অপেক্ষা অধিকতর মহৎ ও পবিত্র। কবি এই সনাতনী কথা বাক্যচ্ছলে শিখাইতেছেন।

("কিন্তু 'অচলায়তনে'র আর একটা দিক আছে। সেটা বোধ হয় বর্ণাশ্রমধর্মী, তন্ত্রস্মৃতিপুরাণভক্ত হিন্দু মনঃপ্রীতিকর হইবে না। বিবেকানন্দ যাহাকে ছুৎমার্গ বলেন, বর্তমান কবি তাহার উপর, হিন্দুর সেই আচারমার্গের উপর, বিষদিগ্ধ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। ...গোরায় যেমন ব্রাহ্মসমাজের দুই শ্রেণীর লোক—পানুবাবু ও পরেশবাবু—চিত্রিত হইয়াছেন, তেমনই হিন্দুসমাজেরও দুই শ্রেণীর লোক কৃষ্ণদয়ালবাবু ও আনন্দময়ী চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু 'অচলায়তন' হিন্দুসমাজেরই একচেটিয়া অধিকার। জপতপ মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ড স্নানদান উপবাস ব্রতনিয়ম সমস্তই তীব্র শ্লেষবিষে

"অনুষ্ঠান-বাহুল্যে হৃদয় শুষ্ক হয়, মন আড়ষ্ট হয়, প্রাণ অচেতন হয়, আত্মা অসাড় হয়, তাহা অচলায়তনের আচার্য যেমন বুঝিয়াছেন, পঞ্চক যেমন বুঝিয়াছে, আমরাও যে তেমন বুঝি না এরূপ নহে।

১ কার্তিক, ১৩১৮।

মন্ত্রতন্ত্র আচমন আসন অঙ্গন্যাস যে আসল বস্তু হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায় তাহাও বুঝি। বুঝিয়াও বলিতে ইচ্ছা হয়—ইহার শেষ মীমাংসা কি? পৃথিবীর সর্বত্র সকল ধর্মেরই ত এই দশা।…মানুষ চিরকালই দুর্বল, তাহার মনের বল পরিমিত, সে চিরকালই নিয়মের মোহে অভিভূত। একটা বিরাট মনুষ্যসমাজ সে মোহ কাটাইয়া 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' হইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, শুধু দাদাঠাকুরকে লইয়া ছুটোপুটি খেলিবে, তাহার লক্ষণ খুব সুস্পষ্ট দেখিতেছি না।"

আর্ট হিসেবেও অচলায়তনকে বিচার ক'রে লেখক দু-চার কথা বলেন। যথা, "আর্ট হিসাবে দেখিতে গেলে নাটকখানির বহু গুণ আছে। বিদ্রূপ বাক্যগুলি উপভোগ্য, পূর্বেই বলিয়াছি, পঞ্চকের গানগুলি পড়িলে বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা কত উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়াছে। ইহাতে সাধকের প্রেমময় হৃদয়ের একটি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পাড়িয়াছে। ভাষা যেমন সরল তেমনই মধুর।…আর্ট হিসাবে নাটকখানির একটি দোষ দেখা যায়। রচনাটি যেন অত্যন্ত diffuse; হিং টিং ছটের সে compactness ইহাতে নাই, হেঁয়ালি নাট্যের সে খোলা প্রাণের (wit) রসিকতা যেন ঈষৎ অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

ললিতকুমার তাঁর সমালোচনার দ্বারা একটা উপকার করলেন; তা হল এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রত্যুত্তর আদায় করলেন।[১] ফলে, অচলায়তনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবির নিজের উক্তি পাওয়া গেল। তিনি লিখলেন, "…আপনার মত বিচারক যখন আমার কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করেন, তখন প্রথার খাতিরে ঔদাসীন্যের ভান করা আমাদ্বারা হইয়া উঠে না। সাহিত্যের দিক দিয়া আপনি অচলায়তনের উপর যে রায় লিখিয়াছেন তাহার

১ আর্যাবর্ত, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমি কোনো আপিল রুজু করিব না। আপনি যে ডিক্রি দিয়াছেন সে আমার যথেষ্ট হইয়াছে।

"কিন্তু ঐ যে একটা উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া আমার উপরে একটা মস্ত অপরাধ চাপাইয়াছেন সেটা আমি চুপচাপ করিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।...

"জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড় হইয়া উঠে; সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়—এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য। সেই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে।...

"আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন উপায় কি? 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়াই কি মানুষের পেট ভরিবে? অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানের বাধা দূর করিলেই কি মানুষ কৃতার্থ হইবে? তাই যদি হইবে তবে ইতিহাসে কোথাও তাহার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না কেন?

"কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কি অচলায়তনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইয়াছে? অচলায়তনের গুরু কি ভাঙ্গিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই—না তা যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাঙ্গা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে? গুরু আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড় করিবার জন্যই।...ভাবও রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায়—তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যুই আছে।... শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে

যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জানাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন—যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বালু-বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। একথা কেবল যে আমাদের দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে—ইহা সকল দেশেই সকল মানুষের কথা। অবশ্য এই সার্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীয় রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা যদি না করিত তবে ইহা অপাঠ্য হইত।"

স্পষ্টই দেখছি, এই সময় রবীন্দ্র-বিরূপ সমালোচনা খুবই স্ফীতকায় হয়ে ওঠে। এই উত্তুঙ্গ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে গাণ্ডীব ধরেন অজিত-কুমার চক্রবর্তী। প্রকৃত সমালোচনার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল অতুল। তিনি সব্যসাচীর মতো একহাতে রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন, অন্যহাতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসগ্রাহী বিচার ও বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সকল সৃষ্টি বস্তুতন্ত্রতাহীন ব'লে যে অভিযোগ করেন তার প্রত্যুত্তর হিসেবে অজিতকুমার জবাব দেন 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও দেশচর্চা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন?' নামক প্রবন্ধে।[১] তিনি বলেন, "...ঘটনার দিক দিয়া কোনো মানুষকেই বিচার করাটাই অন্যায়, কবিকে বিচার করা আরও অন্যায়,—কারণ তাঁহার জীবনটাই ভাবময় জীবন। ...বিপিনবাবু ঠিক সাহিত্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই, তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিয়াছেন এবং জীবনের এমন সকল ভাগ এমন সকল ঘটনার দিক দিয়া বিচার করিতে গিয়াছেন, যাহার সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগই নাই।...

১ প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯।

লেখক যে তত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যের বিভেদ অস্বীকার করেন এবং উভয়কে যে একই প্রণালীতে বিচার করিতে হইবে এমন কথা বলেন তাহা তো বোধ হয় না।···'কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপর সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন' এবং লেখক বলিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহাই করিয়াছেন। তবে কেন সেই কারণেই তিনি তাঁহার অধিকাংশ রচনাকে বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন? কবির সঙ্গে দার্শনিকের বৈজ্ঞানিকের কোথায় কতটুকু প্রভেদ তাহা নিজেই একরূপ স্থির করিয়া তারপর নিজেরই সিদ্ধান্তকে প্রয়োগের বেলায় লেখক কি বেমালুম অস্বীকার করিতেছেন না? বস্তুবিচ্ছিন্ন (abstract) ভাবে লেখক কবির যথার্থ স্বরূপ ঠিক দেখিতে পান্—কিন্তু বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ (concrete) কবির বেলাতেই তাঁহার স্বরূপ ভুল হইয়া যায়—ভাবে ও অন্তরে এতটা গোলযোগ বস্তুতন্ত্রপোষক লেখকের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমি কোনমতেই মনে করি না।···

"ব্রাউনিং বল, গ্যয়টে বল, ওয়ার্ডস্বার্থ বল, সকলেরি মধ্যে এই একটি জীবনের তত্ত্ব অন্তর্নিহিত ভাবে তাঁহাদের সকল বয়সের সকল রচনার তলে তলে জাগিয়া রহিয়াছে।···রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এইরূপ একটি জীবনের তত্ত্ব আছে, আর সেই জন্যই তাঁহার কবিতাকে কেবল ক্ষণিক আত্মগত অনুভূতির প্রকাশমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। যিনি তাঁহার সমস্ত কবিতা আগাগোড়া পাঠ করিয়াছেন, এবং তাঁহার জীবনের সকল বাহিরের আপাতঃ-বিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যেক অবস্থার ভাবের দিক হইতে একটি গভীরতর যোগ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। আমি আমার 'রবীন্দ্রনাথ' (গত বৎসরে প্রবাসী—আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধে সেই জীবনের তত্ত্বটি কবির সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া অনুসরণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।···

'মানসী' পর্যন্ত যে তত্ত্বের আভাস, যে, সমস্ত খণ্ড অনুভূতিকে একটি অখণ্ড বিশ্বানুভূতির মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পর্যবসিত না করা পর্যন্ত ইহাদের আপনাদের কোন পরিতৃপ্তি নাই, কোন সত্যতা নাই —সেই তত্ত্বই 'সোনার তরী' 'চিত্রা' ও 'চৈতালী'তে পরিস্ফুট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। দেউল, আকাশের চাঁদ, পরশ-পাথর, বৈষ্ণব কবিতা, স্বর্গ হইতে বিদায়, এ-সকল কবিতা কল্পনায় গড়া মায়ালোক হইতে বাস্তব বিশ্বলোকে প্রত্যাবর্তন করিবারই কথা সজোরে ঘোষণা করিয়াছে। বিপিনবাবু কি এই-সকল কবিতাকেও বস্তুতন্ত্রতাবিহীন ও মায়িক বলিতে চান? বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইল এই-সকল কবিতার চেয়ে অধিক বস্তুতন্ত্র, কারণ তাঁহারা মোহান্তগুরু মানিতেন, কিন্তু এ-কথা লেখক একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে বৈষ্ণব কবির

'সে গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে।'

কারণ—

'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।
* * *
সে সঙ্গীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা!'

'রবীন্দ্রনাথের কবিতা কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে' এ মত বিপিনবাবু কেমন করিয়া সমর্থন করিতে পারেন তাহা তো আমি ভাবিয়া পাই না। এ একেবারে বহিঃপ্রামাণ্যহীন স্বানুভূতির উক্তি।···

"বাংলার পল্লীজীবন কবিতায়, গল্পে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এত প্রচুর রকমে, এত অনায়াস স্ফূর্তিতে আর কে আঁকিয়াছেন আমি তো তাহা

জানি না।...সমস্ত গল্পগুচ্ছটিকে গল্পগুচ্ছ নাম না দিয়া বাংলার পল্লীচিত্রমালা নাম দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। বাংলার যথার্থ পল্লীচিত্র, পল্লীজীবনের যথার্থ মানুষের সুখদুঃখের এমন করুণ নিপুণ অঙ্কনে আর কে এমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন জিজ্ঞাসা করি? বাঙালীকে তাহার আপন দেশের এমন ঘরের খবর এমন বুকের খবর আর কোন্ কবি কোন্ গল্পলেখক দিয়াছেন? এমন গল্প যদি বাস্তবচিত্র না হয়, তবে বাস্তবচিত্র কোথায় আছে তাহা বিপিনবাবু অনুগ্রহ পূর্বক বাঙালী পাঠকসমাজকে দেখাইয়া দিলে সুখী হইব।"

আগেই বলেছি অজিত চক্রবর্তীর লেখনী কেবলমাত্র প্রত্যুত্তর দানের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, তিনি তাঁর লেখনীকে সুনিপুণভাবে চালিত করেছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসগ্রাহী আলোচনা ও পরিচয়-প্রদান করার কাজে। তিনি এইকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনা করেন। এই আলোচনাগুলিতে ওতপ্রোত হয়ে আছে অজিতকুমারের দীপ্ত মনীষা ও গভীর সাহিত্য রসবোধ।

('ডাকঘর' প্রকাশিত হতেই অজিতকুমার তার সমালোচনা করেন 'ভারতী'তে—১৩১৮ সালের চৈত্র সংখ্যায়। এই আলোচনার প্রারম্ভে তিনি সমালোচনার যে সংজ্ঞা দেন তার থেকেই বোঝা যায় সমালোচনাকে তিনি কতোখানি মূল্যবান মনে করতেন, এবং সেই হিসেবে নিজেকে কতোখানি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর মতে, "কবির সৃষ্টির যে আনন্দ তাহাই পুনরায় নিজের মধ্যে সৃজিত করিয়া তোলা, ইহারই নাম সমালোচনা।...কিন্তু হায়, তেমন সমালোচনার শক্তি কিম্বা সুযোগ কোথায়? ইচ্ছা থাকিলেও ঠিক মনের আনন্দটুকু জ্ঞাপন করিয়া এখন বিদায় লওয়া যায় না। তাহার কারণ কবির সঙ্গে পাঠকদের সঙ্গে এখন বোঝাপড়া নাই। কবির আসরে পাঠকরা স্থান পান না,—কবি থাকেন "hidden

in the light of his thought", আপনার চিন্তার আলোকে আপনি আবৃত। কাজেই বেচারা সমালোচককে মধ্যস্থের কাজ করিতে হয়। একবার কবির দরবারে, একবার পাঠকদের আড্ডায় দুই জায়গায় ঘুরিয়া তাহাকে সম্বাদ বহন করিয়া বেড়াইতে হয়।..."

ডাকঘর সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য যে কতোখানি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-নির্ভর ও যথার্থ ছিল তা রচনাটি সম্পূর্ণ পড়লে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে অজিতকুমারের বিচার-বিশ্লেষণের শক্তির পরিচয় দিচ্ছি। ডাকঘর সম্পর্কে প্রথমেই তিনি জানালেন, "ডাকঘর ও তাহার পূর্ববর্তী 'রাজা' যে ধরণের নাটক এ ধরণের নাটক বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন। বলা বাহুল্য এ দুইটিই 'হেঁয়ালী' শ্রেণীভুক্ত। ইহার পূর্বে বোধহয় 'সোনার তরী' এবং 'পরশপাথর' ধরণের কবিতা ছাড়া কবি আর এমন কিছু লেখেন নাই যাহার জন্য তাঁহাকে লোকে দুর্বোধ্য বলিয়া অপবাদ দিয়াছে। ঐ কবিতাগুলিই ঠিক কোন নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে ধরা দিতে নারাজ।"

তারপর ধীরে ধীরে এ নাটক ও এ জাতীয় রচনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।— "অথচ সেই পূর্বের রূপকজাতীয় কবিতার সঙ্গে আর এখনকার এই নাটকগুলির সঙ্গে আমি ভারি একটি মিল এক জায়গায় দেখিতে পাই। আমার মনে হয় ইহাদের মূল ভাব একই, কেবল রূপ স্বতন্ত্র। কতগুলি রস যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি...কিন্তু অনন্তের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায়, তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট হইবার নহে। কারণ সেই বিশেষ অনুভূতিটাই কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা আরও কঠিন হইয়া বসে। তখন symbol অথবা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়,

অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইসারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।··· অনন্তের রসবোধ যখন সাহিত্যের দরবারে আসিয়া রূপ প্রার্থনা করে, তখন সাহিত্যস্রষ্টাকে বিপদে পড়িতে হয়। তাহাকে পণ করিতে হয় কি করিয়া রূপ দিয়াও রূপ না দেওয়া যায়। কারণ রূপ যে সীমাবদ্ধ, সে এমন ভাব কি করিয়া প্রকাশ করিবে যাহা সীমায় ধরা দিবে না? তখন তাহার একমাত্র সম্বল হয় উপমা বা রূপক।···

("ডাকঘরকে symbol অর্থাৎ বিগ্রহরূপী নাট্য নামকরণ করা গেল। এটা ঠিক নাম নয়, কিন্তু নির্দেশ মাত্র।···

"ঘটনার পর ঘটনা সাজাইলেই কি সব সময়ে ঔৎসুক্য বেশি করিয়া জাগে? আমার তো মনে হয় ভিতরের চিন্তা কল্পনা ও অনুভূতির একটা ক্রমবিকাশের গতিবেগ বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল।··· এই নাটিকাতেও কবিজীবনের যে সকল নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির সৌন্দর্যের যে সকল সূক্ষ্ম অনুভাব নানা স্থানে মূর্তিলাত করিয়াছে, কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা পাঠ করিতে করিতে পদে পদে বিস্ময় অনুভব করিতে থাকিবেন। ঠিক যেন একটি অজানা দেশের মত। তাহার পথের প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক বাঁকে নব নব বিস্ময়—তাহা ছাড়া তাহার নানা গলিঘুঁজির তো কথাই নাই। সেই বিস্ময়ের আলোড়নেই সমস্ত নাটিকাটি সজীব হইয়া আছে।···

"ইউরোপেও symbolical নাটকের যুগ সুরু হইয়াছে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাটি মেটরলিঙ্কের নাট্যগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। লরেন্স এল্‌মা টেড়েমা প্রভৃতি সমালোচকবর্গ তাঁহার নাটকের মধ্যে প্রাচীন ধর্মের জীর্ণ ভিত্তির উপর নূতন অধ্যাত্মবোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কি সে চেষ্টা নাই? তিনিও আমাদের দেশের পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধের দৃষ্টি লাভ করিবার

জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল, তেমনি বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই।…সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্ম-বোধকে কোন গোপন পন্থায় হারাইতে না দিয়া তাহাকেই বিশ্বের দিকে ব্যাপ্ত করিবার, সত্য করিবার জন্য কি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি একান্ত প্রয়াস নাই?"

এ সমালোচনা সম্পর্কে 'সাহিত্য'-সম্পাদক মন্তব্য করেন এইরূপ।—"শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটকের সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনার বিপুলতা দেখিয়া 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'র কথা মনে পড়ে, দ্রৌপদীর বসনের মত এ সমালোচনা-স্তব ও প্রহেলিকার জটিল জাল ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে। কথার এমন প্রবাহ সচরাচর দেখা যায় না।…এই সকল দাঁতভাঙ্গা শব্দের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যে সকল দাড়াভাঙ্গা দার্শনিক কাঁকড়ার সৃষ্টি করিয়া ভবের হাটে ছাড়িয়া দিতেছেন, তাঁহার শিষ্যবর্গের উদ্গারে তাহারই অপচারের হুঙ্কারজনক গন্ধ।…'বাস্তব'কে পদাঘাত করিয়া অলৌকিককে শ্রদ্ধা করিবার পরামর্শ দিয়া অজিত দার্শনিক সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন? নহিলে তাঁহাদের কাণা কড়ি সাহিত্যের হাটে চলিবে কেন? আশ্চর্য এই যে, এই সকল nonsenseও ছাপার অক্ষরে জাহির হয়।"[১]

'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' সম্পর্কে অজিতকুমার যে আলোচনা[২] করেন তাতেও তাঁর চিত্ত-বৈদগ্ধের পরিচয় গভীরভাবে রয়েছে। জীবন-স্মৃতি সম্বন্ধে সমাজপতি মহাশয় উপহাস করে বলেছিলেন, এ লেখা পল্লবিত রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অজিতকুমার বললেন, "ভালো আত্মজীবনীর বিশেষত্বই এই যে তাহা জীবনকে কেবল

১ সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩১৯, পৃ. ৮৫।

২ প্রবাসী, পৌষ, ১৩১৯।

বাহিরের কতগুলি ঘটনার জড়সমষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলিত কয়েদির মত করিয়া দেখায় না। তাহা জীবনের অন্তরতম স্থানের একটি গভীর অভিপ্রায়ের সূত্রে বাহিরের ঘটনাগুলিকে এম্‌নি মালার মত গাঁথিয়া তোলে যে, জীবনের সকল বৈচিত্র্যেরই একটি বড় তাৎপর্য দীপ্যমান হইয়া উঠে। জীবন যে বাহির হইতে কেবলি নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত, সে যে বদ্ধ নয়, কিন্তু মুক্ত—একথা আমরা তখন সহজেই বুঝিতে পারি।...

"কবির জীবন-স্মৃতিতে জীবনচরিতের স্বাদ না পাইলেও একটি জিনিস ইহার ভিতর পাওয়া গিয়াছে, যাহা যে-কোন ভাষায় অতুলনীয়। কবি গ্রন্থের আরম্ভে বলিয়াছেন যে স্মৃতির পটে জীবনের যে ছবি অঙ্কিত হয় তাহা ইতিহাস নয়, অর্থাৎ যাহা বাহিরে ঘটিতেছে তাহার যথাযথ নকল নয়। তাহা 'এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।' জীবনের সেই নানা বিচিত্র স্মৃতিচিত্রের আনন্দরসে এই গ্রন্থখানি ভরপুর। সেইজন্য ইহা এমন আশ্চর্য। মানুষের জীবনের সকল প্রকারের স্মৃতির মধ্যে যে এমন অপূর্ব একটি রস থাকিতে পারে, এই গ্রন্থ না পড়িলে তাহা মনে করাই সম্ভব হইত না।" ছিন্নপত্রের সম্পর্কে বলেন, "...কবি ইহাতে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ইহাতে তাঁহার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনি ধরা পড়িয়াছেন।...এ চিঠিগুলি ঠিক ছিন্ন দলের মত নয়, কারণ ইহাদের মধ্যে যে একটি ভাবসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি। ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ—দশ বৎসর কালের এই চিঠিগুলি। কিন্তু পড়িতে পড়িতে এত দীর্ঘকালের ব্যবধান কিছুই অনুভূত হয় না। দশ বৎসরে কত বড় বড় পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে—কত রাজ্য সাম্রাজ্য ভাঙিতে পারে, গড়িতে পারে—কত কীর্তি ভূমিসাৎ হইতে পারে, কিন্তু একটি মানুষের নদীর উপরে নৌকাবাসের জীবনে পরিবর্তন নাই। মালার সূত্রে ফুলের

পর ফুলের মত দিনের পর দিন গ্রথিত হইয়া চলিয়াছে, পূর্ণ বিশ্ব-সৌন্দর্যের পায়ে নিবেদনের একটি সাজি সুগন্ধে আমোদিত হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। কি নিবিড়, কি গভীর, কি আশ্চর্য এই মানুষটির অনুভূতি এবং উপভোগ! মনে হয় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য সার্থক যে একজনও তাহাকে এমন একান্ত আগ্রহে, এমন বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে হৃদয় ভরিয়া দেখিয়াছে।···

"কবি এই ছিন্নপত্রে এক জায়গায় [আমিয়েলের] জর্ণাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমার মনে হয় তাঁহার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা আরও বেশি করিয়া খাটে—'এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।'···ছিন্নপত্রও সেইরূপ অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত বলিয়া ইহার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখান নিষ্প্রয়োজন। এমন কি, ইহা আগাগোড়া পড়িয়া যাইবারও বিশেষ প্রয়োজন নাই। যেখানে খুসি, সেখানে খুলিয়া পড়া যাইতে পারে। সহরের গোলমালের মধ্যে, নানা কাজের ভিড়ে একটুখানি অবসর করিয়া লইয়া আমরা এই বইখানির যেখানেই খুলিয়া পড়িব, সেখানেই নিমেষের মধ্যে বাংলার নদীতীরবর্তী গ্রামের সরল সৌন্দর্যের উপর দিয়া সমস্ত মনকে বুলাইয়া লইয়া যাইতে পারিব এবং ভাবের রসে আপনাকে সহজেই রসাইয়া পরম আনন্দ উপভোগের অধিকারী হইব। চিত্তের সকল ভার ইহা লঘু করিয়া দিতে তিলমাত্র বিলম্ব করিবে না।"

এই সময়ে প্রকাশিত অজিতকুমারের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা'[১]। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার আইডিয়া তৎকালে একটা বিরাট হেঁয়ালি, দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, কবির মনগড়া খেয়ালি বস্তু, অতএব উপহাস-পরিহাসের বিষয়রূপে বহু বিজ্ঞজনের কাছে পরিগণিত হয়েছিল। সম্ভবত এই কারণেই জীবন-

১ প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৯।

দেবতার ভাবটিকে বিশ্লেষণ ও তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেখালেন অজিতকুমার যাতে তার রহস্য কিছু উদ্‌ঘাটিত হয়। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে তাঁর যে কতখানি অধিকার ছিল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে এই আলোচনায়। তিনি লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'র ভাবের অনেক সাক্ষ্য যে আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে পাওয়া যায়···অর্থাৎ এ আইডিয়া যে আধুনিক কালেরই একটি বিশেষ জিনিস, তাহাই দেখাইবার জন্য আজ আমি এই প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছি।"··· তারপর তিনি ডারউইন ও তাঁর শিষ্যবর্গের অভিব্যক্তিবাদ, ফেক্‌নার (Fechner) ও বার্গসঁর চৈতন্য সম্পর্কিত দর্শনতত্ত্ব ইত্যাদি ঘেঁটে দেখালেন রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার ভাবও এই সব তত্ত্ব কতো অন্তরঙ্গভাবে সদৃশ। পরিশেষে জানালেন, "আমি যে সকল চিন্তার ধারা অনুসরণ করিলাম, হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছিলেন বলিয়া এই জীবন-দেবতার ভাব তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছে —কিন্তু তাহা না হইলেও আপনা-আপনি আপনার কবিত্বের অন্তর্দৃষ্টি হইতেই এই ভাব তাঁহাকে অধিকার করিতে বাধ্য—যখন এই ভাবের বাষ্প সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া আছে দেখিতে পাই। এই জন্যেই বড় কবিকে seer বা দ্রষ্টা বলে—তিনি নদীর মত তাঁহার কালের নিম্নস্তরের গভীরভাবে প্রবাহিত সকল ভাব-উৎস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। যাহা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে, তাহাকে তিনি সংহত করিয়া এক করেন আর এই জন্য বড় কবির সমগ্র জীবনের ভিতর হইতে সমুদ্ভূত কোনো আইডিয়াকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া একমাত্র নির্বোধ ও প্রাকৃত জনের দ্বারাই সম্ভব।"

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অজিতকুমারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান রচনা হল তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ, যা ১৩১৮ সালের

প্রবাসীর আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পর বৎসর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকই রবীন্দ্রনাথের ওপর লেখা প্রথম বই—রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ভাবজীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। এই রচনার উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য বস্তুর চুম্বক অজিতকুমার নিজেই অন্যত্র দিয়েছিলেন, আমরা তাই উদ্ধৃত করছি।

"…[রবীন্দ্রনাথের] সেই জীবনের তত্ত্বটি কবির সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া অনুসরণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি…। আমি বলিয়াছি তাঁহার কাব্যের ভিতরকার কথাটি হইতেছে, সর্বানুভূতি বা বিশ্ববোধ —অর্থাৎ তিনি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে, রূপের মধ্যে অপরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করিবার একটি আশ্চর্য স্বাভাবিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি খণ্ডতা অর্থাৎ যাহাকে আমরা বলি বাস্তব তাহাকে খুবই মানেন এবং তাহার সমস্ত স্বাদ ও সমস্ত অভিজ্ঞতা না লাভ করিয়া ক্ষান্ত হন না। কিন্তু তিনি সেইখানেই দাঁড়ি টানেন না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৃষ্টি যেখানে তাহার সত্যতা, তাহার অখণ্ডতা, সেইখানে গিয়া পৌঁছায়। সৌন্দর্য বল, প্রেম বল, স্বাদেশিকতা বল, তাঁহার অনুভূতি সর্বত্রই অতি প্রবল ; কিন্তু সেই প্রবলতাই তাঁহার সত্য নয়। সত্য —যখন সেইসকল খণ্ড আবেগকে তিনি অখণ্ড বিশ্বানুভূতির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া সত্য করিয়া দেখিতে পান তখনই।"[১]

অজিতকুমারের এই সব রচনার পাশে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি রচনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মন্ত্রশিষ্য যে সব তরুণ কবিগণের কাব্য সনাতনপন্থী সমালোচকদের কাছে উপহসিত হচ্ছিল, তাঁদের জন্যেই বিশেষভাবে এ রচনা লিখিত

১ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯, পৃ. ৩০৮।

বলেই মনে হয়। তিনি বহু বিদেশী সমালোচক ও কাব্যরসিকগণের বক্তব্য উদ্ধৃত ক'রে নিজের কথাকে সমর্থনে ভারী করেন। 'নব্য কবিতা' নামক এই প্রবন্ধে' তিনি বলেন, "···নব্য কবিতা আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির লীলাভূমি, বিশ্বপ্রকৃতির মত সে ইঙ্গিতে অনেকখানি বলে, ফুটিয়া কিছুই বলিতে চায় না।···গান ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু সাদৃশ্য আছে। যাঁহারা রাগরাগিণীর ভাব জাগাইবার ক্ষমতা স্বীকার করেন নব্য কবিতার মর্ম বুঝিতে তাঁহাদের কষ্ট হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সুর যেমন সূক্ষ্ম-সুকুমার আবেগ-বিভ্রমের পেলব ভাষা, নব্য কবিতাও তেমনি 'subtle and delicate instrument of emotional expression'. উহার ভাব ও ছন্দ জলের তরলতার মত, সূর্যের উজ্জ্বলতার মত একেবারেই অভিন্ন।···আমাদের অন্তরের উন্মুকুলিত কুঞ্জবনে যে কবিতা 'বসন্তের বাতাসটুকুর মত' ছুঁইয়া যায়, নুইয়া যায়, এবং যেখানে এতদিন কেবল পাতাই গজাইতেছিল সেখানে একেবারে শত শত ফুল ফুটাইয়া যায়, তাহাই যথার্থ কবিতা, তাহাই শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং তাহাই নব্য কবিতা।···এইরূপ কাব্যামৃত বিতরণ করিয়াছেন বলিয়াই Shelley ও রবীন্দ্রনাথ Poet of poets নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।···

"প্রকৃত কবিতার অর্থ অভিধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহা উপলব্ধির বস্তু।—'Its meaning seems to beakon away beyond itself, or expands into something boundless which is only focussed in it ; something which will satisfy not only our imagination, but our whole being.........'

প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৭।

"কবিতা বাগ্মিতা নয়, বাচালতা নয়, এমন কি রসিকতাও নহে। উহা শুধুই আন্তরিকতা; উহা একান্তরূপে অন্তরের সামগ্রী, এক অন্তরের অন্তঃপুর হইতে এক লজ্জাশীলা অন্তঃপুরিকা আরেক অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জন্য যখন অভিসার করে তখন তাহার অবগুণ্ঠন ধরিয়া টানিলে সে দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ এমনি করিয়াই ঢাকে যে তাহা কোনোমতেই আর খুলিতে পারা যায় না। ভাষার শিবিকায় সে রাজপথেও যাতায়াত করে, কিন্তু দুয়ার বন্ধ করিয়া।

("আধুনিক মনস্তত্ত্বের একটা গোড়াকার সিদ্ধান্ত এই যে 'we do not think, but thinking simply goes on with us.')

"মানুষ চেষ্টা করিয়া ভাবে না, ভাবনার ফল মানুষের ভিতর আপনা হইতেই চলিয়া থাকে। এই সহজ কথাটা যিনি বুঝিয়াছেন, নব্য কবিতা তাঁহার কাছে দুর্ভেদ্য-কঠিন তো নহেই, বরং নিতান্ত সুগম—ঠিক বজ্রসমুৎকীর্ণ মণির মত।"

অজিতকুমার কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ, এঁরা ছিলেন বয়সে নবীন। তাঁরা নূতন যুগের সাহিত্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৃতি উপভোগ করবেন, এবং উৎসাহের সহিত তাঁর প্রতিভার জয় ঘোষণা করবেন এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য এই যে প্রায় এঁদের সুরে সুর মেলালেন একজন প্রবীণ সাহিত্য-ইতিহাসকার। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত এইসময় প্রকাশ করেন 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৩১৮) নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়ন করা হল এইভাবে—"ভিক্টোরিয়া যুগে গীতি-কবিতার রাজা আমাদের রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার পথ সম্পূর্ণ নূতন। ভাষা, ভাব, ভঙ্গি—সকলই নূতন। তাঁহার রচনাপদ্ধতি, তাঁহার ভাবুকতা, তাঁহার গদ্য, পদ্য, গান—উপভোগের জিনিস। ছোট গল্পে, বঙ্গসাহিত্যে তিনি যেন একটা যুগান্তর করিয়াছেন।......বঙ্কিমের ছোট গল্প রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, ইন্দিরা হইতেও রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অধিক মনোরম,

তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।...তাঁর দেব-উপভোগ্য ছোট গল্পগুলি ও সুধামাখা সঙ্গীতগুলির বুঝি তুলনা হয় না—এ জিনিস যেন এ মর্ত্তের নহে—ত্রিদিবের। ইহা আমাদের প্রাণের কথা।

"প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ভাষাও সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার কোন কোন সন্দর্ভ ও কাব্য-সমালোচনা এত উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ যে অনেক সময় আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রবাবুর কবিতা মিষ্ট, না এরূপ গদ্যকাব্য মিষ্ট? বলা বাহুল্য, গদ্য হইলেও তাহাতে উচ্চাঙ্গের কবিতার সকল ভাব এবং একরূপ প্রচ্ছন্ন ছন্দঃ ও সুর থাকে, যাহা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না; না বুঝিয়া নিতান্ত লঘুপ্রকৃতির লোকের ন্যায় উপহাস করে। তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

"...যাহারা রবীন্দ্রবাবুকে গালি দিয়া বড় হইতে চায়, তাহারা কৃপার পাত্র।...যাহারা রবীন্দ্রবাবুকে গালি দিয়া বড় হইতেছে, তাহাদিগকে ভগবান্ ঐ ভাবেই বড় হইতে দিন, আমরা দেখি ও হাসি।"

রবীন্দ্র-অনুকূল সমালোচনা হিসেবে এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ'। রচনাটি ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হয় নব-প্রতিষ্ঠিত 'প্রতিভা' নামক পত্রিকায়।[১] এ রচনার লেখকের নাম সুখরঞ্জন রায়। সমালোচনা হিসেবে রচনাটি বেশ বলিষ্ঠ, সুযুক্তিপূর্ণ এবং সাহিত্য-বোধযুক্ত। রচনাটি আর

---

১ ১৩১৮, আশ্বিন-চৈত্র; ১৩১৯, বৈশাখ।
"পূর্ববঙ্গ হইতে যে কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে তন্মধ্যে 'প্রতিভা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"—সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩১৯, পৃ. ৭৯।

এক দিক থেকেও অতি মূল্যবান—রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা এই রচনাতেই প্রথম দেখা দিল।

লেখক তাই প্রবন্ধের প্রথমে বলেছেন, "কবি রবীন্দ্রনাথের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ পাঠকসাধারণের মনো-রাজ্যে রাজার আসন লাভ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি করা হয়; অথচ তিনি তাহার যোগ্য। বাংলার নবযুগের প্রবর্তক, শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের পর, এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলার উপন্যাস-সাহিত্য আর কোনো স্থায়ী নাম অর্জন করিয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়।··· ইউরোপের দেশে দেশে সাহিত্যকে যাঁহারা গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঔপন্যাসিকের সংখ্যা কম নহে। বাংলার সাহিত্যাকাশ এমন শুধু দুইটি জ্যোতিষ্কের আলোকৌজ্জ্বল্য লইয়াই গৌরব করিতে পারে; আমাদের সাহিত্যরাজ্যের এমন দুইটি মাত্র রাজা। একটিকে আমরা হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছি, আর একটির সম্বন্ধে দ্বিধা এখনো ঘুচিতেছে না। দ্বিধা ঘুচিবার সময় আসন্ন হইলেও একটা প্রবন্ধের প্রভাবেই যে দিকে দিকে শূন্য আসন পূর্ণ হইয়া উঠিবে, এমন দুরাশার দাবী আমি রাখি না।"

(লেখক বৌঠাকুরাণীর হাট থেকেই আলোচনা শুরু করেন। তবে বিশেষভাবে চোখের বালি ও নৌকাডুবি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এ আলোচনার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য এই ছিল বলে মনে হয় যে, তৎকালে এ দুটি উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছিল সে সব অভিযোগের প্রত্যুত্তর দেওয়া। তাই এ দুই উপন্যাসের কথাবস্তু ও চরিত্রচিত্রণ বিশ্লেষণ ক'রে লেখক দেখালেন যে অস্বাভাবিকতা ও অশ্লীলতার যে অভিযোগ এ উপন্যাস দুটির বিরুদ্ধে করা হয় তা নিতান্তই ভুয়া। লেখকের সমালোচনার বিশেষত্ব ধরা পড়বে এই উদ্ধৃতি থেকে।—"নৌকাডুবির যুগ রবীন্দ্রনাথের হিন্দুসমাজ-সমর্থনেরই যুগ, দেশের প্রাণের মাঝে তখন তিনি আনন্দ-

নিকেতন খুঁজেন, স্বদেশের তুচ্ছতাকেও তখন তিনি হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন। সেই সময়কার প্রবন্ধাবলীর রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের উপন্যাস নৌকাডুবিতেও বর্তমান।"

কিন্তু সুখরঞ্জন রায়ের এই রচনা অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যের মধ্যে তিনি কেবল উপন্যাসগুলির আলোচনা করেন। তাও 'গোরা' বাদ পড়েছে। ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা তাঁর নিশ্চয়ই ছিল, কারণ প্রবন্ধের গোড়াতেই আলোচনার বিভাগ নির্দেশিত ছিল—(ক) উপন্যাস, এই শিরোনামায়। তা ছাড়া 'নষ্টনীড়' প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, "নষ্টনীড়কে ছোট উপন্যাস বলিতে পারা যাইত, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর গল্পগুলির নূতন সংস্করণের পঞ্চম ভাগে ইহাকে বড় গল্পের আসরে নামাইয়া সে সম্বন্ধে আমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কাজেই আমাদিগকে এই সুখনীড়ের লোভটিকেও বর্তমানে অতিকষ্টে ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য মজুত রাখিতে হইল।"

কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোনো আলোচনা প্রকাশিত হয় নি।

বলা বাহুল্য, এ সমালোচনা 'সাহিত্য'-সম্পাদকের পক্ষে সুখকর মোটেই হয় নি। 'প্রতিভা'র ফাল্গুন সংখ্যা দেখে সমাজপতি মহাশয় লিখলেন, "শ্রীসুখরঞ্জন রায়ের 'কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' নামক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা চরিত্রের বিরাট বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। কবে কোথায় গিয়া শেষ হইবে, তাহা অনুমান করা অসাধ্য। সমালোচনার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়—'হাতের চেয়ে আম বড়' হইয়া উঠিবে। প্রবন্ধের ভাষাটিও কঙ্করবৎ কঠিন, চর্বণের চেষ্টা করিলে দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।...বাঙ্গালা ভাষারূপ লাওয়ারিস্ ময়দাকে পদদলিত করা আজকাল এই শ্রেণীর নবীন লেখকদিগের উৎকট ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে।"[১]

১ সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩১৯, পৃ. ৭৯।

বিদগ্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যরসিক হিসেবে সতীশচন্দ্র রায়ের নাম সম্ভবত অজিতকুমার চক্রবর্তীর পরেই। ইনি রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনা প্রকাশ্যে তেমন কিছুই করেন নি। ১৩১৯ সালে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের একটি সমালোচনা আছে। এই একটি লেখাতেই বোঝা যায় তাঁর রবীন্দ্র-কাব্য-বোধ কি পরিমাণে গভীর এবং তীক্ষ্ণ ছিল। ক্ষণিকা প্রকাশের বেশ কিছুদিন পরে এ আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়। এবং এই বিলম্বিত আলোচনা লেখকের ইচ্ছাকৃত; তিনি তাই বলেছেন, "বাস্তবিক পড়িয়া পড়িয়া এতদিনে 'ক্ষণিকা' আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এখন বোধ হয় এই কাব্যসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বেশ জোর করিয়া, স্থির করিয়া বলিতে পারিব। প্রথম উদয়ের চক্ষুঝল্‌সানো এখন আর নাই, তাই আশা করি এতদিনে দ্বিধা না করিয়া 'ক্ষণিকা' সম্বন্ধে মন্তব্য বলিতে পারি।"[১] কোনো গ্রন্থ সমালোচনা করতে গেলে গ্রন্থটি যে বার বার পড়া দরকার, এবং সমালোচনার সিদ্ধান্তগুলি স্বচ্ছ হয়ে ফুটবার জন্যে কিছু সময়ের প্রয়োজন, এমন বোধ দায়িত্বশীল যথার্থ-রসিক সমালোচকেরই থাকে। সমালোচনার ক্ষেত্রে এমন প্রস্তুতি তাঁদেরই। ক্ষণিকা পাঠে লেখক প্রথমেই আকৃষ্ট হয়েছেন এর ভাষার প্রতি। —"একি চমৎকার! এ যে ষ্টাইল!—ঠিক মনের কথা ভাবের ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে ছন্দ বাঁধিয়া অক্লেশ উপমায়, অনায়াস সাজসজ্জায় ছুটিয়া বাহির হইতেছে!"

এর পর লেখক মন্তব্য করেছেন, "আমরা যতদিন সংস্কৃত দিয়া লিখিব, ততদিন আমাদের ষ্টাইল্ হইবে না। আমরা লিখিবার সময়ে সংস্কৃতের স্থূল ঢাকনীতে আমাদের মনের গতিভঙ্গী আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলি, তাই আমাদের ষ্টাইল এত অল্প।" স্টাইল বলতে

১ রচনাবলী, পৃ. ২২৬।

লেখক কি বুঝেছেন তা আর একটু বিশদ হয়েছে এই অংশে—"যে সময়ে আর শিল্পীর কুঁদানো চক্ষে পড়ে না, গঠনটি ঠিক প্রকৃতির ছবির মত প্রাণ ছুঁইয়া দেয়, ক্ষণিকা সেই সময়ের। ভাবে এবং ভাষায় অভেদ। ভাষা কানে প্রবেশ করিয়া তাহার নিরর্থ তৌর্যত্রিকে এক-মিনিটও দেরী করে না। ঠিক প্রাণে ভাব ও চিত্র নাচাইয়া দেয়—যতটুকু তৌর্যত্রিক ভাষাতে রহিয়াছে, ততটুকু ভাব-উদ্বোধনের জন্য আবশ্যক। ইহা হইতে ভাবও যেমন সম্যক্ উদ্বোধিত হয়, তেমনি প্রতি ভাবের সঙ্গে যে একটি মাত্র সুর আছে (যাহা কবিরাই আয়ত্ত করিতে পারেন), সেটিও ধরা পড়িয়া যায়।"

বাংলা সমালোচনায় স্টাইল-এর প্রসঙ্গ এভাবে অবতারণা করা বোধ হয় এই প্রথম। সাহিত্যে স্টাইলের মূল্য নূতন ভাবে নিরূপণ করার ফলে ইংরেজি সমালোচনা-সাহিত্যে একটা নূতন যুগের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। সতীশচন্দ্র তার আগেই বাংলা সমালোচনায় স্টাইলের মূল্যবোধ জাগাতে সচেষ্ট হন। এতে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। স্টাইল-উপাসক এবং স্টাইল-সম্পর্কে নবযুগের প্রবক্তা বিখ্যাত ফরাসী মনীষী গুরমঁকে[১] সতীশচন্দ্র পড়েছিলেন কিনা জানি না।

(ক্ষণিকার সমস্ত কবিতাকে কবি গভীর অর্থযুক্ত করিতে পারেন নি—বহুজনের এই মত উল্লেখ করে লেখক বলেছেন যে, "কদম্বফুলের কেশরগুলি যেমন একটা শরীরে বাণবিদ্ধ থাকাতে, সৌন্দর্য-সৌগন্ধপূর্ণ একটি সম্পূর্ণ কদম্বফুল,—একটিমাত্র কেশরে অসম্পূর্ণ, ক্ষণিকাও তেমনি সবগুলি কবিতা লইয়া একটি ভাবসুরভি কবিত্বমণ্ডল।" লেখক তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন ক্ষণিকার ঝলমল প্রাণ কিভাবে গুরুভারবর্জিত হয়ে প্রথমে যাত্রা করেছে, কিভাবে ক্রমে মুক্তপ্রাণ

১ Rémy de Gourmont (1858-1915).

নানা সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে গিয়ে মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে সুখে বিচরণ করেছে এবং অবশেষে কি একটি গম্ভীর পরম পরিণতি পেয়েছে।

ক্ষণিকায় কবিমানসের অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে লেখকের যে রসনিপুণ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে তা উদ্ধৃতিযোগ্য।—

"রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ধারাবাহিক। স্তরে স্তরে তাঁহার কাব্যের বিকাশ—কোনোখানে একটা উড়িয়া-আসা উদ্ভট কবিতা পাওয়া দুষ্কর। তাই একখানি কাব্যের সূত্রেই স্বভাবত আমরা তাঁহার অন্যান্য কাব্যে গিয়া উপস্থিত হই। ক্ষণিকা হইতে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি—কি আলোড়ন, কি বেদনা, কি একটা অশান্ত অন্বেষণ।…সেই ধরণীগগনের সৌন্দর্যকে ব্যথিত হৃদয়ের বেষ্টনে মানসী শ্রেয়সীর রূপে আহরণ করিয়া লইবার চেষ্টা—যেমন 'মানসসুন্দরী'তে, …সেই চিত্রাঙ্গদায় পার্বতীয় অরণ্যচ্ছায়ে দীর্ঘায়িত প্রেমলীলা—আরও সেই কত ঢেউয়ের টলমলানি, কত স্রোতের টান যে দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে কি একটা কৃচ্ছ্র আলোড়নই দেখিতে পাই। তাহার পর ক্ষণিকায় আজ সৌন্দর্য সহজ হইয়া আসিয়াছে 'নাগাল পেয়েছি নীচুতে।' চৈতালীতে যে একটা শান্তি আছে, সেটা গভীর শান্তি নহে, সে বিকালবেলার শান্তির মত—তখনো সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রাণ একেবারে নিবিড় মাখামাখি ভাবে মিশিয়া যায় নাই; কিন্তু ক্ষণিকায় একেবারে মিলন, 'অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি।'—ক্ষণিকার যে শান্তি তাহা নিতান্ত নিবিড় রহস্যময় মধ্যরজনীর শান্তি।"[১]

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও পুরনো না হয়ে বরং নবীন লেখকদের কাছে শ্রদ্ধার্হ ও অনুকরণের আদর্শ হয়ে রইলেন। তাঁর খ্যাতি ও আদর নবীনদের কাছে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রবীণ বয়স ও মন নিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্য সদা-জাগরূক ছিলেন

---

১ পৃ. ২৪০-১।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যের প্রতি কটূক্তি ও কটাক্ষ করতে। এই বিরুদ্ধতাকে চরমে ওঠালেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। এই সময়ের কিছুদিন পরে দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবাসী সাপ্তাহিকে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'আনন্দ-বিদায়' নামক প্যারডি নাটিকাটিকে ঢেলে সাজালেন।[১] ভূমিকায় লিখলেন, "এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। 'মি'র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অন্তর্দাহ হয় ত তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহাদের সম্মুখে দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র।...একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworth-কে এইরূপই চাবকাইয়াছিলেন এবং Wordsworth মহাকবি Shelley ও Byronকে এইরূপই কশাঘাত করিয়াছিলেন। যিনি কাব্যে দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু, এবং এইরূপ কাব্যের নিহিত বীভৎসতা ও অপবিত্রতা যিনি আচ্ছাদন খুলিয়া প্রকাশ না করিয়া দেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করেন না।"

স্পষ্টই বোঝা যায় যে যদিও নাট্যকার জানিয়েছেন এ নাটকে ব্যক্তিগত আক্রমণ নেই, কিন্তু তবু তাঁর উদ্দেশ্য নিতান্তই ব্যক্তিগত আক্রমণ। Browning অথবা Wordsworth-এর মতো তিনি কা'কে চাবকাতে চান তা নাটকের দর্শকগণও সেদিন নাটক দেখে ধরে

১ নাটিকাটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দবিদায়ে'র প্যারডি।

ফেলেছিল অতি সহজেই।[১] রবীন্দ্রনাথকে অপমানিত করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন নিজেই দেশের লোকের কাছে অপমানিত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারের সাক্ষ্য রয়েছে প্রমথ চৌধুরীর রচনায়, যা 'সাহিত্য'-এ প্রকাশিত হয়।[২]—"সেদিন ষ্টার থিয়েটারে 'আনন্দ-বিদায়ে'র অভিনয় শেষে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়ে পরিণত হয়েছিল শুনে দুঃখিত এবং লজ্জিত হলুম। তার প্রথম কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত লোককে দর্শকমণ্ডলী লাঞ্ছিত করেছেন ; এবং তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা দেবার উদ্দেশ্যেই আনন্দ-বিদায়ের রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করেছিলেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই আক্রমণ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেন—"দ্বিজেন বাবু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হতে দুর্নীতির যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তা হাস্যরসাত্মক না হোক, হাস্যকর বটে।...দ্বিজেন বাবুর মত যদি আমাদের গ্রাহ্য করতে হয়, তা হলে—অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত' থেকে সুরু করে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পর্যন্ত অন্ততঃ হাজার বৎসরের সংস্কৃত কাব্যসকল আমাদের অগ্রাহ্য করতে হবে।—একখানিও টিকবে না। তারপর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সকল কবির সকল গ্রন্থই আমাদের অস্পৃশ্য হয়ে উঠবে। একখানিও বাদ যাবে না। যাঁরা রবীন্দ্র বাবুর সরস্বতীর গাত্রে কোথায় কি তিল আছে, তাই খুঁজে বেড়ান, তাঁরা যে ভারতবর্ষের পূর্ব-কবিদের সরস্বতীকে কি ক'রে তুষারগৌরী-রূপ দেখেন, তা আমার একেবারেই দুর্বোধ্য,—শেষ কথা, puritanism এর হিসাব থেকে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্র বাবুও কিছু কম

১ নাটকটি অভিনীত হয় ষ্টার থিয়েটারে ১৩১৯ পৌষ

২ বীরবল, সাহিত্যে চাবুক।—সাহিত্য, মাঘ, ১৩১৯।

অপরাধী নন। তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই রয়েছে।—'আনন্দ-বিদায়' moral text-book ব'লে গ্রাহ্য হবে, এ আশা যদি তিনি ক'রে থাকেন, তা হলে সে আশা সফল হবে না।"

প্রমথ চৌধুরীর লেখার প্রতিবাদ সাহিত্যের পরের সংখ্যাতেই বার হয়।[১] এতে দ্বিজেন্দ্রলালকে সমর্থন করা হয়।—"দ্বিজেন্দ্র বাবু সাহিত্যিক বাতাসকে পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র।··· তাঁহার রচনা বিদ্বেষমূলক হইলেও, কাব্যে দুর্নীতির প্রতি তাঁহার তীব্র আক্রমণে পাঠক-সম্প্রদায়ের লাভ ভিন্ন ক্ষতি কিছুই দেখি না। সাহিত্য জিনিসটা খেলনাও নহে, ফেলনাও নহে। ইহা অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, পুত্রকন্যার চরিত্র গঠিত করে, এবং জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। ইহার বাতাস পবিত্র রাখা বিশেষ আবশ্যক। রবীন্দ্র বাবুর অপেক্ষা সাহিত্য বেশী দামী। রবীন্দ্র বাবুর জন্য সাহিত্যের সর্বনাশ করিতে নাই।"

দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দ-বিদায়' নাটকে রবীন্দ্রনাথকে কতখানি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিলেন তা নিচের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে।

"একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি কিবা ত্যাগ কিবা দান,
'পরিষৎ' জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান।"

(২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

"আমি লিখছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে
নিজেই বুঝি না তার অর্থ বুঝবে কি আর অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখছি,
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখছি।
এখন কর গৃহে গমন—নিয়ে আমার কাব্য
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাবব।" (ঐ, ৩য় দৃশ্য)

[১] মেঘনাদ, সাহিত্যে নৈতিক চাবুক।—সাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩১৯

"২য় ভক্ত—এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই ইনি P. D. হয়ে আসবেন।

৩য় ভক্ত—P. D. কি ?

২য় ভক্ত—Doctor of Poetry.

৩য় ভক্ত—ইংরেজরা কি বাঙ্গলা বোঝে যে এঁর কবিতা বুঝবে ?

৪র্থ ভক্ত—এ কবিতা বোঝার ত দরকার নেই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা ইংরাজীতে অনুবাদ করে' নিলেই হোল।

২য় ভক্ত—তারপর রয়টার দিয়ে সেই খবরটা এখানে পাঠালেই আর Andrewএর একটা certificate যোগাড় কর্লেই P.L.

৩য় ভক্ত—P. L. কি ?

২য় ভক্ত—Poet Laureate.

১ম ভক্ত—ইত্যবসরে একখানা মাসিক বের কর, মাসিক বের কর। আমরা ইত্যবসরে এঁকে একদম ঋষি বানিয়ে দেই—"

(ঐ, ৩য় দৃশ্য)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার প্রতি এই সুতীব্র ব্যঙ্গের পাশে আমরা তুলে ধরছি একই সময়ে প্রকাশিত অজিত চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ'[১] নামক সমালোচনা-গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি :

"আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা, আমাদের দেশের সাধনা, আমাদের সৌন্দর্যের সাধনা, আমাদের ধর্মের সাধনা কালে কালে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই এই জীবনটির আদর্শ জাজ্বল্যমান হইয়া আমাদিগকে সকল সাধনার অন্তরতর ঐক্য কোথায়, সকল খণ্ডতার চরম পরিণাম পরম পূর্ণতা কোথায় তাহাই নির্দেশ করিয়া

[১] প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত ও ইতিপূর্বে উল্লিখিত।

দিবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে বিশ্বমানবের বিচিত্র সভ্যতার সকল আয়োজন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন যখন এই ভারতবর্ষে নানা অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবার জন্য সমাগত হইবে, তখন ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই অখ্যাত বাংলাদেশের মহাকবির মহান্ আদর্শের তলব পড়িবেই এবং বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রপথে নাবিকের চক্ষের সমক্ষে অন্ধকার রজনীতে ধ্রুবতারার দীপ্তির ন্যায় এই পরিপূর্ণ আদর্শের দিক্‌দিগন্তব্যাপী রশ্মিচ্ছটা সকল সংশয়ের অন্ধকারকে দূর করিবে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের উপহাস যুক্তিযুক্ত কিংবা সময়োচিত, না অজিতকুমারের উক্তি প্রকৃত দিব্যদৃষ্টি-জাত, তা বোঝা গেল পর বৎসরই। দ্বিজেন্দ্র-উপহসিত রবীন্দ্রনাথ বিলেত ঘুরে P. D. ও P. L.এর চেয়েও বড় পুরস্কার লাভ করলেন। তিনি হলেন N. L.—Nobel Laureate। লাভ করলেন নোবেল পুরস্কার।

ইংরেজী গীতাঞ্জলির যে ভূমিকা রচনা করেন কবি ইয়েটস্ তাতে রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির সম্বন্ধে তিনি লেখেন, "I have carried the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway trains, or on top of omnibuses and in restaurants and I have often had to close it lest some strangers would see how much it moved me. These lyrics—which are in the original, my Indians tell me, full of subtlety and rhythm, of metrical inventions—display in their thought a world I have dreamed of all my life long." অর্থাৎ, তিনি রবীন্দ্রনাথের

---

১ পৃ. ১০৪-৫।

পাণ্ডুলিপিখানি যত্রতত্র নিয়ে বেড়িয়েছেন এবং তা পাঠ করেছেন রেলে, বাসে ও রেস্তোরাঁয়, এবং তাঁকে প্রায়ই সে পাণ্ডুলিপির পাতা বন্ধ করতে হয়েছে পাছে কেউ দেখে ফেলে তিনি কতখানি বিচলিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি তাঁকে সেই জগতের সন্ধান দিয়েছে যে জগত তাঁর স্বপ্নের মধ্যে তিনি এতদিন লালন ক'রে এসেছেন।

ইয়েট্সের কথাগুলি অজিতকুমারের উক্তিকেই সার্থক করে নি কি?

॥ ১১ ॥

[১৩২০-১৩৩০ ; ১৯১৩-১৯২৩]

রচনা ঃ

স্মরণ	১৩২১	১৯১৪
উৎসর্গ	১৩২১	"
গীতি-মাল্য	"	"
গান	"	"
গীতালি	"	"
ধর্ম্মসঙ্গীত	"	"
শান্তিনিকেতন ১৪শ ভাগ	"	১৯১৫
কাব্যগ্রন্থ (ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ)	১৩২১-২২	১৯১৫-১৬
শান্তিনিকেতন ১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ ভাগ,	১৩২২	১৯১৬
ফাল্গুনী	১৩২২	"
ঘরে বাইরে	১৩২৩	"
সঞ্চয়	"	"
পরিচয়	"	"
বলাকা	"	"
চতুরঙ্গ	"	"
গল্পসপ্তক	"	"
কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম	১৩২৪	১৯১৭
গুরু	১৩২৪	১৯১৮
পলাতকা	১৩২৫	"
জাপান-যাত্রী	১৩২৬	১৯১৯
অরূপ রতন	১৩২৬	১৯২০
পয়লা নম্বর	১৩২৭	"
শিক্ষার মিলন	১৩২৮	১৯২১

ঋণশোধ	১৩২৮	১৯২১
মুক্তধারা	১৩২৯	১৯২২
লিপিকা	„	„
শিশু ভোলানাথ	„	„
বসন্ত	১৩২৯	১৯২৩

কোনো সাহিত্যিক যখন নোবেল পুরস্কার পান তখন তাঁর সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ সম্বলিত গ্রন্থ লেখার অবকাশ বা সুযোগ স্বভাবতই এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর এইরকম সময়োচিত সুযোগ এসেছিল; কিন্তু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার ঘটেনি। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর দশ বছর কেটে গেল তবু এমন একখানি পুস্তক লেখা হল না যাকে অজিতকুমার রচিত 'রবীন্দ্রনাথ'-এর পরবর্তী পুস্তক বলে অভিহিত করা চলে।

আসলে যে শ্রদ্ধা ও রসশিক্ষার বলে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমীক্ষা সম্ভব ছিল, তার অঙ্কুর বাংলা সমালোচনা ক্ষেত্রে তখনও তেমন উদ্গত হয়নি। তখনও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 'না-বোঝা'র পালাটাই জোরালো।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-প্রাইজ পাবার পরেই রমাপ্রসাদ চন্দ 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রহস্য' নামে একটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।[১] তিনি লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথের কাব্য শ্রেষ্ঠ কাব্যের লভ্য 'নোবেল' পুরস্কার জিতিয়া আনিয়া, যে সকল জাতির প্রতিভা সভ্য সমাজে শিক্ষা দীক্ষার নব আলোক নিত্য বিতরণ করিতেছে, এক টানে বাঙ্গালীকে সেই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে উত্তোলিত করিয়াছে।...কিন্তু বাঙ্গালার পাঠক-সাধারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-

১ পৌষ, ১৩২০।

রসাস্বাদে সমর্থ হইয়াছে কি? আমার মনে হয়, না।…এই জন্য দোষী কে? দোষী রবীন্দ্রনাথের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণকারী ভক্ত, এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে উদাসীন বাঙ্গালা গ্রন্থের পাঠক। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দোষ—তাহা অতীতের বা বর্তমানের দর্শন-ভূয়োদর্শনের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, রচনা-রীতির ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সুরে সোজাসুজি সাধা নহে, তাহা এক অপূর্ব বস্তু। অনুকরণ-কারিগণের দোষ—তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের রচনার দোষের ভাগকে নিত্য নব নব ভাবে উদ্গীরণ করিয়া উহার গুণের ভাগের সম্মুখে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর ক্রমশঃ উচ্চ—উচ্চতর করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। আর যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের দোষ—তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া সমগ্রভাবে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া মুরুব্বিয়ানা করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবত্তা স্বীকার করিয়া, তাঁহার কাব্যকে অস্পষ্ট বা অশ্লীল বলিয়া সরাসরি বিচার করিয়া সাহিত্যের এজলাস হইতে সরাইয়া দিতে চাহেন।… রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে পাঠক-সাধারণের ঔদাসীন্য একটা মস্ত ভুল। ভুল না করাটা, গৌরবকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভুল করিলে তাহা বুঝিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা ততোধিক গৌরবকর। সুতরাং য়ুরোপীয় সাহিত্যাচার্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সাগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা করা আমাদের কর্তব্য।"

কিন্তু এরপর শ্রীযুক্ত চন্দ যা লিখলেন তা ভীমরুলের চাকে ঘা দিল। তিনি জানালেন, "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে তিন শ্রেণীর সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম, ঋষিদিগের দৃষ্ট মন্ত্রময়ী চতুর্বেদ সংহিতা; দ্বিতীয়, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস পুরাণ; তৃতীয়, অশ্বঘোষ, কালিদাস, প্রভৃতির কাব্য। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বা মন্ত্র স্বভাবকবি ঋষির সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধি-মূলক; তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য অলঙ্কার শাস্ত্ররূপ বিজ্ঞানানুসারে

কল্পনাবলে সৃষ্ট ; ইতিহাস পুরাণে দৃষ্ট মন্ত্র ও সৃষ্ট কাব্য, এই দুই প্রকার রচনার লক্ষণই পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য সাহিত্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্য তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানসম্মত রচনা, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রচনা-রীতির সুখকর সমন্বয়ের ফল।··· রবীন্দ্রনাথের গীতকাব্য এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাহার অধিকাংশই মন্ত্রসাহিত্য ; আধুনিক যুগের ঋষির দৃষ্ট নব মন্ত্র-সংহিতা। অন্য কোনও শ্রেণীর কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট গীত-কবিতার তুলনা করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ ঋষি, তাঁহার গীতিকাব্য আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের মন্ত্র।···যে গীত দেখা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত, শোনা বা শেখা কথার সম্পর্কবিবর্জিত, তাহা মন্ত্র ; যে গীত শেখা কথার ও শোনা কথার প্রাধান্য, তাহা কাব্যমাত্র।"

এই প্রসঙ্গে ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এইসময় 'কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। লেখক তাঁর বক্তব্যের ভূমিকা হিসেবে 'ভারতী' ১৩০৭ সাল, বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'ঋষিত্ব ও কবিত্ব' প্রবন্ধটির উল্লেখ করেন। এই প্রবন্ধে শাস্ত্রীমহাশয় বলেন যে কবিত্বের সঙ্গে ঋষিত্বের যোগ আছে, এবং কালিদাস ভবভূতি ও শেলী ঋষি। লেখক এই কথা জানিয়ে নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যক্ত করেন—"বর্তমান প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চাই যে রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের মত ঋষি-প্রকৃতি-সম্পন্ন কবি।" নিম্নে প্রদত্ত উদ্ধৃতি থেকেই তাঁর বক্তব্য ধরা যাবে। "কবি 'নৈবেদ্যে' ভব-সংসারে কর্মপারাবারে নিখিল-জগত-জনের মাঝারে দাঁড়াইতে চাহিয়াছেন।··· 'নৈবেদ্যে' যাহা উদ্বোধন, খেয়ায় তাহার আরম্ভ আর গীতাঞ্জলিতে তাহার আপেক্ষিক পরিণতি (Relative perfection)···নৈবেদ্য,

খেয়া ও গীতাঞ্জলি এই তিনখানি কাব্য একত্রে পাঠ করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একটি স্পষ্ট ধারাবাহিকতা ও কবি-জীবনের আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ বেশ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে পারিবেন।"[১]

এ কথার প্রতিবাদ যথারীতি 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হল।[২] লেখক জানালেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ এক দল ভক্ত কর্তৃক 'ঋষি' নামে উক্ত হইতেছেন। শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্রণী। ...এখন কথায় কথায় ভক্তগণ আরাধ্যকে 'ঋষি' করিতেছেন। সুতরাং এই অভিনব মতের সমালোচনা আবশ্যক হইয়াছে।" কিন্তু লেখক শ্রীযুক্ত চন্দের কথা খণ্ডন করতে যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণকে এড়িয়ে গেলেন। তার বদলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সাহিত্যকে ব্যঙ্গ করলেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে প্রেম বিষয়ক বেশ কতকগুলি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে মন্তব্য করলেন—"এমন 'ঋষি'র দৃষ্ট 'মন্ত্রসংহিতা' জগতের আর কোনও কবির কাব্যে আছে কি? 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'র এরূপ সুস্পষ্ট গানে 'ঋষি' রবীন্দ্রের 'ঋক্-যজু-সাম' আদ্যন্ত মুখরিত! তাঁহার কাব্য-প্রতিভার অথর্ব-দশার 'অথর্ব-বেদ'র ভূতের মন্ত্র, সাপের মন্ত্র প্রভৃতি তাঁহার মূল-পালার সং-মাত্র।"

লেখক রবীন্দ্রনাথকেও উপদেশ দিয়ে সাবধান করলেন, "'রবীন্দ্রনাথ ঋষি', 'রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রসংহিতা', তাঁহার 'আর আর রচনা বিধি ও অর্থবাদপূর্ণ ব্রাহ্মণ'—ইত্যাদি অসঙ্গত উক্তি ও অতিরঞ্জিত স্তুতি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত গৌরবের হানিকর। ভক্তেরা তাঁহাকে যাহা সাজাইতে চাহিবে, তিনি কি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই সাজিতে সম্মত হইবেন? অযথা নিন্দা হইতে যেমন আত্মরক্ষা

১ পৃ. ৯-১০।

২ যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'ঋষি' রবীন্দ্রনাথ,—সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

করিতে হয়, তেমনই অযথা প্রশংসা হইতেও আত্মরক্ষা করা উচিৎ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি উক্ত ঋষিত্বারোপের প্রতিবাদ করা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই কর্তব্য। তিনি যদি রমাপ্রসাদবাবুর এই অতিরঞ্জন-পূজায় আপনার চিত্তরঞ্জন করিয়া নীরবে 'ঋষি'র জটা-টোপর মাথায় দিয়া বসিয়া থাকেন, আত্মসম্মানের জন্য প্রকাশ্যভাবে এই অতিপূজার প্রতিবাদ না করেন, তবে তিনি 'ঋষি' হইলেও, সুধীসমাজ তাঁহাকে কি মনে করিবে?"

এই প্রতিবাদের পর রমাপ্রসাদ চন্দ নিজের কথা আরও খোলশা করেন।[১] তিনি জানালেন, "...ইতিহাসের হিসাবে বেদমন্ত্র পুরুষরচিত গীত। একান্ত স্বাভাবিকতা এই গীতের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গীতে এইরূপ স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিয়া আমি তাঁহাকে 'ঋষি' এবং তাঁহার গীতগুলিকে 'মন্ত্র' বলিয়াছিলাম, এবং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কবিসমাজে স্বতন্ত্র আসন পাইবার যোগ্য, এইরূপ নির্দেশ করিয়াছিলাম।...যে কবিতা inevitable, যে কবিতা স্বতঃবিকশিত অপৌরুষেয় মনে হয়, তাহা 'মন্ত্র'; তাহার রচিয়তা 'ঋষি'। কিন্তু কোনও কবিকে এই হিসাবে 'ঋষি' বলিলেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় না।...

"ঋষি এবং কবি উভয়েরই কার্য এক—রহস্যভেদ, বিশ্বের অন্তরে যে আনন্দস্বরূপ সত্য লুক্কায়িত আছে, তাহার প্রকাশ; কিন্তু উভয়ের প্রকাশের রীতি পৃথক। একজন (ঋষি) সত্যকে ভাল, মঙ্গলময় বলিয়া প্রচার করেন; আর একজন (কবি) সত্যকে সুন্দর, আনন্দময়রূপে প্রকাশ করেন। কারলাইল কবি-প্রসঙ্গের সূচনায়ই বলিয়াছেন, এই বৈজ্ঞানিক যুগে ঋষির (Prophet) অভ্যুদয় আর সম্ভব নহে, কিন্তু কবির অভ্যুদয় সম্ভব। "Divinity and Prophet

১ ঋষি ও কবি। সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩২৩।

are past. We are now to see our Hero in the less ambitious, but also less questionable character of Poet ; a character which does not pass."

"রবীন্দ্রনাথকে Prophet হিসাবে আমি ঋষি বলি না ; সেই প্রকার ঋষি এখন হইতেও পারে না, হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক গীত এই দেশের প্রাচীন ঋষির মন্ত্রের মতো। এক দিকে inevitable, স্বতঃবিকশিত মনে হয় ; আর এক দিকে, সীমার মধ্যে যে অসীমতা Divine idea of the world লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার একটা জীবন্ত আভাস দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলি।"

এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দ আর একটি কথা বলেন। তিনি 'গীতালি' থেকে দুটি গান[১] তুলে জানালেন, "এইরূপ ভাবের গান বাঙ্গালার বাউলের মুখে অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়, এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক গীত পাঠ করিলে মনে হয়, বাঙ্গালায় বাউল সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া যে ভাবের ধারা বহিয়া আসিয়াছে, তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পতিত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই বিস্তারের কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অন্যান্য ধারার সহিত মিলন।"

এবার কথার প্রতিবাদ হতে বিলম্ব হল না। রমাপ্রসাদবাবুর রচনার প্রতিবাদ আগে যিনি করেছিলেন তিনিই এবার তাঁর প্রতিবাদের শিরোনামা দিলেন 'বাউল রবীন্দ্রনাথ'।[২] এই প্রতিবাদ

১ ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার। ইত্যাদি। ৫৩
চোখে দেখিস, প্রাণে কতো। ইত্যাদি। ৫৪।

২ সাহিত্য, কার্তিক, ১৩২৩।

প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, "রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গীতই কপটোক্তি। তাঁহার গানে ভান আছে, প্রাণ নাই।...

"রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' বলিলে বা তাঁহাকে 'বাউল' বলিলে তাঁহার গৌরব করা হয় না—তাঁহাকে যথার্থ ই উপহাস করা হয়।

"শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ তাঁহার মূল প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথে যে 'ঋষি' উপাধির আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা তর্কের অনুরোধে কোনও মতে রক্ষা করিবার জন্য দ্বিতীয় প্রবন্ধে কবির প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কাব্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার 'গীতালি' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনা লইয়া রবীন্দ্রনাথকে বাউল ঋষি বা বিশুদ্ধ 'বাউল' করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবির এই অধুনাতম গীতরচনায় বাউল সম্প্রদায়ের দেহতত্ত্ব বা অধ্যাত্মভাবের গন্ধ পাইয়া তাঁহার স্বদেশীয় অতিভক্তগণ ও বিদেশীয় অল্পজ্ঞগণ 'মাতিয়া উঠিতে' পারেন, কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত গৌরব বৃদ্ধি হইবে না, বরং হ্রাস হইবে। কারণ, কালিদাস তুলসীদাস হইয়া গেলে,—মেঘদূত, কুমারসম্ভব ছাড়িয়া 'দোঁহা' রচিতে থাকিলে, তাহাতে কবির অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে। এরূপ পরিবর্ত্তন কবিপ্রতিভার পরিণতি নহে,—বিকৃতি। কিন্তু আমাদের এই সমালোচনা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ হয়ত 'সবুজপত্রে' গা ঢাকিয়া আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন,—

ওরে আমার কাঁচা!
ও সব কথা তুচ্ছ ক'রে পুচ্ছটি তোর নাচা।

আর ইহা শুনিয়া কবির কাঁচা ও পাকা ভক্তের দল, কবির ঐ তানে নাচিয়া উঠিয়া বোধ হয় বলিবেন,—'ধন্য বাউল রবীন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার গীত।'"

. . .

আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্র-সমালোচনার একটা বড় খুঁটি হয়ে দেখা দিল সাহিত্যে বাস্তবতা প্রসঙ্গ। বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের

প্রতি বস্তুতন্ত্রহীনতার যে অভিযোগ জ্ঞাপন করেন তারই জের টানলেন অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রবাসী, ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাঁর প্রকাশিত 'লোক-শিক্ষক ও জননায়ক' প্রবন্ধে জানালেন যে বর্তমান সাহিত্য, বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য, লোকশিক্ষার ভার নেয়নি। সাহিত্যে শুধু শিল্প-নৈপুণ্যের অনুশীলন হচ্ছে, এবং এই কারণে সাহিত্য ক্রমশঃ কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। "ভাবুকশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যখন বাঙালী ভাবুকতাকে জগৎসভ্যতা-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তখনও বলিতে হইবে, বাঙালা সাহিত্য সহজ নহে, সরল নহে, অকৃত্রিম নহে। আর এই সরলতার অভাবের জন্যই সাহিত্য তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়াছে।···রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন।[১] তিনি দৈন্যের মধ্যে "বিশ্বাসের ছবি" আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সঙ্গীত, জনসাধারণকে সমগ্রজাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।···

"···রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিগণ কি ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন নাই? তাঁহাদিগের ধর্মসঙ্গীতগুলি সার্বজনীন হইল না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর,—ইঁহাদিগের গানের ভাব সহজ নহে, সরল নহে, অকৃত্রিম নহে, ইঁহাদিগের ভাষাই এই কৃত্রিমতার প্রধান সাক্ষী। ভাব ও ভাষার কৃত্রিমতার জন্যই ইঁহাদিগের গানগুলি সার্বজনীন হইতে পারে নাই। শুধু ধর্মসঙ্গীতে কেন, প্রেমসঙ্গীতগুলিতেও এই কৃত্রিমতা লক্ষিত হয়। আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যে প্রেমসঙ্গীতের অভাব নাই, কিন্তু শ্রীধর, রামবসু, নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীত ভিন্ন বাঙালী কৃষক শিল্পী অপর কাহারও গান ত কখনই গাহে না।"

১ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার অংশ উদ্ধৃত

একই সময়ে প্রকাশিত অন্য একটি প্রবন্ধেও[১] রাধাকমল এই অভিযোগ আরও খোলাখুলিভাবে জানালেন। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করলেন যে প্রত্যেক সাহিত্যকেই তিনটে স্তর অতিক্রম করতে হয়—(ক) ভাবুকতার প্রথম যুগ,—কল্পনারাজ্যগঠন, বাস্তব-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের বিয়োগ; আত্মকেন্দ্রতা ও আত্মসর্বস্বতা। "রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির পরিশোধ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও তাঁহার প্রথম বয়সের খণ্ডকবিতা এই স্তরের।" (খ) ভাবুকতার সঙ্গে বস্তুতন্ত্রের সংমিশ্রণ।—পুরাতন আদর্শের সঙ্গে নতুন ভাবের একটা সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা হয়। সাহিত্য আত্মসর্বস্ব না হয়ে ক্রমশ মানুষ ও সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একটা নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করে। "রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতায় আমরা পুরাতন ভাবগুলি নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘরে আমরা একটা নূতন সমাজ-গঠনের উপাদান দেখিতে পাই; রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে তাঁহার জীবন-দেবতায় নৈবেদ্যে মরণসঙ্গীতে আমরা একটা নূতন ব্যক্তিত্বের—একটা নূতন জীবনের পরিচয় পাই।"

(গ) বাস্তব প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতা,—সাহিত্য তখন কবির কল্পনার সামগ্রী নয়, কবি সাধনার ফল। কবি অনেক সাধনার পর ভাবুকতার সঙ্গে বাস্তবজীবনের একটা সুন্দর সমন্বয়সাধন করতে পেরেছেন; তিনি জীবনের লক্ষ্য বুঝতে পেরেছেন, সমাজের যুগধর্ম আয়ত্ত করতে পেরেছেন; এবং-সাহিত্যের দ্বারা সেই জ্ঞান বিতরণ করছেন। "আমাদের বর্তমান বাংলা সাহিত্য এখন তৃতীয় স্তরে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্যের গুণগুলি আমাদের সাহিত্যে যেরূপ বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা অপর কোনও সাহিত্যে দুর্লভ।

১ সাহিত্যের আভিজাত্য। সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

সাহিত্যে অশান্তি ও বিপ্লববাদের পরিচয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে আত্মসমর্পন, বন্ধনের ভিতর পূর্ণতার আকাঙ্খা প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের রবীন্দ্রনাথেই আছে। নূতন জগৎ গড়িবার আকাঙ্খা, নূতন ব্যক্তিত্বের সূচনাও রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভূরিপরিমাণে পাওয়া যায়। নূতন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সবগুলিই স্বপ্নের রাজ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন ও গোরায় যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত বাস্তবজীবনের বিশেষ সম্বন্ধ নাই; তাহাকে একটা আদর্শ জীবন বলিতে পারি না; কারণ তাহা একেবারেই অনধিগম্য।”

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের এই অভিযোগের একটা ফল দাঁড়াল এই যে সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কিত বিতর্ক-প্রাঙ্গণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হলেন। তিনি অনেকটা যেন এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন।[১] তিনি জানালেন যে সমালোচকদের “পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমঝাইয়া দেওয়া উচিৎ কোন্‌টা বস্তু কোন্‌টা বস্তু নয়।” তারপর নিজের বক্তব্য উল্লেখ করলেন— “সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রস-বস্তু। রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করতে পারে না।

“আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীর পক্ষে বাস্তব নহে অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেই জন্যই এখনকার সাহিত্য, দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

১ বাস্তব। সবুজপত্র, ১৩২১, শ্রাবণ।

"উত্তম কথা—কিন্তু দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই, তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা ত নগণ্য। কেহ তাহাদের ত কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমাদের কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

"হয়ত উত্তরে শুনিব আমরা হারিতেছি। ইংরেজি যাহারা শেখে নাই তাহারাই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে। তাহাই টিঁকিবে এবং তাহাতেই লোকশিক্ষা হইবে।...

"কিন্তু সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।...

"কিন্তু লোকশিক্ষার কি হইবে?

"সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

"লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোক পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখী-কাঙালের ঘরকর্‌নার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড় বড় রাজা, বড় বড় রাক্ষস, বড় বড় বীর, এবং বড় বড় বানরের বড় বড় ল্যাজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।...

"কবিদের অবলম্বনটা কি?......সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-

প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা, অভ্যাস, প্রথা, শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ব-বস্তু ও বিশ্ব-রসকে একেবারে অব্যবহিতভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর।”

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ[১] করেন রাধাকমলবাবু। রবীন্দ্রনাথ রাধাকমলকেই লক্ষ্য করেছেন এমন ধারণা রাধাকমল কেন করলেন তার কৈফিয়ৎ হিসেবে তিনি লিখলেন, “তিনি (রবীন্দ্রনাথ) গোড়াতেই লিখিয়াছেন, ‘এমন কথা কেহ কেহ বলিতেছেন যে আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না।’ প্রবাসীর আষাঢ় সংখ্যায় ‘লোকশিক্ষক বা জননায়ক’ প্রবন্ধে আমি ঐ কথাই বলিয়াছি। অন্য কেহ ঐ কথা বলিয়াছেন কিনা জানি না। রবীন্দ্রবাবুর আলোচনা আমার প্রবন্ধকেই লক্ষ্য করিয়াছে তাই মনে করিয়া আমি একটা প্রত্যুত্তর দিতে সাহসী হইয়াছি।”

এই প্রত্যুত্তর দেবার আরো একটা কারণ তিনি জানালেন। “.....রবীন্দ্রবাবু সাহিত্যের ভাব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি বিশেষ আলোচনা ও অনুধাবনযোগ্য। আমাদের বর্ত্তমান-সাহিত্য রবীন্দ্রবাবুর মত ও আদর্শানুযায়ী গড়িয়া উঠিলে তাহার উন্নতি কিরূপ সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখিবার একটা প্রধান বিষয় সন্দেহ নাই।”

১ সবুজপত্র, মাঘ, ১৩২১।

এই প্রত্যুত্তরে রাধাকমল নিজের কথা পুনরায় বিশদ করলেন। —"সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি করে। রস জিনিসটার একটা আধার থাকা চাই,—সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্তন হইতেছে; যুগে যুগে বাস্তব বিভিন্ন হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-রসও বিভিন্ন হইতেছে।

"একটা গোলাপগাছ যদি আনা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটি হইতে রস সঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া এক কথায় বাস্তবকে না মানিয়া সে লিলিফুল ফুটাইবে তাহা হইলে তাহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম—বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টাও সেরূপ ব্যর্থ হয়। সাহিত্যের সাধনা,—সত্যের ও সৌন্দর্যের প্রকাশ, দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন বাস্তবের মধ্য দিয়া সে সাধনা বিভিন্ন হইতেছে।...

"জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্য-রত্নগুলি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব সেগুলি মানব-প্রকৃতির ভিতরকার একটা নিগূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছে, মানবের ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লইয়াছে,—একই সঙ্গে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে ও মানুষকে পরম সত্যের দিকে লইয়া গিয়াছে।...

"খৃষ্ট, সেণ্টপল, বুদ্ধ, চৈতন্য সমাজের গুরু হইয়াছিলেন, এখন সাহিত্যিকগণ গুরু হইতেছেন,—কার্লাইল, রাস্কিন, টলষ্টয় সমাজের শিক্ষা ও দীক্ষার ভার লইয়াছেন।"

রাধাকমল তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করেন জার্মন দার্শনিক Rudolf Eucken-এর *Main currents of modern thought* গ্রন্থ[১] থেকে

১ গ্রন্থটির মূল আখ্যা হল—Geistige Stromungen der Gegenwart.

আহৃত অনুকূল উদ্ধৃতির দ্বারা। এবং পরিশেষে জানালেন যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর সাহিত্যে যথেষ্ট ইস্কুল-মাষ্টারি করেছেন। উদাহরণ হিসেবে নাম নিলেন রাজা, ডাকঘর, গোরা ও অচলায়তনের। —"রবীন্দ্রবাবু নিজে যাহাই বলুন না কেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য আধুনিক সমাজের যে ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলে না। রবীন্দ্রবাবুর রাজা, ডাকঘর, গোরা আর্ট হিসেবে পরম সুন্দর নহে; কিন্তু তাহাদের ভিতরকার তত্ত্ব বা যুক্তি অতি গভীর ও সুন্দর। রবীন্দ্রবাবু ঐ বইগুলিতে সমাজের কয়েকটি জটিল সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; রবীন্দ্রবাবু শিক্ষকের ভার লইয়াছেন এবং অতি নিপুণভাবে সে গুরুভার বহন করিয়াছেন, তাই বইগুলিতে আর্ট হিসাবে যাহা কিছু দোষ আছে তাহাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, আমাদের দৃষ্টি পড়ে রবীন্দ্রবাবুর উপদেশের দিকে। রাজা, ডাকঘর বা গোরা যখন পড়ি তখন আমরা একজন শিল্পীর প্রস্তুত দ্রব্য ভাল লাগিল কিনা তাহা বিচার করিতে বসি না, ইস্কুল-মাষ্টারের উপদেশ শুনিতে বসি। আবার রবীন্দ্রবাবু সময়ে সময়ে কড়া ইস্কুল মাষ্টারি করিতে ছাড়েন না। অচলায়তনে রবীন্দ্রবাবু গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড লইয়া সমাজকে কষাঘাত করিতে সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই।

"যতদিন না আমাদের সাহিত্য এই হেয় জঘন্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তু—পরম সুন্দর ও চরম সত্যকে পাইবার জন্য সাধনা না করিবে, রচনা ও ভাবব্যঞ্জনার পারিপাট্য, শিল্পনৈপুণ্য, আপনার ঐশ্বর্যের অহঙ্কার দূর না করিবে, ততদিন আমাদের সাহিত্যের স্ফূর্তি নাই, সমাজের মঙ্গল নাই; আমরা সত্যের উপলব্ধি করিব না, সৌন্দর্যের বিকাশও দেখিব না। বাস্তবকে ছাড়িয়া দিলে আসল সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না।"

রাধাকমলের বক্তব্য কতখানি ত্রুটিপূর্ণ তাই দেখাতে এবার কলম ধরলেন 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী।[১] রাধাকমল তাঁর আলোচনায় 'বাস্তব' কথাটা বহুবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সে কথার কোনো ব্যাখ্যা দেন নি, যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে বাস্তবতার অর্থ কি, সেই প্রশ্নই তুলেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী তাই লিখলেন, "...রাধাকমলবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে 'বস্তুতন্ত্রতা' যে কি-বস্তু তার পরিচয় আমি লাভ করতে পারি নি। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'নিত্যবস্তু'র উল্লেখ করেছেন। 'বস্তুতন্ত্রতা'র অর্থ গ্রহণ করা যদি কঠিন হয় তাহলে 'নিত্য-বস্তুতন্ত্রতা'র অর্থ গ্রহণ করা যে অসম্ভব, সেকথা বলা বাহুল্য।"

"এ বাক্যটি [বস্তুতন্ত্রতা] সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নেই, দর্শনশাস্ত্রে আছে।...'বস্তুতন্ত্রতা' নামে সংস্কৃত হলেও পদার্থটি আসলে বিলিতি। সেই জন্য রাধাকমলবাবু তাঁর প্রবন্ধে তাঁর মতের স্বপক্ষে কেবল মাত্র ইউরোপীয় লেখকদের মত উদ্ধৃত করতে বাধ্য হয়েছেন, যদিচ সে সকল লেখকদের পরস্পারের মতের কোনও মিল নেই। জর্মাণ-দার্শনিক Eucken এবং ইংরেজ নাটককার Bernard Shaw যে সাহিত্য-জগতে একপন্থী নন, একথা, তাঁদের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন।

"ইউরোপীয় সাহিত্যের Realismই নাম-ভাঁড়িয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যে 'বস্তুতন্ত্রতা' নামে দেখা দিয়েছে।...রাধাকমলবাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইউরোপের গত-শতাব্দীর materialism-এর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনিই বই আর কিছু নয়।...

"যদি যুগধর্ম অনুসরণ করতে হয়, তাহলে এ যুগে কবিদের পক্ষে বিদেশী এবং বিজাতীয় ভাববর্জিত সাহিত্য রচনা করা

১ বস্তুতন্ত্রতার বস্তু কি ?—সবুজপত্র, মাঘ, ১৩২১।

অসম্ভব, কেননা আমরা বাঙ্গলার মাটিতে বাস করলেও বিলাতের আবহাওয়ায় বাস করি।...কাজেই যুগধর্ম অনুসারে আমরা আমাদের সাহিত্যে একটি নব এবং মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করে থাকি।...

"যুগধর্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা একথা সত্য নয়। তার কারণ প্রথমতঃ যুগধর্ম বলে কোনও যুগের একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম নেই।...দ্বিতীয়ত মন পদার্থটি কোনও বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক-অংশে কালের অধীন, অপর-অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য, ধর্ম, আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীলা সুতরাং ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে প্রতি যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমসাময়িক যুগধর্ম পরীক্ষিত এবং বিচারিত হয়েছে।

"নব যুগধর্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয় তাহলে সাহিত্য বর্তমান যুগধর্ম অতিক্রম করতে বাধ্য। যে আদর্শ সমাজে নেই সে আদর্শের সাক্ষাৎ শুধু মনশ্চক্ষুতে পাওয়া যায় এবং জীবনে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজের দখলি-সত্ত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার অর্থাৎ যুগধর্মের বিরোধী হওয়া আবশ্যক।"

রাধাকমল নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করতে Euckenএর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী সেই Euckenএর কথাই উদ্ধৃত ক'রে দেখালেন ইউরোপে বস্তুতন্ত্রতা বা Realism বলতে কি বোঝায়। তিনি লিখলেন, "...Eucken বলেন যে Realism—'প্রকৃতিকেই সব বলে ধরে নেয় এবং যে বস্তুর বহির্জগতে অস্তিত্ব আছে তাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব।' 'এ দলের অধিকাংশ লোক যা ইন্দ্রিয়গোচর তাই সত্য বলে গ্রাহ্য করেন এবং জনকতক আছেন যাঁদের মতে বিশ্ব একটি যন্ত্রমাত্র এবং যেহেতু মাপজোকের সাহায্য ব্যতীত যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং যে বস্তুকে মাপা যায় এবং ওজন করা যায় তাই হচ্ছে বাস্তব।' "...

পরিশেষে প্রমথ চৌধুরী জানালেন, “আমাদের দেশে যাঁরা বস্তুতন্ত্রতার ধুয়ো ধরেছেন তাঁরা যে ইউরোপের এই জাতীয় Realismএর চর্বিত চর্বণ রোমন্থন করছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমি Eucken-এর আর-একটি কথা উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। ‘All spiritual creation possesses a superiority as compared with the age, and liberates man from its compulsion, nay, it wages an unceasing struggle against all that belongs to the things of mere time.’ যথার্থ কবির নিকট এ সত্য প্রত্যক্ষ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের চোখ-রাঙানী হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন।”

‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে সবুজপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। এই উপন্যাস শেষ হবার আগেই কোনো মহিলার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগপূর্ণ পত্র পান। এই পত্রে অভিযোগ ছিল কিন্তু অবমাননা ছিল না। লেখিকা কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে ‘টীকাটিপ্পনি’ নামক প্রবন্ধে[১] এই অভিযোগের জবাব দেন। রবীন্দ্রনাথের জবাব থেকেই জানা যাবে মহিলাটির অভিযোগপূর্ণ প্রশ্নগুলি কি ধরনের ছিল। কবি জবাব দিলেন, “…উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যেই উপন্যাস লেখা।…যেকালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়ত আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেচে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, এ কথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করেছে।…

১ অগ্রহায়ণ, ১৩২২।

"আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে সব রেখাপাত করেচে, 'ঘরে-বাইরে' গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়চে। কিন্তু সেই ছাপার কাজ শিল্প কাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।···

"দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পাঠকের মতভেদ থাকা সম্ভব—কিন্তু গল্পকে মত বলে দেখবার ত দরকার নেই—গল্প বলেই দেখতে হবে।···

"···খাতিরটা গল্পের, লেখকেরও নয় পাঠকেরও নয়। সেই গল্পের খাতিরেই নিজের হৃদয়ভাব-সম্বন্ধে লেখককে নিজের হৃদয় অনুসরণ করতে হবেই এবং সেই গল্পের খাতিরেই পাঠককে গল্পের রস অনুসরণ করতে হবে।···

"একটা গল্পের ঘটনা সেই গল্পের অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই ঘটতে পারে আর কোথাও ঘটতে পারে না—প্রাচীন বা নবীন, হিন্দু বা অহিন্দু কোনো পরিবারেই না।[১]···মানবচরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনার নকল করার প্রতি নয়।"

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অধিকাংশ সমালোচকের হাতে সাহিত্যবিচার স্মৃতি শাস্ত্রবিচারের অঙ্গ হয়ে উঠেচে।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ কথা শোনবার মতো মেজাজ তৎকালীন সমালোচকদের অনেকেরই ছিল না। ঘরে-বাইরে নিয়ে তাই বিরূপ

১ লেখিকা প্রশ্ন করেছিলেন, এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা কি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রসূত, না বাস্তবে কোথাও তার আভাস পাওয়া গেছে? যদি পাওয়া গিয়ে থাকে তবে সে কি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বিলাসী সম্প্রদায়ে না প্রাচীন হিন্দু পরিবারে?

সমালোচনার ঢেউ উঠল। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখলেন, "রবীন্দ্রবাবুর ঘরে-বাইরে কোন কল্পিত আদর্শ বা কোন নিত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুধু পাওয়া গিয়াছে, উদ্দাম কামপ্রবৃত্তির পোষাকী রূপ। চরিত্র-বিশেষের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে যে বিশেষ আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা জঘন্য বাস্তব। কল্পনা বা আদর্শ অথবা নিত্যবস্তু ছাড়িয়া উপন্যাসখানি জঘন্য বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া আপনার মর্যাদা হারাইয়াছে। শুধু আদর্শের দিক দিয়া নহে, সাধারণ ও সার্বজনীন নৈতিক জীবনের মাপকাঠিতেও রবিবাবুর বাস্তব একেবারেই হীন, অসঙ্গত।"[১]

আর এক সমালোচক 'সাহিত্যে' লিখলেন,[২] "…সতীকে সতী, প্রেমিককে প্রেমিক ও রসিককে রসিক সাজাইয়া যাঁহারা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাঁহাদের উপর টেক্কা দিতে হইলে অসতীকে সতী, অপ্রেমিককে প্রেমিক ও অরসিককে রসিক করিয়া উপন্যাস রচনা করিতে হয়। নতুবা সে উপন্যাসের বৈচিত্র্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথ এই বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কোথাও চরিত্রবিশ্লেষণের, কোথাও মনস্তত্ত্বের, কোথাও বা আর্টের দোহাই দিয়া উপন্যাসের আকাশে সত্যের কুসুম ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন।…

"রবীন্দ্রনাথ সত্যভ্রষ্ট নিখিলেশকে আদর্শ জগতের মানুষ গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সত্যভ্রষ্ট নিখিলেশ বিমলার প্রতি তাহার নিজের কর্তব্য কতটুকু পালন করিয়াছে ?…

"যে বিমলার পাপ ও হীনতার ছবি আদর্শ সভ্য-জগতের নিখিলেশকেও বিচলিত করিয়াছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির বুকের

১ ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৩, পৃ. ১৭৭।

২ ভাদ্র, ১৩২৪। কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোঝা। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত দান বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

ইতিপূর্বে প্রমথ চৌধুরী ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ···'ঘরে-বাইরে'য় আমাদের জাতীয় সমস্যার ছবি এঁকেছেন, কেননা ও উপন্যাসখানি একটি রূপক কাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্তমান ভারত।"[১]

একথায় 'সাহিত্যে' যিনি ঘরে-বাইরের সমালোচনা ইতিপূর্বে করেছিলেন তিনি পুনরায় লিখলেন,[২] "···'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে এত বড় একটা তত্ত্বকথা থাকিলে গ্রন্থখানিকে—তাহার অন্যান্য ত্রুটি সত্ত্বেও—বাঙ্গালী আমরা আমাদের ঘরের জিনিস বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইতে পারিতাম।" লেখক মত প্রকাশ করলেন যে নিখিলেশের মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ চিত্রিত হয়নি।—"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিখিলেশকে পরিবারবিমুখ করিয়া, আত্মসর্বস্বময় করিয়া, সঙ্কীর্ণতার বেড়াজালে তাহাকে বন্দী করিয়া তাহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভারতের চিত্র নহে।" সন্দীপ নবীন ইউরোপকেও রূপ দেয়নি।—"···স্বাদেশিকতায় ইউরোপ ইন্দ্রিয়লালসায় ছট্ফট্ করিতেছে বলিলে, ইউরোপের যথার্থ চিত্র আঁকা হয় না।···বর্তমান মহাযুদ্ধে আমরা ইউরোপের যে অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইতেছি, সন্দীপের মত ইন্দ্রিয়লালসায় উদ্দাম ভোগপ্রবৃত্তির আঁস্তাকুড়ে—তাহার উদ্ভব অসম্ভব।" আর লেখকের মতে বিমলা হল কুৎসিতমূর্তি, ভোগবিলাসিনী কুলটা, তার সঙ্গে বর্তমান ভারতের কোনো মিল নেই।—"বর্তমান ভারতের লক্ষ্য যাহাই হউক···বর্তমান ভারতের

১ সবুজপত্র, মাঘ, ১৩২২, পৃ. ৬৮৫।

২ সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩২৫, পৃ. ২২৯-৩।

কর্মজীবন বিমলা-জীবনের মত মলিন নহে। 'বন্দেমাতরং' মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর বাণী আজ আসমুদ্রহিমাচল প্রতিধ্বনিত করিতেছে, দেশধর্মের মাহাত্ম্যে নবীন ভারত জাগিয়াছে, বিরোধের মধ্যে মিলন চাহিতেছে, স্থিরভাবে বিশ্বরাজ্যে সে তাহার স্থান খুঁজিতেছে,—কুলটা বিমলার মত নহে।"

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর তত্ত্বকেই গ্রহণ ক'রে ঘরে-বাইরের অনুকূল সমালোচনা করেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।[১] তিনি বললেন, "……মানুষের মধ্যে দুটো 'আমি' রয়েছে—একটা স্পষ্ট, একটা অস্পষ্ট। কিন্তু মজার কথা এই যে, এই স্পষ্ট আমিটাই হচ্ছে অসত্য আর অস্পষ্ট আমিটাই হচ্ছে সত্য।…মানুষের স্পষ্ট 'আমি'র রাজাগিরির সহস্র তামাসার মাঝে তার অস্পষ্ট 'আমি'র মৌন অভিসার কারোই চোখে পড়ছে না,—কারোই মনে লাগছে না। মানুষের এই স্পষ্ট 'আমি' হচ্ছে সন্দীপ আর তার অস্পষ্ট 'আমি' হচ্ছে নিখিলেশ। সন্দীপ সে হচ্ছে বাইরের মানুষ, নিখিলেশ সে হচ্ছে অন্তরের ঠাকুর।

এখন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে কোথায়? স্পষ্ট আমির মধ্যে না অস্পষ্ট আমির মধ্যে!…বিমলার অন্তরের সত্যতম পূজা নিবেদিত হয়ে রয়েছে কার কাছে—সন্দীপের কাছে না নিখিলেশের কাছে? তারই একটা ইতিহাস হচ্ছে 'ঘরে-বাইরে' বইখানি।" এরপর লেখক ব্যাখ্যা করেন কী ভাবে সন্দীপের মধ্যে নবীন ইউরোপের প্রতিফলন ঘটেছে, এবং নিখিলেশ ও বিমলাই বা কী ভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও বর্তমান ভারতবর্ষকে রূপদান করেছে। লেখকের ব্যাখ্যা বেশ সুচিন্তিত। তিনি পরিশেষে অভিমত প্রকাশ করেন,"…সন্দীপে আর নিখিলেশে যখন মিলন হবে—নিখিলেশের

[১] প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৬।

অন্তর-দেবতার উপরে যখন সন্দীপের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই বিমলার পূর্ণ শক্তি মুক্ত হবে—তখনই বিশ্বমানবের পূর্ণ সত্য প্রকট হবে। আমরা প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপরে নবীন ইয়োরোপের কর্ম ও ভোগকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বর্তমান ভারত গড়ে তুলব।"

'ঘরে-বাইরে' বিশেষভাবে যে-বিক্ষোভ সৃষ্টি করে তার মূল হল সীতা সম্বন্ধে সন্দীপের উক্তি। বহু বিরূপ সমালোচনার কারণ ছিল এইটাই। ব্যাপার এতদূর গড়াল[১] যে শেষে রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়ে নিজেকে প্রকাশ্যে সমর্থন করলেন এবং দেশের সাহিত্য-বিচারের প্রতি কটাক্ষ করলেন।[২] তিনি লিখলেন, " 'ঘরে-বাইরে' সম্বন্ধে রসবোধ লইয়া যদি কথা উঠিত তবে সে কথা যতই কটু হউক নীরব থাকিতাম। কিন্তু যে কথা উঠিয়াছে তাহা সাহিত্য-সীমানার বাহিরের জিনিস।...

"জানি আমাকে প্রশ্ন করা হইবে, সন্দীপ যতবড় মন্দ লোকই

---

১ একজন তো আবেগভরে নিজের ভাষাকে ছন্দোবদ্ধ ক'রে ফেললেন। 'রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে' নাম দিয়ে কবিতায় লিখলেন,

হে মহাপাতক হিন্দু! তব পুণ্য গেহ
করিও না কলঙ্কিত...
হায় বঙ্গ! যে কবির বীণায় আপনি
সুমন্দ মলয় এসে করে প্রতিধ্বনি,
তার কর প্রণালীর পূতিগন্ধময়
পঙ্কে কলঙ্কিছে যত দিব্য কুবলয়!...

[অর্চনা, ফাল্গুন, ১৩২৬]

এ কবিতার প্রত্যুত্তর হিসেবে ভারতীতে প্রকাশিত হয় 'বেতালের প্রশ্ন' (চৈত্র, ১৩২৬)।

২ সাহিত্য-বিচার। প্রবাসী, ১৩২৬, চৈত্র।

হউক তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন? আমি কৈফিয়ৎ-স্বরূপে বাল্মীকির দোহাই মানিব,—তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন?...বেদব্যাস কেন দুঃশাসনকে দিয়া জয়দ্রথকে দিয়া দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়াছেন? রাবণ রাবণের যোগ্যই কাজ করিয়াছে, দুঃশাসন জয়দ্রথ যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদিগেরই সাজে,—তেমনি আমার মতে সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপেরই যোগ্য—অতএব সে কথা অন্যায় বলিয়াই তাহা সঙ্গত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।"

তবু নিস্তার নাই। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা-প্রয়াসী যতীন্দ্রমোহন সিংহ লিখলেন, "এই কাব্যে মানসিক ভাববিশ্লেষণের চূড়ান্ত ছড়াছড়ি, ইহার আখ্যায়িকা গ্রন্থকার নিজের কথায় ব্যক্ত না করিয়া পাত্র-পাত্রীদের আত্মকথার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ক্রমাগত নিখিল, বিমলা ও সন্দীপের sick sentimentalism পাঠকের চিত্তে বিরক্তি উৎপাদন করে। সময় সময় তাহাদের পূতিগন্ধময় ভাবের বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠকপাঠিকার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তখন মনে হয় যেন এই তিন ব্যক্তি তাহাদের পেটের নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া ক্রমাগত চটকাইতেছে, এবং তাহার দুর্গন্ধে চতুর্দিকের আব-হাওয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"কবি অবশ্যই স্কুলমাষ্টারী করিতে বসেন নাই এবং তাঁহার নিকট আমরা কোন উচ্চ শিক্ষার আশা করি না। কিন্তু এই পূতিগন্ধময় কাব্য রচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু (moral atmosphere) কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।"[১]

১ সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, ১৩২৮। পৃ. ৯০-৯১ (প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য, ১৩২৭)।

এইকালে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যপরিক্রমা'। এ বই আসলে প্রবন্ধ-সংগ্রহ—প্রবাসীতে ১৩২১-১৩২৩ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির সমষ্টি। এই গ্রন্থের অন্তর্গত জীবনদেবতা, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র ও ডাকঘরের উল্লেখ যথাসময়ে করা হয়েছে। বাকী প্রবন্ধগুলির উল্লেখ এখন করব।

'রাজা' প্রবন্ধে 'রাজা' নাটক আলোচিত হয়েছে। অজিতকুমার লিখলেন, " 'রাজা' নাটক অধ্যাত্মরসের নাট্য। এ নাট্যের অনুরূপ কোনো সৃষ্টি সাহিত্যে আছে বলিয়া আমি জানি না। পশ্চিম-মহাদেশে থাকিলেও নাটকাকারে নাই, অন্য আকারে আছে।··· 'রাজা' নাটকের নাট্যবস্তু এই রূপের সাধনা এবং অধ্যাত্মসাধনার ভেদ লইয়া, এবং এই ভেদজনিত সংঘাতের উপরেই এই নাটকের পত্তন। সুতরাং এ নাটকে যে-সকল রস ফুটিয়াছে তাহা একেবারে নূতন। এ-সকল রস যেমন নূতন, যে-সকল চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া এই রসগুলি ফুটিয়াছে তাহাও নূতন।" এই নূতনত্বগুলি আলোচ্য প্রবন্ধে বিশদভাবে দেখানো হল। প্রবাসীতে এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়[১] তখন এ লেখার সঙ্গে আর একটি প্রবন্ধ ছিল, যার নাম 'আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি'। শেষোক্ত রচনা ছিল 'রাজা'র আলোচনার ভূমিকা। এতে আধুনিক নাটকের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল এবং এই মুখবন্ধের লক্ষ্য ছিল এই কথা জানাতে যে আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে 'রাজা' নাটকের স্থান কোথায়, এর আর্ট-রূপের কোনো বিশিষ্টতা আছে কি না, এবং মানবজীবনের কোন্ অংশকে এ নাটক উদ্ভাসিত

১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

করছে। 'রাজা'র আলোচনা পড়বার আগে মুখবন্ধ-স্বরূপ 'আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি' প্রবন্ধটি পাঠ করা আবশ্যক।

এই কালে রবীন্দ্র-মানস যে প্রেরণায় বহু গান সৃষ্টি করে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অজিতকুমারের তিনটি প্রবন্ধে—'ধর্মসঙ্গীত,' 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্যে'। এই সময়ের গানগুলি যে নূতন ভাব নিয়ে লেখা তা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয় নি। তাই গানগুলি কারুর কাছে ঠেকেছে দুর্বোধ্য প্রহেলিকা,[১] কারুর কাছে মনে হয়েছে 'কপটোক্তি',[২] আর কেউ বলেছেন এগুলি একেবারেই নিধুবাবুর টপ্পা।[৩] অজিতকুমারই এই গানগুলির মর্মোদ্‌ঘাটন ও স্বরূপ-বিচার করার পথিকৃৎ হলেন।

ধর্মসঙ্গীত সম্পর্কে অজিতকুমার জানালেন, "রবীন্দ্রনাথের পূর্বে-কার ধর্মসঙ্গীতগুলি প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনার ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত। তখন কবির স্বকীয় কোনো অধ্যাত্ম-অনুভূতি জাগে নাই—তিনি আপনার অভিজ্ঞতাকে আপনি বাণীরূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং তখনকার গানগুলি প্রচলিত উপাসনার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আধুনিক গানগুলি যে তাঁহার কাব্যজীবনেরই চরম পরিণতি-স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা তো প্রথাগত নহে, আত্মগত—দশের জিনিস নহে, একলার।"

'গীতাঞ্জলি' প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করলেন, কেন গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য না হয়েও পশ্চিমে এত মাতামাতির ব্যাপার হয়ে উঠল। এবং গীতাঞ্জলি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, "বাংলা গীতাঞ্জলির গানগুলিতে কবির অধ্যাত্মসাধনার বার্তার ভাগই বেশি,

১ সুরেশ সমাজপতি।

২ সাহিত্য, কার্তিক, ১৩২৩, পৃ. ৪৪৪।

৩ সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩২৫, পৃ. ২২৭।

পরিপূর্ণ উপলব্ধির বাণীর ভাগ কম।" গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য তুলনা ক'রে মন্তব্য করা হল, "গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্য এই দুই নামের মধ্যেই দুই কাব্যের পার্থক্য দিব্য সূচিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলি যেন দেবতার পায়ে সসম্ভ্রমে গীতিনিবেদন—সেখানে 'দেবতা জেনে দূর রই দাঁড়ায়ে, বন্ধু ব'লে দু হাত ধরি নে।'

"গীতিমাল্য বঁধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহার, দূরত্বের বাধা দূর হইয়া নিকট নিবিড় পরিচয়।"

এই পদগুলির রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে দেখা উচিত সেকথাও অজিতকুমার জানালেন। তাঁর মতে, "...রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব বা ভক্ত কবিদিগের সহিত তুলনা করা চলে না।...গীতিমাল্য ও গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ যে সোনার তরী চিত্রা কল্পনা ক্ষণিকারও রবীন্দ্রনাথ—যিনি প্রকৃতির কবি, মানবপ্রেমের কবি, যিনি সকল বিচিত্ররসনিগূঢ় জীবনের গান গাহিয়াছেন, তিনিই যে এখন রসানাং রসতমঃ সকল রসের রসতম ভগবৎপ্রেমের গান গাহিতেছেন—ইহাতেই ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের ভক্তিসংগীতের সঙ্গে এই নূতন ভক্তিসংগীতের প্রভেদ ঘটিয়াছে।...রবীন্দ্রনাথকে যে-সকল বিলাতি সমালোচক খৃস্টান ভক্ত কবিদের সঙ্গে বা হিব্রু প্রফেটদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন তাঁহাদের তুলনা যেমন সত্য হয় নাই, সেইরূপ যাঁহারা এতদ্দেশীয় ভক্ত কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করেন তাঁহাদেরও তুলনা ঠিক হয় বলিয়া মনে করি না। বরং আধুনিক কালের যে-সকল কবি জীবনের সকল বিচিত্রতার রসানুভূতিকে অধ্যাত্মরসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে চান, সেই সকল কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় হইতে পারেন। ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান, রবার্ট ব্রাউনিং, এড্‌ওয়ার্ড কার্পেণ্টার, উইলাম ব্লেক, ফ্রান্সিস টম্প্‌সন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাব্যজীবনধারার সঙ্গে বরং রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনধারার

তুলনা করিয়া অধ্যাত্মরসবোধের বিকাশ কোন্ কবির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।”

রবীন্দ্রনাথের কোনো একখানি মাত্র রচনা নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা-গ্রন্থ এই সময় দেখা দেওয়াটা নিশ্চয় বিস্ময়কর। মৌলবী একরামদ্দীন প্রণীত ‘রবীন্দ্র-প্রতিভা’[১] এমনই বিস্ময়কর প্রচেষ্টা। লেখক ‘নিবেদন’-এ জানালেন, “এই পুস্তক প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য ‘বিসর্জন’-এর সমালোচনা হইলেও ইহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণভাবেও অনেক কথা বলা হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম রবীন্দ্র-প্রতিভা দেওয়া হইল।” লেখক বিসর্জন নাটকের ভাব ও চরিত্র বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে করেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি লেখকের সহৃদয়তার পরিচয় এই গ্রন্থের প্রথমে সন্নিবেশিত ‘প্রস্তাবনা’[২] নামক প্রবন্ধে স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়।—“রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ কবি যাঁহার রচনা কাব্যজগতে বিপ্লব আনয়ন করে। তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের সহিত তাঁহার প্রভেদ বিস্তর। তিনি কবিতাসুন্দরীকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কবিগণ মিশ্রিত ভাব ও সৌন্দর্যের চিত্রকর, রবিবাবু বিশ্লিষ্ট বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাব ও সৌন্দর্যের চিত্রকর। পূর্ববর্তী কবিগণ ভাব ও সৌন্দর্য হইতে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া তাহার শোভা দেখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ভাব ও সৌন্দর্যের মধ্যে একান্ত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহা বিশ্লেষণ করিতেছেন।…আমরা রবীন্দ্রনাথকে সম্যক বুঝিতে না পারিলেও এতদিনে রবীন্দ্রনাথের বা নূতনের যে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

---

১ প্রকাশকাল, ১৩২১। পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৮/০ + ১২৯।

২ এ প্রবন্ধ ১৩১৮ সালে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বে ‘বীরভূমি’তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইনি রবীন্দ্র-মানসের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে প্রয়াসী হন এবং সেই সূত্রে ইঙ্গিত করেন কেন রবীন্দ্র-কাব্যের পাঠকসংখ্যা অল্প। "পাঠকের যদি সহানুভূতি ও সৌন্দর্য-গ্রহণ ক্ষমতা এই দুই গুণই থাকে, তাহা হইলে তিনি যে কোন শ্রেণীর কবিকে বুঝিতে পারেন। সহানুভূতি অনেকেরই আছে, কিন্তু সৌন্দর্য-গ্রহণ ক্ষমতা ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়; এই নিমিত্ত সহানুভূতিবিশিষ্ট সাধারণ কবিও সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধিলাভ করেন, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সৌন্দর্য-গ্রাহী কবি কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়েন।…কবিগণের এই উভয় গুণেরই সংমিশ্রণ থাকে… আমার মতে রবীন্দ্রনাথে উভয় গুণের সংমিশ্রণ থাকিলেও তাঁহার সৌন্দর্য-গ্রহণ ক্ষমতাই অধিক, এবং সহানুভূতি বা সহৃদয়তা অল্প।… তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী মধ্যে কোথাও কোনরূপ ভাবেরই আধিক্য দেখিতে পাই না। তাঁহার হৃদয়ে ভাবাবেশ কখনও ঘটে না। রবীন্দ্রনাথ নিপুণ চিত্রকর; চিত্রকরের হৃদয়ে ভাবাবেশ ঘটিলে তাহার চিত্রাঙ্কণশক্তির খর্বতা হয় এবং চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সহানুভূতিবিশিষ্ট কবিগণ ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ভাবকে করতলস্থ করিয়া এবং বিশ্লেষণ দ্বারা তাহাকে পৃথক করিয়া লোকচক্ষুর অগোচর সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছেন।"

আর একখানি পুস্তকও রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র রচনা অবলম্বনে লিখিত হয়। এটি গীতাঞ্জলি সম্পর্কে। পুস্তকটি প্রকাশিত হয় শিলেট থেকে। লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল গীতাঞ্জলিকে নিয়ে যে বিরূপ সমালোচনা দেখা দেয় তার প্রতিবাদ করা।[১] শিলচর থেকে প্রকাশিত 'সুরমা' নামক সাপ্তাহিক পত্রে গীতাঞ্জলির বিরূপ

১ উপেন্দ্রকুমার কর, "গীতাঞ্জলি" সমালোচনা (প্রতিবাদ), ১৩২১ ১০৪ পৃ.।

সমালোচনা করা হয়। এ সমালোচনায় গীতাঞ্জলির 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে' গানটি উদ্ধৃত ক'রে যা বলা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হল :

"(১) 'চরণ-ধূলার তলে' মাথা নত করিয়া দিতে হলে শারীরিক বল প্রয়োগে স্কন্ধদেশ আকর্ষণ করিতে হয়। অতএব এ স্থানে রসভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে—শান্ত রসের উপলখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া রৌদ্ররসের উৎস প্রবাহিত হইয়াছে।

(২) চোখের জলের অহঙ্কারকে ডুবাইবার শক্তি নাই। প্রমাণ—ভারতীয় ষড়দর্শন ও আধুনিক রসায়ন। অতএব কবির উক্তরূপ আকাঙ্খা 'ভারতীয় কবিত্বের মত্ত প্রলাপমাত্র।'

(৩) 'নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান।'—এই কাব্য ব্যাকরণ-দোষে দুষ্ট। অতএব রবিবাবু নিশ্চয়ই 'দুষ্টা সরস্বতীর সেবক।'

(৪) 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে'—অর্থহীন।

(৫) সমগ্র গানটি 'নির্হেতুক, পূজাহীন' প্রার্থনার দৃষ্টান্ত স্থল। অতএব ইহা 'প্রভুর প্রতি ভৃত্যের অবৈধ আদেশ স্বরূপ।' "

গানটির শেষ অংশ উদ্ধৃত করে বলা হয়েছিল যে এ-অংশে দার্শনিক-দোষ আছে, তাছাড়া কবিতাটি "শুষ্ক প্রার্থনার" একটি উদাহরণ এবং শব্দদোষেও পূর্ণ—অসমর্থতা, অবাচকতা প্রভৃতির ছড়াছড়ি।

লেখক তাঁর প্রতিবাদে এই সব অভিযোগ খণ্ডন করতে প্রয়াসী হন। রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে তাঁর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে এই উক্তিতে—"কাব্যরস-সুরসিক ইংরেজ সমালোচক যে 'inevitable word' প্রয়োগ-কৌশলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শ্রেষ্ঠ কবিদের একটা অত্যাবশ্যক গুণ। রবিবাবুর কাব্য-সাহিত্য কি পরিমাণে উক্ত গুণে গুণান্বিত তাহা তাঁহার পাঠকগণ অবগত

আছেন। শ্রেষ্ঠ কবিদের দিব্যকল্পনা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যানুভূতিই তাঁহাদিগকে শব্দচয়নের জন্য অভিধান শব্দকোষাদির অলিতে গলিতে অন্বেষণ করিয়া শ্রান্ত হইতে হয় না, পরন্তু তাঁহাদের ভাবগুলি স্বতই শব্দাকারে পরিণত হইয়া লেখনী-মুখে বাহির হইয়া পড়ে। এজন্যই তুমি আমি শত চেষ্টায়ও এরূপ এক একটি শব্দের স্থান শব্দান্তর দ্বারা পূরণ করিতে পারি না। তাহা করিতে গেলে সমগ্র কবিতাটির সঙ্গতি নষ্ট হইয়া পড়ে, রসভঙ্গ হয়—আর ঐরূপ শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি (suggestiveness) পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে যে ভাবের তরঙ্গ-নৃত্য স্পন্দিত করিয়া তুলে তাহা অকস্মাৎ নিঃস্পন্দ স্তম্ভিত হইয়া কবিতাটিকে বিকলাঙ্গ, ভ্রষ্টশ্রী ও ব্যর্থ করিয়া দেয়।

"আলোচ্য কবিতাটিতে পূর্বোল্লিখিত শব্দপ্রয়োগ-নিপুণতার অভাব নাই। আর, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে যে স্থলে কবি শব্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ঠিক সেই সেই স্থলেই 'সুরমা'র বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় কবির অক্ষমতারই পরিচয় পাইয়াছেন—ভারতীয় শব্দশাস্ত্রের পদ্ধতি লঙ্ঘনের প্রমাণ পাইয়াছেন।..."

লেখক রবীন্দ্রনাথের ভাষার বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। পুস্তকের শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন, "...ভাষার ঐশ্বর্যের প্রতি কবির আকর্ষণ 'নৈবেদ্যের' সময় পর্যন্ত লক্ষিত হয়। কিন্তু তৎপরবর্তীকাল হইতে দেখিতে পাই ভাষার গতি ফিরিয়াছে—কবির ভাষা তখন হইতে সংস্কৃত শব্দবাহুল্যের ও অলঙ্কারের বাহ্য আড়ম্বর বর্জন করিয়া প্রচলিত সরল ছোট ছোট কথাকে আশ্রয় করিয়াছে।...প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যেই ভাষার এই অনাড়ম্বর সরলতার দিকে ক্রমিক পরিণতি লক্ষ্য করা যায় বলিয়া আমার ধারণা। কবিদের শেষোক্ত অবস্থার কাব্যের অর্থ-ভরা ছোট ছোট কথাগুলি আমাদের কানের কাছে যতটা প্রকাশ করে হৃদয়ের কাছে তার সহস্র গুণ

অধিক ব্যক্ত করে।...'গীতাঞ্জলি'র ভাষা এই জাতীয়। তাহা ভাবের বিচিত্র ঋজুগতির অনুসরণ করিয়া ভাবের মাধুর্যে বিভোর হইয়া মন্ত্রমুগ্ধা অনুগতার ন্যায় চলিয়াছে—অথচ এই ঋজুগতিতে কৃত্রিম কলাকৌশলবর্জিত চেষ্টালেশবিহীন এমন একটা সহজ নৃত্য ও মৃদুমধুর ঝঙ্কার এবং এমন একটা উদার রাগিনী আছে যাহা রসজ্ঞ পাঠককে এক অপূর্ব আনন্দে বিহ্বল করিয়া তোলে।"

লেখক এই পুস্তকে গীতাঞ্জলি সম্পর্কে অন্য অভিযোগও খণ্ডন করতে প্রয়াসী হন। 'বিজয়া' মাসিকপত্রে কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এই সিদ্ধান্ত করবার চেষ্টা চলে যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতগুলিতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক রস নেই—তাতে রসাভাস মাত্র আছে; গানগুলির উদ্ভব কোনো প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা থেকে নয়, পরন্তু মানসকল্পনা বা fancy থেকে। এই অভিযোগ-উৎপত্তির কারণটার দিকে লেখক ইঙ্গিত করেন,—"মনে হয় যে, উক্ত লেখকের মনে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ সংস্কার দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে এবং ঐ সংস্কারের দ্বারাই তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন ও ধর্মসঙ্গীত ও কবিতাকে খাট করিয়া দেখিতেছেন। এ সংস্কার মন হইতে দূর করিয়া যদি তিনি কবির স্পষ্ট সাহিত্যের ভাব ও চিন্তারাশি পূর্ণগত মহাত্মাদের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা দ্বারা পরখ করিয়া বিচারে অগ্রসর হইতেন তবে নিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহার আলোচনার ফল ভিন্নরূপ হইত।" রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতগুলি কীভাবে বিচার করা উচিত লেখক সেদিকেও নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "আধ্যাত্মিক বস্তু বা তত্ত্বের পরীক্ষা (test) কিসে? তুমি আমি সাধনার আত্মক্ষরের মর্ম পর্যন্ত অবগত নহি অথচ অসঙ্কোচে প্রচার করিতেছি এটা আধ্যাত্মিক বস্তু আর ওটা অবস্তু (fancy)। যাঁহারা স্বীয় জীবনের সাধনার দ্বারা ভগবদ্‌তত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই মাত্র প্রকৃতপক্ষে এই বিচার করিতে

সক্ষম। তত্ত্বের প্রত্যক্ষদর্শন দ্বারা হৃদয়ে যে অটল প্রতীতি জন্মে তাহাই প্রকৃত অভ্রান্ত জ্ঞান। এই যে প্রত্যক্ষদর্শনজনিত অনুভূতি তাহাকে ইংরেজিতে Intuition বলা যায়। এইরূপ জ্ঞানের তুলনায় যুক্তিমূলক অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্ধ সত্য ও অর্ধ অসত্য বা সত্যাভাস মাত্র। এমতাবস্থায় আমাদের ন্যায় স্থূলদর্শিগণের সত্য-নিরূপণের একমাত্র উপায় পূর্বগত সাধক মহাত্মাগণের লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের পরীক্ষা করা।"

মানসী পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে প্রথম সমালোচনা প্রবন্ধাকারে মাসিকের পৃষ্ঠায় দেখা দেয়। বহুদিন পরে এই সময় বিষয়টি অবলম্বন ক'রে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হল।[১] অবশ্য পুস্তিকার বিষয়বস্তু 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে লেখক আলোচনা করেন তা হল এই—"রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত-পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আবহমানকাল হইতে মাত্র কয়েকটি পুরাতন ছন্দই চলিয়া আসিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের শেষাগ্রজ হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং বিহারীলাল প্রভৃতি কবিগণ বহুলভাবে সেই সকল ছন্দই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।...ভারতচন্দ্র কয়েকটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কবিগণ সেগুলির বড় আদর করেন নাই। রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ কয়েকটি নূতন ছন্দ বাংলা সাহিত্যকে দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পরে প্রচলিত সমস্ত ছন্দগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া বাড়াইয়া কমাইয়া এক অপরূপ মাধুর্য দান তো করিয়াছেনই, পরন্তু অসংখ্য নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার বিশ্বকর্মা প্রতিভা এই সৃষ্টিকার্য বন্ধ করে নাই।"

---

১ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ১৩২৯। ৬৪ পৃ.।

লেখক অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে কোনো তত্ত্বঘটিত বিশদ আলোচনা করেন নি। বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যে নূতন স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন তার একটা শ্রেণী ও সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে উদাহরণ নিয়ে ছন্দে বিভিন্নতা ও তাদের নাম নির্দেশ করেন লেখক। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে যে সাধারণ মন্তব্য করেন তাতে লেখকের এ বিষয়ে মর্ম-গ্রাহীতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "কবিই আবিষ্কার করিলেন, যুক্তাক্ষরের মধ্যে সহজাত একটা বেগ ও একটা ছন্দ আছে। ইহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। তাহাই হইল। যুক্তাক্ষরের এই নায়েগ্রা জলপ্রপাত সত্য সত্যই পরিশেষে ছন্দের এই অমরাবতী গড়িয়া তুলিল।…রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের নিগূঢ় প্রাণ-স্পন্দনটুকু, তাহার তাল মান, তাহার সুর এবং রূপ, যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তেমন বাংলা ভাষায় আর কোনো কবিই ইতিপূর্বে আর কখনও করেন নাই।"

কিন্তু ছন্দে ব্যবহৃত যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নূতন নিয়ম এতদিন সফলভাবে ব্যবহৃত হবার পরে তখনও প্রাচীন কাব্যামোদিগণ রবীন্দ্রনাথের ছন্দকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই দেখা যায় এই কালেও পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন 'নারায়ণে'র পৃষ্ঠায়[১] রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করছেন।—"কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদিগের পদানুসরণে ছন্দঃ লইয়া ভগবানের উপরে কান্তভাব স্থাপন করিয়া অধিকাংশ কবিতা লিখিয়াছেন।… বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ এমন কি ভারতচন্দ্র পর্যন্ত যখন যে সংস্কৃতচ্ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তাঁহারা সেই সেই কবিতায় 'হ্রস্ব-লঘু, দীর্ঘ-গুরু, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী

---

১ রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ছন্দ। নারায়ণ, ১৩২৬, মাঘ।

বর্ণও গুরু' এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন নিয়ম দূরে বর্জন করিয়াছেন, 'হ্রস্ব-লঘু দীর্ঘ-গুরু' তিনি মানেন নাই; 'সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণগুরু' এই মাত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।···

"যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যেও কলিকাতা প্রদেশের কথ্যভাষা চালাইতে বদ্ধপরিকর, তিনি যে কবিতায় সংযুক্তবর্ণগুম্ফিত শ্রুতিকঠোর সংস্কৃত শব্দরাশি কেন চালাইতেছেন, তাহার কারণ-নির্ণয়ে আমরা একান্ত অসমর্থ।···পদাবলীর প্রণেতা বৈষ্ণব কবিগণ ও প্রাচীন অন্যান্য কবিগণ সংস্কৃতশব্দের সংযুক্ত বর্ণকে বিযুক্ত করিয়া কোমল করিয়া কবিতায় বসাইতেন; তাহার ফলে 'ধর্ম' 'ধরম', 'কর্ম' 'করম', 'প্রীতি' 'পীরিতি' হইয়াছে; কৃষ্ণ পর্যন্ত কানু হইয়াছেন।"

'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ' পুস্তকের লেখক তাঁর পুস্তকের প্রারম্ভে লিখেছিলেন, "···রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উপহাস কুৎসা কটুকাটব্য গালিগালাজ করিতে দেশে অপিরিমিত মূলধনে একটি স্বদেশী যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে। এ ব্যবসাটির এখন খুব চলতি অবস্থা, কারণ বিনা মূলধনে শূন্য বখরায় পূরা মুনাফার লোভে অংশীদারের কখন অভাব হয় না।" এই কারবারেরই একটি ফসল হল অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'রবিয়ানা' পুস্তক।[১] ইনিই একদা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় 'কাব্যে গন্ধ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এ রচনার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি। সাহিত্য-সম্পাদক এঁকে নবীন লেখক বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং নবীন হয়ে এই লেখক রবীন্দ্রনাথের নব্যকাব্যের বিরূপ সমালোচনা করায় প্রবীণ সম্পাদক বেশ খানিক হর্ষ উপভোগ করেছিলেন। রবিয়ানার লেখক সমালোচনার নামে অপমান ও উপহাস ক'রেই

১ প্রকাশকাল ১৩২৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৭

নিজের দায়িত্বের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। পুস্তকের ভূমিকায় নিজের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন তা হল এই—"কবিবর রবীন্দ্রনাথের মত নিতুই নব। তাঁহার নিকট আজ যাহা 'হাঁ' কাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যনীতি প্রভৃতি সকল রকম নীতিতেই কবিবরের মত নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। এই সকল কথাই এই পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও বলিয়াছি।···উচ্ছ্বাসের মুখে কবি তাঁহার কবিতা বা গাথায় যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, আমরা তাহাতে বাঙনিষ্পত্তি করিব না। কিন্তু সমাজ-ক্ষেত্রে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কবি যদি উচ্ছ্বাসকে সর্বস্ব ভাবিয়া, উপমাকে সম্বল করিয়া যুক্তিতর্কের মস্তকে বারংবার পদাঘাত করেন, তবে সেটা সহ্য করা, উপেক্ষা করা পাপ।—পাপ এই হিসাবে যে তাহাতে দেশের সবিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।" লেখকের ভাষার নমুনা হল এই—"নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বে রবীন্দ্রবাবু অবশ্য কবিগুরু বাল্মীকিকে খোঁচা মারিবার সাহস করিতেন না।···কিন্তু দেশশুদ্ধ লোকের বাহবা পাইয়া, সৌভাগ্যের গাদায় বসিয়া রবীন্দ্রনাথ···আজ ব্যাস-বাল্মীকিকে তিনি তুড়ি দিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন!—ভাবিতেছেন তাঁহার কলমের খোঁচার উপরেই তাঁহাদের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।"[১] তাঁর মতে "সুবিধাবাদী যেমন মিনিটে মিনিটে মতান্তরে গড়াইয়া চলে, রবীন্দ্রনাথও তেমনই গড়াইতেছেন।"[২] এবং লেখক সর্বশেষে লেখেন "Oh Inconsistency! Thy name is Rabindranath!" অর্থাৎ, হে অসঙ্গতি, তোমারই নাম রবীন্দ্রনাথ।

১ পৃ. ৮২।

২ পৃ. ৬৮।

এই কালে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনার যে ঢেউ ওঠে তার দ্বারা এটাই সূচিত হয় যে এই সময় বাংলা-সাহিত্য ও চিন্তা জগতে একটা তীব্র আলোড়ন এসেছিল। এই সময় একজন সমালোচক যথার্থ ই লিখেছিলেন, "আজকাল ভাবরাজ্যে ও ব্যবহাররাজ্যে, জ্ঞান, দর্শন, চারিত্রের, সাহিত্য, শাস্ত্র ও কলা-কৌশলের যেরূপ চালনা ও আলোচনা হইতেছে তাহার ঠাট-ঠমক, লক্ষণা-লক্ষণ ও গতিবিধি রাগ-বিরাগশূন্য হৃদয়ে পর্যাবেক্ষণ করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে আমরা এক যুগপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আসিয়াছি। ইহা আদর্শ-বাস্তবের প্রবীণ-নবীনের, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ।"[১] বলা বাহুল্য এই সন্ধিক্ষণ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যকৃতির আদর্শ ও রূপ বাংলাসাহিত্যের পুরাতন ধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে নূতন কিছু হয়ে দেখা দিল। নবীনদল তাঁরই অনুকরণে সাহিত্য-সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হলেন। ফলে গড়ে উঠল নূতন সাহিত্য। এই নূতন সাহিত্য এখন এমন রূপ নিল যে তাকে আর উপেক্ষা করা চলল না। সুতরাং শুরু হল বিরোধ—পুরাতনের আদর্শে ও নূতনের আদর্শে। 'নারায়ণ'কে ঘিরে বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে একটা সাহিত্য ও সমালোচনা গোষ্ঠী গড়ে উঠল যাঁরা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন নূতন বাংলাসাহিত্য বিজাতীয় হয়ে উঠছে, তাতে বাংলার প্রাণ নেই। এঁদের সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি ছিল পুরাতন বাংলাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

অন্যপক্ষে, সবুজপত্রের গোষ্ঠীর অস্তিত্বই হল নূতন সাহিত্যের জন্যে। 'বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী অভিমত প্রকাশ করেন, "এই নব-কবিদের রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ সকল রচনা, ভাষার পারিপাট্যে এবং আকারের

১ নারায়ণ, পৌষ, ১৩২৪, পৃ. ১৫৫।

পরিচ্ছন্নতায়, পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।...নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলী কিম্বা নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জনী'র তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্বযুগের অপেক্ষা আর্ট-অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে।"[১]

রবীন্দ্র-সাহিত্য বিলেতী শিক্ষার ভিত্তির উপর গঠিত এবং সেই কারণে তা বিজাতীয় ও স্বাদেশিকতা তথা বাঙালিয়ানার পরিপন্থী—এমন যে-কথা এই কালে খুবই স্ফীত হয়ে উঠেছিল তার প্রতিবাদ-স্বরূপ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রবাসীর পৃষ্ঠায়[২] লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথ বর্তমান কালের বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার বীণা বাজাইয়াছেন আর সেই বীণার ঝঙ্কার সকল হৃদয়ের সমান তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়াছে, তাই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বর্তমান বাঙ্গালার কবি। তাঁহার কবিতার যে প্রাণ, সে খাঁটি বাঙ্গালীর প্রাণ, শুনিতে পাইতেছি যে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল সম্পূর্ণরূপে বিদেশীভাবে অনুপ্রাণিত তাহা নহে, তিনি তাঁহার দীর্ঘ কবি-জীবনে পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানা ফুলে মধুচয়ন করিয়া কেবল তাহাই উদ্গিরণ করিয়াছেন।... কিন্তু একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজ রবীন্দ্রনাথের এই প্রকাণ্ড ঋণের বোঝা ধরিয়া তাঁহাকে Insolvency Court এ হাজির না করিয়া তাঁহার কবিতাকে একটা সম্পূর্ণ নূতন জিনিস, পাশ্চাত্য জগতে অপরিচিত এক নূতন তত্ত্বের পথ-প্রদর্শক বলিয়া সম্বর্ধনা করিয়াছে।"

১ সবুজপত্র, কার্তিক, ১৩২২, পৃ. ৩৯৭।

২ কার্তিক, ১৩২৫।

॥ ১২ ॥

[১৩৩০-১৩৪০ ; ১৯২৪-১৯৩৪]

রচনা

পূরবী	১৩৩২	১৯২৫
গৃহপ্রবেশ	"	"
প্রবাহিণী	"	"
গীতি-চর্চা	"	"
শোধ-বোধ	১৩৩৩	১৯২৬
নটীর পূজা	"	"
ঋতু-উৎসব	"	"
রক্তকরবী	"	"
লেখন	১৩৩৪	১৯২৭
ঋতুরঙ্গ	"	"
শেষরক্ষা	১৩৩৫	১৯২৮
যোগাযোগ	১৩৩৬	১৯২৯
শেষের কবিতা	"	"
মহুয়া	"	১৯৩০
রাশিয়ার চিঠি	১৩৩৮	১৯৩১
বন-বাণী	"	"
দুই বোন	১৩৩৯	১৯৩৩
মানুষের ধর্ম	"	"
বিচিত্রতা	১৩৩৯	১৯৩৩
তাসের দেশ	১৩৪০	"
বাঁশরী	"	"
		১৯৩৪

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ১৩২০-১৩৩০ দশকের রবীন্দ্র-সমালোচনার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে দেখেছি যে, রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে এই

দশকে একটা তুমুল বাদ-বিতণ্ডা, তর্ক-কলহ চলে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদর্শে বাংলাসাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে দেখে একদল সমালোচক আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। সাহিত্যে নূতন আদর্শ, ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি দেখে তাঁরা বিচলিত হয়ে প্রচার করতে লাগলেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য বিজাতীয়, দুর্বোধ্য, দুর্নীতিমূলক, স্বাদেশিকতার পরিপন্থী, বাঙালিত্বহীন ইত্যাদি। অন্যপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে সর্বতোভাবে সমর্থন করতে লাগলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহায়ক হয়ে দেখা দিল 'সবুজপত্র', আর এ সাহিত্যের গতিরোধ করবার জন্য প্রয়াস পেল 'নারায়ণ'। বৃদ্ধ 'সাহিত্যে'র একটানা প্রতিবাদের ভঙ্গ, কর্কশ স্বর অব্যাহত তো ছিলই। এই সোর-গোলের বেশির ভাগই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে এককথায় বিচার করার ওপর সৃষ্টি হয়। তবে কিয়দংশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও রস-সমীক্ষা যে হয়নি, তা নয়। বিশেষ ক'রে অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যের মল্লিনাথরূপেই পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু ১৩৩০ সালের মধ্যেই এই দশকের রবীন্দ্র-সমালোচনা অতীতের অধ্যায়ের পরিণত হয়। সুরেশ সমাজপতির দেহত্যাগের পর সাহিত্য পত্রিকা কিছুদিন চ'লে বন্ধ হয়। সবুজপত্র ও নারায়ণ যেন আপন আপন কর্মসমাধা ক'রে বিদায় গ্রহণ করল।—সবুজপত্র রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তৎ-প্রণোদিত নব্যসাহিত্যের তরঙ্গ-প্রবাহকে আবাহন জানিয়ে অবসর নিল, নারায়ণ এই তরঙ্গ-প্রবাহ রোধ করা অসম্ভব জেনেই যেন সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করল।

অন্যদিকে অজিতকুমারের বলিষ্ঠ লেখনী থেকে রবীন্দ্র-সমালোচনার যে স্বচ্ছ ধারা উৎসারিত হচ্ছিল, সে ধারা অজিতকুমারের অকস্মাৎ দেহাবসানে অকালে রুদ্ধগতি হল।

আলোচ্য দশক শুরু হয় 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভাব দ্বারা। তারপর দেখা দেয় 'কালিকলম'। এই পত্রিকা দুটিকে ঘিরে সেদিন

যে সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল নূতন সাহিত্যে-চিন্তা ও সাহিত্য-স্বষ্টির প্রবর্তনায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশের পরিস্থিতি একটা নূতন রূপ নেয়; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ক্রম-অবনতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্য-প্রেরণার জন্যে দেশের তরুণ লেখকগণ ইংলণ্ডের চেয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশ অর্থাৎ তথাকথিত কন্‌টিনেন্‌টের মুখাপেক্ষী বেশি হয়ে উঠলেন। বিশেষ ক'রে রুশ, ও স্কান্‌ডেনিভিয়ার সাহিত্যিকগণ এদেশে খুব প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন। তরুণ সাহিত্যিকগণ দুটো জিনিসের প্রতি খুব আকৃষ্ট হলেন। এক, নিপীড়িত জনগণের জীবন; দুই, যৌন-চেতনার বিশ্লেষণ। এই দুই জিনিস এমন উদগ্রভাবে বাংলাসাহিত্যের বিষয়বস্তুকে তখন ভরাট করল যে বাংলাসাহিত্য তরুণদের হাতে যেন একটা নূতন রূপ নিল যাকে বলা হতে লাগল 'অতি আধুনিক সাহিত্য'। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এই সময়টি 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত। একজন সমসাময়িক সমালোচক বলেছেন, "এই 'অতি-আধুনিক' কথা-সাহিত্য প্রধানত কল্লোল ও কালিকলম নামক মাসিকদ্বয়েই জন্ম ও পরিণতি লাভ করিতেছে।"[১]

সাহিত্যের এই নূতন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ classical লেখকদের পর্যায়ে পড়লেন, যার অর্থ হল এই যে তিনি নবীনদের চোখে প্রাচীনরূপে গণ্য হলেন। অবশ্য কথাটিকে কল্লোলের পৃষ্ঠায় এক তরুণ সমালোচক যথেষ্ট সম্মানের চিনি দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি লেখেন "যে-সকল শ্রেষ্ঠ লেখক যে-কোনো কালে বর্তমান থাকিয়াও বিশ্ব-সাহিত্যের (বিশ্ব-সাহিত্য মানে কোনো বিশেষ কালের য়ুরোপের সাহিত্য নয়—আদি যুগ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতের যে স্থানে যে কালে যত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইয়াছে,

১ কল্লোল, ১৩৩৪, আষাঢ়, পৃ. ২১০।

তাহারই অপূর্ব ভাণ্ডার) সম্পদ অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারাই classical রূপে পরিচিত। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসও classical আবার রবীন্দ্রনাথও classical।"[১]

এই দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথ দেশের সর্বত্র প্রকৃত প্রবীণত্বের মর্যাদা ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হন। এখন থেকে দেখা গেল তাঁর সম্পর্কে সব সমালোচনাই শ্রদ্ধাপূর্ণ, মতের অমিল থাকলেও প্রকাশ পায়নি অশ্রদ্ধা, অশালীন রূঢ়তা, উপহাস ও বিদ্বেষ। তার কারণ, এযুগে রবীন্দ্রনাথ বয়সে প্রায় সকলের চেয়েই প্রবীণ, সাহিত্যকর্মে তো নিঃসন্দেহে সকলেই তাঁর কাছে নবীন। বাংলাসাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এযুগে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, যদিও তাঁর সাহিত্যকৃতির ত্রুটি ও দুর্বলতা নবীনদের কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছিল নবীনরা সেভাবে তা জানাতে পশ্চাৎপদ হননি।

তাই দেখি এই সময় একজন নবীন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন, " 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ যে প্রতিভার বীজ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, 'ঘরে-বাইরে'তে তাহা পরিণত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে একটা বিষয় ভাল করিয়া বুঝা যায়—ইহার পিছনে রবীন্দ্রনাথের গভীর সাধনা রহিয়াছে। জীবনের বিভিন্ন দিকের সহিত পরিচয়ে তাঁহার হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি বাজিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় তিনি মানব-হৃদয়ের গভীরতা ও জটিলতার ভিতর প্রবেশ-লাভ করিতে পারিয়াছেন।

"কিন্তু কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সবটুকু দান এক করিয়া বিচার করিলেও মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা দিক্ বাদ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা;

---

১ কল্লোল, ১৩৩৪, আষাঢ়, পৃ. ২১৩।

এমন কি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই। মানুষ যেখানে সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে—হয় তো তাহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে সত্যের স্ফুলিঙ্গটুকু বাঁচিয়া আছে মাত্র—সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই না। জীবনের এই পাপের দিক্‌টার চিত্রণে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহার কারণ বুঝা সহজ। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত যে কবি-হৃদয় 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি' সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা তাঁহার উপন্যাস-গুলিতেও ছায়া ফেলিয়াছে। তাঁহার চিত্ত হোমানলের মত উপর দিকে উঠিয়া সুন্দরের মাঝে সত্যকে খুঁজিয়াছে; মলিনতার ভিতর নামিয়া তাহারও ভিতর যে পরম সত্য লুকাইয়া আছে তাহার সন্ধানলুব্ধ হয় নাই।"[1]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই কালেরই একজন প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত, চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি বাংলা কথাসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জানালেন[2] যে এ কথাসাহিত্য পরিপূর্ণরূপে আভিজাত্য-আশ্রিত। তিনি লিখলেন, "আমাদের দেশে যাঁহারা কথাসাহিত্য লেখেন তাঁহাদের দরিদ্রজীবনের অভিজ্ঞতা নাই। এ অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার জন্য যে নিষ্ঠা ও কঠোর ত্যাগের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের নাই। তাই সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁহারা দরিদ্রজীবনের করুণ মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকিতে পারেন না।···বঙ্গবাণীর যাঁহারা সেবক তাঁহাদেরও দৃষ্টি এদিকে ফিরিবে না কি? কত দিন দরিদ্রের ঘরে ভগবান তাঁহাদের সেবায় বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন?" এই প্রসঙ্গে লেখক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির উল্লেখ করে বললেন, "বিশ্ববরেণ্য

১ ভবানী ভট্টাচার্য: কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩৪, পৃ. ২৭৩।

২ বাঙ্গলার কথার আভিজাত্য। বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ১৩৩২।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে ‘এবার ফিরাও মোরে’ বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, একটা বৃহত্তর বাণীর আহ্বানে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। অগ্নিময় সুধাময় উদ্দীপনা তাঁহার বাণী —তিনি দরিদ্রের জীবনের ছবি বাঙ্গালীর চক্ষে তুলিয়া ধরিলেন, ঘরে ঘরে নিদারুণ আত্মতিরস্কার হাহাকার করিয়া উঠিত, সেবার উৎসাহে বাঙ্গালী আকুল হইয়া অগ্রসর হইত। সে বাণী আজ বিশ্বের সেবায় নিয়োজিত, পৃথিবীর দিক হইতে দিগন্তে তাহা ধ্বনিত হইতেছে —তাহাতে আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি জগৎ সমৃদ্ধ হইয়াছে, দরিদ্রের দুর্ভাগ্য, সে তাহাতে উপকৃত হইতে পারে নাই।”

রবীন্দ্র-সাহিত্যে দারিদ্র্য-আরতি ও পঙ্কিলতা-পোষণ হয়নি ব’লে তরুণ সাহিত্যিকগণ এই দুটি দিক দিয়ে সাহিত্যে নবত্ব আনতে প্রয়াসী হলেন। কিন্তু এই নূতন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন বিদেশী সাহিত্য থেকে পাঠ নেওয়া রিয়ালিটির নামে দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম। তিনি এ সাহিত্যকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি স্পষ্টই লিখলেন, “সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রস-বোধে যে-আব্রু আছে সেইটাই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটাই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিকার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।”[১]

“সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। একেই বলে

১ সাহিত্যের ধর্ম। সাহিত্যের পথে, পৃ. ৮৪। প্রথম প্রকাশ, বিচিত্রা, ১৩৩৪, শ্রাবণ।

ওরিজিন্যালিটি। যখনই সে আজগবিকে নিয়ে…ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে তখনই বোঝা যায়, শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্যধারায় নৌকো-চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে ; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলিকে স্থানে স্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াটাই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। …সেই চরমের নমুনা ইউরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজম্। এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায়, সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে।"[১]

বরণীয় সাহিত্যের জন্যে বিষয় নির্বাচনের দায়িত্ব আছে, সেকথাও রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ঘোষণা করলেন।—"যে মন বরণীয়কে বরণ করে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজ্‌নেফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজ্‌নে-ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্বতায় কবির কাছেও সজ্‌নে আপন ফুলের যাথার্থ হারাল। বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে।"[২]

রবীন্দ্রনাথের এই মতের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনি লিখলেন, যে সজনে ফুলের দৃষ্টান্ত কবি দিয়েছেন "তাহাই অন্ততঃ তাঁর নিজের কাছে সার্থক হইয়া উঠিয়া তাঁর কাব্যে

---

১ সাহিত্যের নবত্ব। সাহিত্যের পথে, পৃ. ৮৮-৯। প্রথম প্রকাশ, প্রবাসী, ১৩৪৪, অগ্রহায়ণ। মূল নাম 'যাত্রীর ডায়ারি'।

২ সাহিত্যের ধর্ম। সাহিত্যের পথে, পৃ. ৭৮।

স্থান পাইয়াছে, আর 'বিচিত্রা'র শ্রাবণের সংখ্যাতেই তেমনি কুর্‌চি ফুল তাঁর কাছে সার্থক হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে বিম্ব ফল কবির কাছে পরম সার্থক, কবি হয় তো জানেন না, তাহাও লোকে কাজে লাগাইয়া থাকে এবং কোথাও কোথাও তাহার তরকারীও খাইয়া থাকে।…যাহা প্রয়োজনে লাগে তাই যে কাব্য-হিসাবে অসার্থক, আর যাহা নিষ্প্রয়োজন তাই সার্থক নয়, এ কথা সত্য নহে, আর ইহার পক্ষে প্রকৃত কোনও যুক্তি নাই। কবির কাছে কোন জিনিসটা সার্থক, কোন্‌টা অসার্থক তার একমাত্র নির্ণায়ক সেই বিশিষ্ট কবির রস-বোধ। যাহা সেই রস-বোধকে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই সার্থক, যাহা তা' করে না তাহা অসার্থক।"[১]

'বিদেশের আমদানী বে-আব্রুতা' অভিহিত রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের বিরুদ্ধে নরেশচন্দ্র লিখলেন, "সাহিত্যের বে-আব্রুতা সম্বন্ধে…কোনও নিত্য বা সনাতন মাপকাঠি নাই, এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা আব্রুতার ও বে-আব্রুতার মধ্যে একটা খুব সুনির্দিষ্ট সীমানা টানিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 'চোখের বালি'র অনেকগুলি দৃশ্য অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আব্রু। 'ঘরে-বাইরে'র অনেকটা তো বটেই। অথচ আমরা তা মনে করি না, এবং সম্ভবতঃ কবীন্দ্রও তাহা মনে করেন না।"[২] তিনি আরও লিখলেন, "নূতন সাহিত্যকে 'বিদেশের আমদানী' বলিয়া কবিবর কটাক্ষ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ-কথা লইয়া কটাক্ষপাতের প্রত্যাশা করি নাই। আলো যদি আমার অন্তরে আসিয়া থাকে, তাহা কোন্ জানলা দিয়া আসিয়াছে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, যদি সে আলো সত্য সত্যই আমার অন্তরের ভিতরকার মণিরত্ন উদ্ভাসিত করিয়া থাকে।

১ বিচিত্রা, ভাদ্র, ১৩৩৪, পৃ. ৩৮৬। 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' প্রবন্ধ।
২ ঐ পৃ ৩৮১।

…রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অনেকটারই উদ্দীপনা আসিয়াছে পশ্চিমের সাহিত্য ও সমাজ হইতে।…

"যে সাহিত্যকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই সমরাভিযান, তাহাকে তিনি কেবল এককথায় বিলাতের আম্‌দানী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। এই সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক লেখাই আছে, যাহা নিঃশেষে দেশের জীবন ও সমাজের সত্য স্বরূপের রসমূর্তি—যাকে বিলাতের আম্‌দানী বলা একটা নিষ্ঠুর পরিহাস।"[১]

কিন্তু নরেশচন্দ্র প্রতিবাদের আবেগে ভুলে গিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ দেশের নূতন সাহিত্যকে বিদেশের আমদানী বলেননি, এ সাহিত্যের বে-আব্রুতাকেই বলেছিলেন বিদেশের আমদানী।

নরেশচন্দ্রের পর শরৎচন্দ্র কলম ধরেন 'সাহিত্য-ধর্মের' প্রতিবাদে।[২] তিনি বললেন, "কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, বক, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপ-জাম-ফুলও না, যদিচ সে, শিরীষ ফুলের সর্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলো মানুষে খায়। রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গাদেবীর মকরের কাছে। অথচ, হাতের কাছে বাগ্‌দেবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষে উজাড় করিয়া দিল, সে তাঁহার চোখে পড়িল না। কুমুদ ফুলের বীজ হইতে ভেটের খৈ হয়, এমন যে পদ্মবীজ তাহারও বীজ লোকে ভাজিয়া খাইতে ছাড়ে না। তিল ফুলের সহিত নাসিকার, কদলী বৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা বিরল নহে। অথচ, সুপক্ক মর্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণার অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই

১ বিচিত্রা, ভাদ্র, ১৩৩৪, পৃ. ৩৮৯।

২ বঙ্গবাণী, আশ্বিন, ১৩৩৪।

শুনি নাই।...এই ধরনের গোটা কয়েক এলো-মেলো দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া কবি চিরদিনই জোর করিয়া বলেন, এর পরে আর সন্দেহই থাকতে পারে না যে, আমি যা বোল্‌চি তাই ঠিক এবং তুমি যা বোল্‌চ সেটা ভুল।...

"...কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য ত নয়ই! 'সোনার তরী'র যা লইয়া চলে 'চোখের বালির' তাহাতে কুলায় না। সজিনা ফুলে, বক ফুলে সোনার তরীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়।"

এই প্রতিবাদ জানালেও, শরৎচন্দ্র একথাও লিখলেন যে কবির বক্তব্যের কোন্ অংশের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ সহমত, এবং সেক্ষেত্রে নরেশচন্দ্রের প্রতিবাদ-প্রশ্ন ভ্রান্ত।—"কবি তাঁহার 'সাহিত্য-ধর্মে' নর-নারীর যৌন-মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যের তাহা খাঁটি কথা। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে, ও ব্যাপারটা ত আছেই। কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দুটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটিই আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিৎ আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে না কি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর, অপরের হাতে তাহাই কদর্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বেআব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিৎ।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সাহিত্য-দ্বন্দ্ব ঘটলেও, রবীন্দ্রসাহিত্যের রসগ্রাহী সমালোচনার প্রসার এই দশকে বেশ দেখা যায়। এই কালে কয়েকজন নবীন লেখকদের আবির্ভাব হয় যাঁরা উত্তরকালে আপন আপন মনীষা ও রসবোধের দ্বারা প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সমালোচক-রূপে প্রতিষ্ঠা পান। কবির নূতন লেখা প্রকাশিত হলে অজিতকুমার যেমন তার রসগ্রাহী সমালোচনা করতেন, এ কালে সেই কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন কয়েকজন তরুণ রবীন্দ্র-ভক্ত।

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে তার এক মরমী সমালোচনা করলেন নীহাররঞ্জন রায়।[১] গীতাঞ্জলি, খেয়া, গীতিমাল্যের পর কবি বলাকা, পলাতকা এবং পরিশেষে পূরবীর কবিতাগুলি কি ক'রে লিখতে পারলেন, অর্থাৎ অধ্যাত্মভাবের ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ ক'রে পুনরায় পার্থিব বস্তুর আকর্ষণে মর্তে অবতরণ করলেন—কবিচিত্তের এই আপাতবিরোধ ও বিসদৃশতা অনেকের কাছে কিছু দুর্বোধ ঠেকে। কিন্তু এটি যে কবিচিত্তের বিরোধ নয়, বরং নিজস্ব প্রকৃতি, এই কথা জানালেন এই তরুণ সমালোচক। তিনি লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সঙ্গে যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারাই একথা স্বীকার করিবেন যে, সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া সকল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সকল বস্তুর স্পর্শ ও অনুভূতি লাভ করিবার আকাঙ্খা সর্বদাই কবিকে চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। কি সৌন্দর্য, কি প্রেম, কি প্রকৃতি, কি অধ্যাত্মবোধ, সবকিছুর সঙ্গে একটা নিবিড় বন্ধন তাঁহার কাব্যের মধ্যে সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কবিচিত্ত সবকিছুর মধ্যে আপনাকে একান্ত লীন করিয়া দিয়া তারই পরিপূর্ণ আবেগে চিত্তের সব তন্তুকে একেবারে ভরপূর করিয়া লইয়াছে এবং তার ফলে কবি ও কাব্য এক অন্যকে নিবিড় অলিঙ্গনে আবদ্ধ

---

১ রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২।

করিয়া চিরন্তন রসমূর্তিতে অনাগত কালের পানে তাকাইয়া আছে। একদিকে একথা যেমন সত্য, তেমনি অন্যদিকে একথাও সত্য রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত জীবনের বিচিত্র রস ও অনুভূতির আস্বাদনে ও উপলব্ধিতে সর্বদাই উন্মুখ। তাঁহার কবিহৃদয় কোনো নির্দিষ্ট ভাব-উৎস হইতে রস সংগ্রহ করিয়া অধিককাল তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্য-সরস্বতী কখনও ভোগলিপ্সার মধ্য দিয়া, কখনও পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতির মধ্য দিয়া, কভু বা স্বদেশসাধনার যজ্ঞবেদীর পৌরোহিত্য করিয়া, কখনও বা গাঢ় অধ্যাত্মবোধের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নির্বাধ মুক্তগতিতে স্থির পদবিক্ষেপে পথ চলিয়াছেন—এর কোন একটিকেই কবিগুরু কখনও জীবনের আদর্শ বলিয়া আঁকড়িয়া থাকেন নাই ; এর প্রত্যেকটি তাঁর কবিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের এক একটি স্তর। পূরবীতে তাঁহার যে কবিচিত্ত ধরা দিয়েছে, তাহাও কবিজীবনের আর-একটি স্তর মাত্র।"

এই কথাই আর একটু জোর দিয়ে অন্যত্র বলা হল।—"আমার বক্তব্য ইহা নয় যে, অধ্যাত্ম জীবনে অতৃপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত অন্যদিকে গতি ফিরাইয়াছিল। আমি শুধু বলিতে চাই, জীবনের বিচিত্র রসানুভূতিকে কবি যে স্বাভাবিক গতিতে অধ্যাত্ম রসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সর্বজনানুমোদিত সর্বশেষ আশ্রয় তাঁহার চিত্তকে অধিকদিন অমৃতরস যোগাইতে পারিল না। তাই তিনি যে জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন তাহাতে এই দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বিচিত্র রসানুভূতিই বড় হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল, তৎসত্ত্বেও তাহাতে অধ্যাত্ম রসবোধ অতি নিপুণভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইল এবং সকল রসের মধ্যেই অতি দূরের ইন্দ্রিয়াতীত জগতের একটি ক্ষীণ অথচ মধুর সুর অনুরণিত হইতে লাগিল। এই কথাটি মনে রাখিলে রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'র কবিজীবনকে বুঝিবার সুবিধা হইবে।"

এই কালে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতম রচনা হল 'শেষের কবিতা'। এ গ্রন্থেরও রসনিপুণ সমালোচনা করেন নীহার রায়।[১] তাঁর দৃষ্টিতে, "কবি-কল্পনার অতুলনীয় ঐশ্বর্যে, epigram-এর দীপ্তির চরম ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায়, হ্রস্ব অথচ অর্থগৌরবপূর্ণ, ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে ও ভাষণে, বিষয়গত ঐক্যবোধে, সর্বোপরি দৃঢ় সংহত সমগ্রতায় 'শেষের কবিতা'র মতন উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে আর রচিত হয় নাই।" তাঁর মতে শেষের কবিতা চরম কাব্যোপন্যাস।—" 'শেষের কবিতা' পড়িতে পড়িতে বার বার মনে হয়, লেখক কি যাত্নকর! ...লঘুগতিছন্দে চঞ্চল চলন, অথচ তাহারই মধ্যে দৃপ্ত শক্তি ও আভিজাত্যের স্পন্দন, লঘু ছন্দ লয়ে আশ্চর্য কঠিন সুগম্ভীর ভাব-গভীর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণ! আর, এ কি সূক্ষ্মদৃষ্টির ক্ষমতা! এমন সুতীব্র দৃষ্টির আলোকে বিংশ শতকের বাঙলাদেশের নগর-জীবনের একটি বিশেষ শিক্ষিত মার্জিত সংস্কৃতিবান মুষ্টিমেয় শ্রেণীর তরুণ-তরুণীদের অশনে বসনে চলনে বলনে গতিতে মতিতে কে কবে দেখিয়াছে, আর সেই দেখার সাহিত্যিক প্রকাশ কি সুতীক্ষ্ণ শাণিত শ্লেষ-কটাক্ষে কণ্টকিত!...প্রেমের ইঙ্গিতময় অতলগর্ভ রহস্য, বিদ্যুৎশিখার দীপ্তি, সর্বব্যাপী বিস্তার, উজ্জ্বল আকস্মিক চমক, ইহার পরিপূর্ণ সার্থকতা ও সূক্ষ্ম অতৃপ্ত অভাববোধ, ইহার অবসাদ ও অন্তরায়, ইহার বিচিত্র বর্ণ সমস্তই চারিটি তরুণ-তরুণীর প্রতিদিনের জীবনের বাস্তবতার সংস্পর্শে আসিয়া এই একান্ত রূঢ় বস্তুসংসারের মধ্যেই রোমান্সের কল্পলোক সৃষ্টি করিয়াছে এবং দুটি জগতকে মিলন-সূত্রে বাঁধিয়াছে।"

লেখকের মতে শেষের কবিতাকে satire বা ব্যঙ্গ-সাহিত্য বলা যায় না। কারণ, "বইটির সমস্ত শ্লেষ-কটাক্ষের আবরণের ভিতর রহিয়াছে মানব-মনের একটি জটিল সুগভীর সমস্যা, সে-সমস্যা উদ্ভূত

---

১ বিচিত্রা, মাঘ, ১৩৩৮।

হইয়াছে অমিত-লাবণ্য-কেতকা-শোভনলালের মর্ম ভেদ করিয়া। মানব-মনের বিচিত্র ভাব-পর্যায়ের জটিল উৎস হইতে শেষের কবিতা উৎসারিত হইয়াছে এবং তাহা আশ্রয় করিয়াছে কয়েকটি বিশেষ মনের বিশেষ ধারাকে। তাহাদের মনকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের জীবনের জটিল সমস্যা নিয়াই রবীন্দ্রনাথ একটি গল্পের তন্তুজাল রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে মানব-মনের এই বিচিত্র অথচ জটিল সুগভীর প্রেম-সমস্যার লীলা; এই লীলাই তাঁহাকে শেষের কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

('রক্তকরবী' প্রকাশিত হবার পর একজন রবীন্দ্র-অনুরক্ত পাঠক এই নাটকের একটা তত্ত্ব-ব্যাখ্যা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।[১] পুস্তকের আখ্যাপত্রেই লেখকের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা হল—'কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক নাটক 'রক্তকরবী'র নন্দিনী-নাম্নী ব্যাখ্যা।' নাটকটির মর্মে লেখক সত্যি প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যায় আমাদের সায় সহজেই জাগে। দুএকটা উদ্ধৃতি লেখকের মর্মগ্রাহী ব্যাখ্যার পরিচয় হিসেবে দেওয়া গেল।—

"সুবর্ণ-লিপ্সু বিশ্ব-রাক্ষসের অত্যাচারে প্রপীড়িত বসুন্ধরার হৃদয়-বেদনার রক্তিম বিকাশ এই রক্তকরবী। এই ফোটা তাহার শেষ ফোটা নয়—যুগে-যুগে আবার এমনি করিয়া সে আত্মপ্রকাশ করিবে —যখন অর্থ-গৃধ্নু রাক্ষসের দল মানবত্বকে পদাহত করিয়া নিজ-প্রাধান্য বিস্তার করিতে দৌরাত্ম্যের শেষ সীমায় পদার্পণ করিবে।"...

"কোনও দেশ-কালকে আশ্রয় করিয়া রক্তকরবীর বেদনা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। রক্তকরবী ও স্বর্ণপিণ্ডের এই দ্বন্দ্ব প্রতি ব্যক্তিতে, প্রতি জাতিতে ও সমগ্র মানব-সমাজে, প্রতি গৃহে,

১ ভোলানাথ সেনগুপ্ত কাব্যভূষণ, রক্তকরবীর মর্মকথা, ১৩৩৩। পৃ. ৫৩।

প্রতি দেশে ও যাবৎ-পৃথিবীতে, পলে-পলে, কালে-কালে ও যুগে-যুগে হৃদয়ে-বাহিরে অল্পবিস্তর সংঘটিত হইয়া আসিতেছে।”...

(“নন্দিনী ও রঞ্জন এক কর্মের দুইটি অঙ্গ। নন্দিনী আসিয়াছিল ক্ষেত্রনির্মাণ করিতে, রঞ্জন আসিয়াছিল সেই নির্মিত ক্ষেত্রে রক্তবীজ বপন করিতে। নন্দিনী একাধারে আনন্দের সূর্যালোক, প্রীতির বর্ষণ, স্নেহ-করুণার স্নিগ্ধ ছায়া ও বেদনার হলকর্ষণ। রঞ্জন আত্ম-ত্যাগ-মহাধর্মের ক্ষেত্র-স্বামী। কিশোর শ্রেষ্ঠ মৃত্তিকা—সেই আলোক ও বর্ষণ, সেই ছায়া ও কর্ষণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ক্ষেত্রস্বামীর শস্য-বপনকে সফল করিবার নিমিত্ত আপন প্রাণ-পাত্রের সমস্ত রস উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল।”

* * *

রবীন্দ্র-চর্চা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে এই দশকেই দেখা দেন ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি। ধূর্জটীপ্রসাদ সমকালীন বাংলা গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জানালেন যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য সমালোচনা মহলে অবহেলিত। তিনি মন্তব্য করলেন, “...একদল সমালোচক আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার এত ভক্ত যে, তাঁর নাটকগুলিকে রূপক আখ্যা দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁরা বলেন যে, এত বড় ‘লিরিক’ কবির পক্ষে নাট্যকারের আত্মবিস্মৃতি অসম্ভব। যেন কবিতা লিখতেও নিজের খানিকটা জোর ক’রে বাদ দিতে হয় না, যেন নাটক লিখতে নিজের সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হয়, যেন ‘গৃহ-প্রবেশ’, ‘নটীর পূজা’, শুধুই রূপক। যেন যা-কিছু বুঝতে হলে মাথা ঘামাতে হয় তাই নাটক নয় এবং যা-কিছু দেখলে কিম্বা পড়লে বুঝতেই হয় না, তাই শ্রেষ্ঠ নাটক!”[১] কথাগুলি নাটক-

১ কল্লোল, ভাদ্র, ১৩৩৩, পৃ. ২৬১।

সমালোচনার কতকগুলি মূলসূত্রের প্রতি ইঙ্গিত। রবীন্দ্র-নাট্য তথা প্রকৃত নাটক সমালোচনা করতে গেলে যে ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করতে হবে, তারই কথা এই ব্যঙ্গের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কথাগুলি আজও আমাদের কাছে প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালে যে গ্রন্থ দ্বারা বাংলা সমালোচনা ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তার বীজ তিনি বপন করেন এই সময়—বঙ্গবাণীর পৃষ্ঠায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ' নামক রচনায়।[1] এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "আমাদের আধুনিক উপন্যাসে যে নূতন ধারাটি প্রবর্তিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই তাহার প্রথম উৎপত্তিস্থল।...রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্ব-জ্ঞান-বলে বঙ্কিম-প্রবর্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও ইতিহাসের চোরাবালি হইতে সরাইয়া বাস্তব জীবনের দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ও তাহাকে অসাধারণত্বের অনুসন্ধান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণের কার্যে লাগাইয়াছেন।

"রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের উপন্যাসে রোমান্সের অবসর কত অল্প এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের উপর জোর করিয়া অসাধারণত্ব আরোপ করিতে গেলে, অস্বাভাবিকতাই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে। বঙ্কিমের উপন্যাসের সহিত তুলনায় ইহাদের সত্যনিষ্ঠা ও অবিমিশ্র বাস্তবতা অনেক বেশী ও লেখকের মনোবৃত্তি ও আদর্শও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বঙ্কিম তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলির মধ্যেও কল্পনার রঙ্গীন আলো ফেলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই, বৈধ ও অবৈধ যে কোন উপায়েই হউক জীবনকে একটা উচ্চ আদর্শলোকের আলোকে রঞ্জিত করিতে

১ বঙ্গবাণী, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩৩।

চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের স্বাভাবিক ধীর প্রবাহটির অনুসরণ করিয়াছেন, এবং আমাদের বাস্তব জীবনে স্বাভাবিক কারণে যে সমস্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, সেইগুলিতেই আপন দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমের বিশ্লেষণ ক্ষমতা যে কম বা অগভীর তাহা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে—তবে তিনি অন্তর্দৃষ্টিবলে একটি বিশেষ অবস্থার মর্মভেদ করিয়া খুব অল্প কথায় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দীর্ঘকালব্যাপী ঘাত-প্রতিঘাতের একটা সাধারণ সংক্ষিপ্তসার সংকলন করিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের দ্বারা আভ্যন্তরীণ চিত্রটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনের গ্লানি ও বিরোধ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া চিত্রটিকে আরও অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন ও পুঞ্জীভূত অথচ সুনির্বাচিত তথ্যের দ্বারা পাঠকের মনে বাস্তবতার ভাবটি দৃঢ়তর ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাই রোমান্স ও বাস্তব উপন্যাসের মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রভেদ।"

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সংখ্যা এত অল্প কেন তার একটা আনুমানিক ব্যাখ্যাও লেখক দিলেন।—"রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভা-শালী ও প্রাচুর্যগুণোপেত লেখকও বাস্তব প্রণালী অনুসরণ করিয়া মোটে ৪।৫ খানির বেশী উপন্যাস লিখিতে পারেন নাই, আর এই উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে তাহারা বেশ সাধারণ জীবন-যাত্রার বিবরণ হইতে নির্বাচিত নহে, আমাদের বঙ্গদেশের প্রাত্যহিক সামাজিক অবস্থার মধ্যে সেরূপ কাহিনী খুব অনায়াসলভ্য নহে। এক 'চোখের বালি'কেই আমরা আমাদের সাধারণ জীবনের মধ্যে পুনরাবৃত্ত দেখিতে পারি, অন্যান্য উপন্যাসগুলি কিছু না কিছু অসাধারণ সংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে সহজেই অনুমান হয় যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন হইতে উচ্চ কলা-কৌশলের উপযোগী বিষয়-নির্বাচন করা ও তাহাকে

একখানি বৃহদাকারের উপন্যাসের মধ্যে বিস্তার করা কতটা দুরূহ ব্যাপার। বোধ হয় এই বিষয়-নির্বাচনের দুরূহতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ বড় উপন্যাসের ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া ছোট গল্প রচনার দিকে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন।"

প্রবাসীর পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রগ্রন্থ-সমালোচনার যে দায়িত্ব ছিল অজিতকুমারের, সে দায়িত্ব এখন পালিত হতে দেখা যায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক। কিন্তু অজিতকুমারের শক্তি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল না, ফলে প্রবাসীতে এখন যে সব আলোচনা প্রকাশিত হয় তাতে পূর্বের ঔজ্জ্বল্য পাওয়া যায় না। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটির সমালোচনা[১] প্রসঙ্গে সমালোচক জানালেন তাঁর উদ্দেশ্য—"এই উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকাটি না জানলে এর মধ্যে যে-সব সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে, এবং সেগুলি মীমাংসার দিকে কতখানি অগ্রসর হয়েছে তা বোঝা যাবে না। তাই আমরা সংক্ষেপে গল্পের প্লটটি বল্‌তে বল্‌তে প্রসঙ্গত সমস্যা মীমাংসা ও চরিত্রগুলির বিশেষত্ব আলোচনা ক'রে যাব। আমার এই আলোচনা সমালোচনা নয়, কবিগুরুর অসংখ্য শ্রদ্ধান্বিত পাঠকের মধ্যে একজনের মনে এই উপন্যাসখানি কেমন লেগেছে, তারই পরিচয় 'প্রবাসী'র পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে এনে উপস্থিত করছি।"

কিন্তু এই 'কেমন লেগেছে' তার পরিচয় জানাবার মেজাজ পরিহার ক'রে সমালোচক শেষকালে এ উপন্যাস সম্পর্কে আপ্তবাক্য-সদৃশ্য মন্তব্য করতে শুরু করেন। যেমন, তিনি বলেন, "এই উপন্যাসের মূল কথাটি হচ্ছে যে লোকের হার-জিৎ বাইরে থেকে দেখা যায় না, তার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে। জগতে যাঁরা 'মার্টার',

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

যাঁরা বাস্তবিক বড় লোক, তাঁরা কালে কালে অযোগ্যের হাতে মার খেয়েই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ ক'রে গেছেন। যারা সামান্য সাময়িক পশুশক্তিতে বলবান তারা ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানে বাইরে তাকেই মারে। এই জন্যে মধুসূদনের হাতে কুমুদিনীর লাঞ্ছনা, আর বিপ্রদাসের অপমান।"

যোগাযোগ উপন্যাসের এইটেই যে মূল কথা, এমন শেষ বিচারের ফতোয়া দেওয়াটা অশোভন, বিশেষ করে সেই মেজাজের পক্ষে যে মেজাজের উল্লেখ সমালোচক ভূমিকায় ক'রে রেখেছেন। সমালোচকের রস-বিচার যতক্ষণ ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে আপোষ করে, ততক্ষণ সমালোচনা থাকে অপরিণত। এই অপরিণত সমালোচনার স্বাক্ষর রয়েছে শ্যামাসুন্দরী-সম্পর্কিত আলোচনা অংশে।— "নরনারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের তত্ত্ব সমাধানের জন্য এই উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীকে অবতারণ করতে হয়েছে, এবং সে যেন কুমুদিনীর চরিত্রের পটভূমিকা হয়ে কুমুর চরিত্র ও শুচিতা আরও ফুটিয়ে তুলেছে, এবং মধুসূদনেরও চরিত্রকে স্পষ্টতর করেছে। কিন্তু শ্যামার আচরণ এমন লালসাময় এবং কুশ্রী যে তার কথা পড়তে গেলে মনে জুগুপ্সা উদিত হয়। এইটি সমস্যার অপরিহার্য অঙ্গ হলেও মনে হয় এই দৃশ্যটা না থাকলেই ভাল হত।" সমালোচক ভুলে গেলেন যে, সাহিত্যে যে বস্তু বা দৃশ্য 'অপরিহার্য' হয়ে দেখা দেয় তা-ই তো একান্ত যথার্থ ও শোভন। যা অপরিহার্য, তা অপসৃত হলে ভালো হ'ত কি ক'রে?

কাজী আবদুল ওদুদ্ রবীন্দ্র-কাব্যে কবির মানসপ্রকৃতি অনুসরণ করলেন। এই সময় প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠ'[১] পুস্তকে

১ প্রকাশকাল, ১৩৩৪। পৃ. ১২৮।

রয়েছে এই অনুসরণের পরিচয়। রচনাটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হবার আগে ঢাকা বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর এক সভায় পঠিত হয়, এবং তারপর 'প্রবাসী'র কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে গীতালির রচনাকাল পর্যন্ত কবির মনোবিকাশের ধারা অনুসৃত হয়েছে দেখতে পাই। যে কাজ অজিতকুমার করেছিলেন, তারই অনুকৃতি। সমগ্র আলোচনা কাব্য-গ্রন্থগুলির মর্মবস্তুকে নিয়ে। লেখক রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব নির্দেশ করতে প্রয়াসী হলেন দুটি কথায়, যা হল, তাঁর মতে, 'অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সন্ধানপরতা।' এবং সেই সঙ্গে জানালেন, "অনুভূতি তাঁর ভিতরে এর চাইতে কিছু কম থাকলে এই অপ্রতিহত সন্ধান-পরতার মুখে তিনি হয়ত হতেন একজন বড় দার্শনিক অথবা বড় যোগী। কিন্তু প্রকৃত কবির মত অনুভূতিই তাঁর ভিতরে সব চাইতে প্রবল। এই অনুভূতিরই সঙ্গে-সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে চলেছে সন্ধান। 'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউলের মতন সত্যের অরুণ আলো প্রথমে তাঁর ভুরুর মাঝখানে খেয়া নৌকাটির মতো এসে ঠেকে আর তিনি গান গেয়ে ওঠেন।"

আলোচনার পরিশেষে লেখক জানালেন যে দেশে প্রকৃত রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চা শুরু হবার সময় এসেছে।—"আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে যে প্রভাবান্বিত সে কথা বলবার দরকার করে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত রবীন্দ্র-প্রতিভার চাকচিক্যেই যে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে রয়েছি, তার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে তেমন প্রবল হয়নি—একথা ভাববার সময় এসেছে।"

রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রচেষ্টা ওদুদের বইখানির পর পাওয়া গেল বিশ্বপতি চৌধুরীর 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে।[1] লেখক নিজে ভূমিকায় বলেছেন, "গ্রন্থখানির মধ্যে রসবিচার ও

১ প্রকাশকাল, ১৩৩৭। পৃ. ২১৫।

তত্ত্ববিশ্লেষণ দুয়েরই প্রয়াস আছে।" এই প্রয়াস কিছু সার্থকতা-মণ্ডিত হয়েছে, বলা যেতে পারে। লেখক কিছু নূতন বিচারের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র আলোচনা তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত—রূপ-জগৎ, অরূপের পথে ও অরূপ। রূপ-জগৎ আবার নিসর্গ ও নারীতে বিভক্ত। বিভাগগুলির নাম-পরিচিতির মধ্যে জানা যায় আলোচনার বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গী। 'নিসর্গ' অংশে লেখক জানালেন যে, প্রকৃতির কবিতা তিন রকমের হতে পারে—চিত্রধর্মী, সঙ্গীতধর্মী কিংবা ভাবধর্মী। কিন্তু "প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর কবিতাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে এই তিনটি ধর্মই সেখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

"রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কবি বিহারীলালের মত প্রকৃতির পানে এমন চোখ-মেলিয়া চাহিতে কোন বাঙ্গালী কবিকেই দেখা যায় নাই। কিন্তু তথাপি তাঁর নিসর্গ-কবিতাগুলি কোনদিনই প্রথম শ্রেণীর গীতি-কবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই।...তাহার একমাত্র কারণ বিহারীলালের কবিতার ভাষা চোখে-দেখার ভাষা—অনুভূতির ভাষা নয় ;—তাঁহার ভাষায় অর্থ আছে, কিন্তু সঙ্গীত নাই।...হেমচন্দ্র... প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে...আপনার মনের ভাব মিশাইতে গিয়াও মিশাইতে পারিলেন না,- তিনি আপনার মনের ভাবগুলি তাহার সহিত বাহির হইতে জুড়িয়া দিলেন মাত্র।...নবীনচন্দ্রের মধ্যে দুই এক স্থলে চিত্র ও সঙ্গীতের একত্র সমাবেশ ঘটিতে দেখা গিয়াছে।... কিন্তু নবীনচন্দ্রের মধ্যে এই শ্রেণীর রচনা খুব কমই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথে আসিয়া নিসর্গ কবিতা নূতন রূপ পাইল। রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-বর্ণনা অপূর্ব।"

লেখকের মতে "রবীন্দ্রনাথ শান্তরসের উপাসক।"—"শুধু প্রকৃতি-বর্ণনায় নয়—সকল দিক হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা এই শান্তরসের পরিচয় পাই।"

প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখক জানালেন, "প্রেমের কবি হিসেবে আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে দুঃখের কবি বলা যাইতে পারে।" কিন্তু কবি Pessimist নন। তাঁহার দুঃখ অন্য প্রকারের।—"রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিটাকে অত্যন্ত বেশি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন, ইহার অণুপরমাণুর মধ্যে কবি অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস অহরহঃ পাইতেছেন ; তাই কবির বেদনার অন্ত নাই। এই সৌন্দর্যবোধের বেদনা কবির প্রেমের কবিতার মধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ...কবির প্রিয়া তাই মিলনরজনীর উৎসববাসরের শয্যাসঙ্গিনী নয়—বিরহরজনীর অশ্রুময়ী প্রেমপ্রতিমা।"

এই দুঃখবোধ যে কেবলমাত্র প্রেমের কবিতার মধ্যেই সীমিত তা নয়, লেখকের মতে দুঃখানুভূতিই রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর।—

" 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া কবির যে বিশেষ মানসিক বৃত্তিটিকে আমরা তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিতে দেখি, তাহা তাঁর দুঃখানুভূতি। এই দুঃখানুভূতি কবির প্রথম বয়সের রচনা হইতেই আমরা পাইয়া আসিতেছি। কবির এই অজানা অহেতুক দুঃখবোধ কেমন করিয়া তাঁহার কাব্যজীবনের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইয়া গিয়া তাঁহার সমগ্র রসজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার মূলে বারবার প্রাণ সঞ্চার করিয়া আসিয়াছে, তাহার সূক্ষ্ম ইতিহাসের ক্রমসূত্রটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে রবীন্দ্রনাথের রসজীবনের ক্রমপরিণতির একটি অভ্রান্ত ধারা আমরা অনায়াসে আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারিব।"

কাব্যবিচারে লেখক যে খাঁটি মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন তার পরিচয় স্পষ্টভাবে মেলে গ্রন্থের 'অরূপ' অংশে। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির অন্তর্গত গীতিকবিতাগুলির বিপক্ষে যে অস্পষ্টতা ও জটিলার অভিযোগ বাংলা সমালোচনায় দেখা গিয়েছে, তা খণ্ডন করতে গিয়ে লেখক জানালেন, "এগুলি যে সাধারণ কবিতার মত

স্পষ্ট নয় এবং এগুলিকে বেষ্টন করিয়া যে একটা রহস্য-কুহেলিকা ঘনাইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন কথা হইতেছে, এই যে অস্পষ্টতা, এই যে আবছায়া, ইহার মূল কোথায়?" কিন্তু এ বিচার করতে গেলে কাব্যবিচারের সূত্র ধরে টানতে হয়। লেখক তাই বললেন, "অনেকের ধারণা কবিতার প্রকৃতি নিরূপণ করে তাহার বিষয়বস্তু।...বিষয়বস্তুই যদি কবিতার প্রকৃতি-নিরূপণ ব্যাপারে সর্বময় কর্তা হইত, তাহা হইলে একই বিষয়বস্তুকে লইয়া কবিতা লিখিতে বসিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবি কোন দিন বিভিন্ন প্রকৃতির কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না।...কবিতার বিষয়বস্তুর উপর তাহার প্রকৃতি খুব বেশি নির্ভর করে না। কারণ, কবিতার প্রকৃতি তাহার গতির ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে—তাহার বাহির হইতে নয়।...কবিতার উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু বলিয়া আলাদা কোন কিছুই নাই। তাহার উদ্দেশ্য, তাহার বিষয়বস্তুকে আলাদা করিয়া দেখা যায় না, তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে কবিতাটির সমগ্র প্রকাশভঙ্গির মধ্যে, প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক শব্দে, প্রকাশভঙ্গির অণুতে পরমাণুতে। এই সোজা কথাটা ভুলিয়া যাই বলিয়াই আমরা কবিতার ভাবকে তাহার প্রকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চেষ্টা করি, আব অমনি তাহা হইয়া উঠে তত্ত্ব।"

লেখক এবার ব্যাখ্যা করলেন কেন রবীন্দ্রনাথের গানগুলি অস্পষ্ট রহস্যময়। কারণ, তাদের মূলে আছে অতীন্দ্রিয়তা।—"শিল্প জগকে অতীন্দ্রিয়তার সৃষ্টি হয় ভিন্নধর্মী দুটি ভাব বা বস্তুর সংঘাতে। ...অতীন্দ্রিয়তা আসিয়া পড়ে সেইখানে, যেখানে মানুষ মানুষই থাকিয়া যায় এবং ভগবান ভগবানই থাকিয়া যান, অথচ দুজনে দুজনের মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে এই জিনিসটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতা এত রহস্যঘন, এত স্বপ্নময়; এত অতীন্দ্রিয়।

"রবীন্দ্রনাথের সহিত বৈষ্ণব কবিদের তফাৎ এইখানেই। বৈষ্ণব কবিদের মত রবীন্দ্রনাথ পরমাত্মাকে অত নিকটে আনিতে চান নাই।...তিনি একটা ব্যবধান সর্বদা রাখিতে চান। অসীম এবং সসীমের সেই সূক্ষ্ম সীমারেখাটি তিনি কিছুতেই মুছিয়া দিতে চান না, যাহা ইহাদিগকে সমধর্মী হইয়া উঠিবার বিপদ হইতে অলক্ষিতে সর্বদা রক্ষা করিয়া আসিতেছে।...কবির ভগবান যে চিররহস্যময়; তাই কবির নিকট রহস্যময়তাই যে তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার রূপ।"

কিন্তু লেখক এই কবিতাগুলির ত্রুটি সম্বন্ধেও সজাগ। এদের মধ্যে অনেক স্থানে লেখক দেখেছেন কবির মনের ধারণা ও চিন্তার প্রকাশ। কিন্তু "কবিতা জিনিসটি অনুভূতির প্রকাশ—চিন্তার প্রকাশ নয়। তাই কবি যে সকল কবিতার মধ্যে অরূপকে অনুভব করিয়াছেন বা উপভোগ করিয়াছেন সেই কবিতাগুলিই রসসৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁর মনের ধারণা এবং চিন্তাগুলিকে শুধু ছন্দে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন মাত্র, সেখানে তাঁহার কবিতা কোন মতেই প্রথম শ্রেণীর রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই।"

এই গ্রন্থের প্রথম দিকে লেখক দেশের সমালোচকদের রসশিক্ষার ওপর কটাক্ষ করেছেন—যে রসশিক্ষা বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথের ওপর স্থান দিতে চায়।[১]—"আজকাল বিহারীলালকে লইয়া অনেক কিছু লেখা হইতেছে। কেহ কেহ নাকি এমনও বলিতে চান যে, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলির আভাস বিহারীলালের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ যে সকল সূক্ষ্ম ভাবকে লইয়া কবিতা রচনা করিতে গিয়া অত্যন্ত জটিল এবং অস্পষ্ট করিয়া

১ কবি অক্ষয়কুমার বড়ালকে নিয়েও অনেকটা অনুরূপ চেষ্টা চলে। দ্রঃ প্রিয়লাল দাস প্রণীত 'এবার কবি', এবং নারায়ণ, ১৩২৬, অগ্রহায়ণ।

ফেলিয়াছেন, বিহারীলাল সেইগুলিকে নাকি অত্যন্ত সহজ করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এ কথাটা একদিক হইতে খুবই সত্য। বিহারীলাল যাহা কিছু লিখিয়াছেন সবই চোখ কান দিয়া দেখিয়া শুনিয়া লিখিয়াছেন মাত্র, তাহার সহিত মনের বা অনুভূতির কোন যোগ রাখিতে পারেন নাই। মাত্র চোখ কান দেখিয়া শুনিয়া যাহা লেখা হয়, পাঠক তাহা চোখ কান দিয়াই অনায়াসে উপভোগ করিতে পারে এবং সাধারণ পাঠকদের চোখ কানই সম্বল। কিন্তু চোখ কানের সহিত যখন অনুভূতি আসিয়া মিলে, তখন অনুভূতি জিনিসটি যাহাদের নাই তাহারা ত বলিবেই—কবিতা জটিল হইয়া উঠিল।"

রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চা যে এইকালে কিছু শুরু হয়েছিল তার একটা বড় নিদর্শন হল এই দশকে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র-পরিষদ ও রবীন্দ্র-পরিচয় সভা।

রবীন্দ্র-পরিষদ ১৯২৭ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজের কতিপয় উৎসাহী ছাত্রের চেষ্টায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। হোতা ছিলেন সুপণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। সপ্ততিতম রবীন্দ্রজন্মতিথি উপলক্ষে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় সেই সময় প্রকাশিত হয় 'কবি-পরিচিতি' গ্রন্থ—এই পরিষদে যে সব বক্তৃতা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে পঠিত হয় তাদের কয়েকটি একত্র গ্রথিত ক'রে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানালেন, "সাহিত্যমাত্রেই···একটি অধিকারী-নির্ণয় আছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যে।···আমাদের পঠদ্দশায় দেখিয়াছি যে কবি হিসাবে হেম, নবীন বড় কি রবীন্দ্রনাথ বড় এ সম্বন্ধে আমাদের সতীর্থদের মধ্যে যদি ভোট লওয়া যাইত তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এত কম ভোট হইত যে রবীন্দ্রনাথ একজন কবিই নন্ এই কথাটাই ধ্বনিত হইয়া উঠিত। আজকাল অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে

মতভেদ অনেক কম। কিন্তু তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে বাংলা দেশে রবীন্দ্রকাব্যের রসজ্ঞতা সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে ও পৃথিবীতে তাঁহার অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য যাঁহাদের ভাল লাগে না তাঁহারাও জোর গলায় তাঁহার কাব্যের নিন্দা করিতে সাহস পান না।···সাহিত্য, চিত্রকলা বা সঙ্গীত বিদ্যার রাজ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট রসজ্ঞতার আভিজাত্য স্বীকার করিতেই হইবে। গণতন্ত্রতার মূঢ়তায় ইহাকে আচ্ছন্ন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের লিরিক কবিদের মধ্যে সর্বতোভাবে বরেণ্য ও শ্রেষ্ঠ। আমাদের হৃদয়ে অনেক অনাবিষ্কৃত গুপ্ত তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া তিনি যে রসমাধুর্য সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরের রসদৃষ্টির বিশেষ প্রস্ফুরণ না হইলে তাহা আস্বাদন করা সহজ নহে। এইজন্য দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথকে বোঝে এবং রবীন্দ্রনাথকে বোঝে না এই দুইটি দুই বিভিন্ন জাতি। আমাদের দুঃখের বিষয় এই যে যদিও বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাইশ তেইশখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—তথাপি বাংলা ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে দুই একখানি ক্ষুদ্রকায় পুস্তক ছাড়া কিছুই লেখা হয় নাই।"

এই গ্রন্থের কয়েকটি রচনা খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রথম রচনা, প্রমথ চৌধুরীর চিত্রাঙ্গদা সমালোচনা। বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্য সমগ্র রচনাটিতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। কিন্তু আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। লেখাটির মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে অশ্লীলতা অভিযোগ খণ্ডন করা। এই সময় Edward Thompson রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত করেন তাতে চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে বলা হয় যে এ নাটকের ভাবটা অশ্লীল।—"The purpose the play has been represented as the glorification of sexual abandonment....The most serious charge that can be brought against *Chitrangada* is against its attitude."

ইতিপূর্বে প্রিয়নাথ সেন চিত্রাঙ্গদার সমালোচনা করে চিত্রাঙ্গদার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অশ্লীলতা অভিযোগ খণ্ডন করাতে প্রয়াসী হন। সে সমালোচনাও পাণ্ডিত্যে ও রসবিচারে খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল। প্রমথ চৌধুরী প্রিয়নাথ সেনের মতো বিশদ ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন নি। তিনি কাব্য-সমালোচনার মূলসূত্রগুলি অবতারণা করেন এবং কোন্ সূত্র তাঁর আদর্শ তা জানিয়ে চিত্রাঙ্গদার কাব্যপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি এক এক ক'রে বিভিন্ন সমালোচনা-পন্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। যেমন—"আমরা যখন Taine পড়ি অথবা Gervinus পড়ি, তখন আসলে সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে তাঁদের ফিলজফিই পড়ি। এ জাতীয় ঐতিহাসিক-দার্শনিক সমালোচনার গলদ এই যে, কাব্যের আত্মা দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, আর কাব্যরসিক মাত্রই জানেন যে, কাব্য হচ্ছে ফিলজফির বহির্ভূত, কারণ মানবাত্মার যে মূর্তির সাক্ষাৎ কাব্যে পাওয়া যায়, তার সাক্ষাৎ দর্শনে মেলে না।···আগে একটা দার্শনিক মত খাড়া করে তারপর সেই মতানুসারে কাব্যের হীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা যে বৃথা, সে জ্ঞান আজকের লোকের হয়েছে। তাতেই ফরাসীদেশের নবযুগের সমালোচকরা নিজেদের impressionist বলে পরিচয় দেন—অর্থাৎ তাঁদের মতে কাব্য বস্তু হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এ আশাও করেন যে তাঁদের মতামতের universal validity আছে।···

"আর এক জাতীয় সমালোচনা আছে যার reason-এর সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই, যা ষোল আনা unreason-এর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনও কাব্য-বিশেষের নিন্দা কিম্বা প্রশংসা করা। প্রায়ই দেখা যায় এ নিন্দা প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ-দ্বেষ! কোনও কারণে কবি নামক মানুষটির উপর বিরক্ত হলে সমালোচক তাঁর কাব্যের নিন্দা করেন এবং অনুরক্ত হলে প্রশংসা করেন।' এ অনুরাগ বিরাগ

কাব্যজগতের কথা নয়; আমাদের এই চিরদিনের সমাজ-সংসারের কথা।...

"এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা কাব্যের বিচারক। এই সব কাব্য-জগতের ধর্মাধিকরণের দল, কোন্ কবি কাব্যের কোন্ বিধি পালন করেছেন ও কোন্ নিষেধ অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই কাব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। আমি কাব্যের এরূপ বিচারক হতে পারিনে কারণ কাব্য-জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলীর অস্তিত্ব আমি মানিনে।...যে নিয়মের সাক্ষাৎ কালিদাসের নাটকে দেখতে পাই—সে নিয়মাবলীর সাহায্যে সেক্সপিয়ারের নাটক বিচার করা যায় না। Bergson যাকে বলেন Creative evolution কাব্য-জগতে সৃষ্টির মূলপদ্ধতি যে তাই সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।"

চিত্রাঙ্গদার কাব্যপ্রকৃতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বললেন, "চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানব মনের একটি অনিন্দ্য-সুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মন-পুরীর রাজরানী, হৃদয়-নাটকের রঙ্গপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানব মনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।...

"এই বস্তুজগৎ ওরফে মানুষের কর্মভূমির যথার্থ স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের কর্ম-প্রবৃত্তি। কর্মজগৎ ও কল্পজগৎ এ দুই জগৎই সমান সত্য কেননা আমাদের মনে যেমন কর্মের প্রতি আসক্তি আছে তেমনি কর্মজগৎ থেকে মুক্তি পাবারও আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মে ও আর্টে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা যে-জাতীয় স্বপ্ন সে স্বপ্নেরও আমাদের আন্তরিক প্রয়োজন আছে।...মানুষ মাত্রই বাস করে কতকটা কর্মজগতে আর কতকটা

স্বপ্নলোকে। এই স্বপ্নকে যাঁরা সম্পূর্ণ সাকার ক'রে তুলতে পারেন, অর্থাৎ সমগ্র ও পরিচ্ছিন্ন রূপ দিতে পারেন, তাঁরাই হচ্ছেন পূর্ণ আর্টিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য মানুষের যৌবন-স্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।···যদি কোনোও কবির কল্পনায় দেহদেহীর ভেদাভেদজ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে—তাহলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে? যা কেবলমাত্র দৈহিক তার অন্তরে সত্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য নেই। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কাম-লোকের উপরে রূপ-লোক বলে আর একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কাম-লোক থেকে রূপ-লোকে তুলতে পারেন—তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপ-লোকের বস্তু, কাম-লোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই—অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।"

এ সমালোচনার ত্রুটি হল এই যে এ-লেখা চিত্রাঙ্গদা-সমালোচনার ভূমিকামাত্র ব'লে মনে হয়। চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে সমালোচক সাধারণভাবে যে বিশেষ গুণগুলির উল্লেখ করেছেন, তাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা সে গুণগুলির স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করেন নি। পাঠককে যদি শুধু অন্তরের চোখ দিয়ে চিত্রাঙ্গদার রূপ-লোক প্রত্যক্ষ করতে হয়, তাহলে তো সমালোচকের কোনো দায়িত্বই থাকে না।

'বলাকার যুগ' প্রবন্ধে গিরিজা মুখোপাধ্যায় কবির এই যুগের মানসপ্রকৃতির পরিচয় দিলেন। কবির নব-মনোবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করা হল—"এখন আর 'ব্যর্থ প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেমে'র বন্দনা-গান নয়, নিরুদ্দেশের পথে বিলাসযাত্রাও নয়, 'নববর্ষা'র ও 'কৃষ্ণকলি'র 'আবির্ভাবের' অভিষেক নয়, 'সব পেয়েছির দেশে'ও কবি একবার পলাতক বালকের মত ছুটে যেতে চাননি, এখন তাঁর বিষয়বস্তু গতিহীন, নিস্তব্ধ, নির্বাক 'ছবি'; এখন তাঁর কবি-প্রতিভা 'বিচার'

ও 'বিতর্কে'র দ্বারা আলোড়িত।...'বলাকা'র যুগ রবীন্দ্র-সাহিত্যের দার্শনিক যুগ, একালে রবীন্দ্র-কাব্যে দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।... 'বলাকা'র যুগের কবিতা ভাব-প্রধান, গীতি-প্রধান নয়, Philosophical বল্‌তে এই কথাই বুঝতে হবে।...রস ও কাব্যের বিচারে 'বলাকা'র পরবর্তীকালের অধিকাংশ কবিতাই যাকে আমরা খাঁটি কবিতা বলি তা নয়। হয়, এগুলি কবিতার চাইতেও বেশী এমন কিছু অথবা কবিতার চাইতে কম এমন কোনো সাহিত্য।...একালের কবিতার জটিলতা বেশী, বৈচিত্র্য আরও বেশী এবং বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য অনেকখানি। সহজ সত্যের এমন একটা অক্ষয় রূপ আছে যার মলিনতা কোনদিনই ঘটে না, যাকে কোনদিনই ছোট করা যায় না। সত্যের বিচিত্র প্রকাশ অবশ্য অনিবার্য, কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গী যদি জটিল হয়, যদি বিশেষ করে মস্তিষ্ক-সঞ্জাত হয়, তা হলে রসের বিচারে তাকে উচ্চস্থান দেওয়া যায় না। কেননা, যা গ্রন্থি-যুক্ত, যা বিবিধ, যা বহুবিধ তাকে মুক্ত করায় ও ঐক্যদানেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব, তাই কবি অনন্যসাধারণ।...রবীন্দ্রনাথ এই কালটিতে এই সরল দৃষ্টিটি হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর গানে সহজ সুরটি খোয়া গেছে। এই জন্যই তাঁর কাব্য-রচনায় গানের চাইতে গমক বেশী, সুরের চাইতে কথা এত অধিক।...'বলাকা'র যুগের বিশেষত্ব এইখানে যে, এর কল্পনা সহজ সত্যকে ভর করে নেই, সত্যের বিবিধ বিচিত্র তথ্যকে আশ্রয় করে এই যুগের রবীন্দ্র-সাহিত্য বৃদ্ধি পেয়েছে।"

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত হয় 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থ।[১] এই গ্রন্থ হল বিভিন্ন রবীন্দ্র-অনুরক্ত লেখকের রচনা-সংগ্রহ।

১ প্রকাশকাল, ১৩৩৮। পৃ. ৪৯৯।

সম্পাদক ভূমিকায় জানিয়েছেন, "শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীগণ কবির কাব্যালোচনার উদ্দেশে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা গঠন করেন এবং কবির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সংগ্রহ আরম্ভ করেন। সংগ্রহের কাজ কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর বিশ্বভারতীর উপর তাহা সম্পূর্ণ করা এবং প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শেষ কয়েক মাস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিশ্বভারতী যে রচনাগুলি বঙ্গবাণীর অঙ্গনে চয়ন করিয়াছেন, জয়ন্তী-উৎসবের শুভদিবসে অদ্য তাহা কবির চরণে নিবেদন করিয়া সার্থক হইলাম।"

গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে ক্রমবর্ধমান রবীন্দ্র-চর্চার একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা দিক ও তার সমীক্ষা এই সংকলন গ্রন্থেই প্রথম প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কলেবরের দিক থেকেও এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ওপর লেখা প্রথম সুবৃহৎ গ্রন্থ। পৃষ্ঠাসংখ্যা পাঁচশ, এবং রচনাসংখ্যা ষাটের ওপর। শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রশস্তিসূচক কবিতা ও রচনা বাদ দিলেও, অনেক রচনা বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং মৌলিক চিন্তাপূর্ণ। নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি থেকে এই রচনাগুলির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এবং এগুলির কয়েকটি যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকৃতির নূতন নূতন দিকের প্রতি আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছে, তা জানা যাবে।—

"…বাংলাদেশের যে কি সম্পদ রবীন্দ্রনাথ, তাহা বিদেশী কেহ বুঝিবেন না।…বাংলার পথে ঘাটে হাটে মাঠে, এমন কি সুদূর নিভৃত পল্লীর ঘরে-প্রাঙ্গণে তাঁহার গানের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। বাংলার চাষার ছেলেমেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের গান গায়।…রবীন্দ্রনাথের গান ও গীতি-কবিতা বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; বাংলার ভাবধারাকে এক নূতন রসে কোমল করিয়া সমাজের চতুর্দিকেই এক নূতন সৌন্দর্য আনিয়া দিয়াছে। বাংলার নাড়ীর স্পন্দনে তাঁহার সুরে

তাল শোনা যায়। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া বাংলাদেশের কথা কল্পনাও করিতে পারি না।

"রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাঙ্গালী কবি। রবীন্দ্রনাথের যে সত্যকার কবি-মূর্তি, তাহা সেই বাংলার বৈষ্ণব কবিরই প্রতিচ্ছবি।...

"আজিকার প্রত্যেক দেশহিতৈষী যুবক-যুবতী যদি দৈনিক সংবাদ-পত্রের আবর্জনা ফেলিয়া, রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'সমূহ', ও 'রাজাপ্রজা', এবং বিশেষতঃ 'স্বদেশী-সমাজ', 'দেশ-নায়ক', 'সমস্যা', 'পথ ও পাওয়া' প্রভৃতি নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন করেন ত' রাজনৈতিক জীবনে অনেক উপকার পাইবেন।...

"সংকীর্ণমনা কুটিল দেশপ্রেম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন আন্তর্জাতিক সৌখ্যের বাণী, মানবজাতির ঐক্য-সম্ভাবের মূলমন্ত্র, বিশ্বপ্রেমের বার্তা।...

"আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার এই বিশ্বপ্রেম-ঘোষণার ঠিক পর বৎসরেই পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের প্রচণ্ড অগ্ন্যুদগার আরম্ভ হইল। জাতির পর জাতি সেই প্রলয়-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পুড়িতে লাগিল।...ঐ বিগত মহাযুদ্ধে যে স্বার্থান্ধ আত্মম্ভরী উদ্ধত জাতীয়তাবাদ লম্ফঝম্ফ করিয়া আপনার অসম্ভবতায় আপনি আছাড় খাইয়া মরিল, তাহারি বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে বাংলাদেশে সতর্কতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।"

(প্রফুল্লচন্দ্র রায় : রবীন্দ্রনাথ)

"রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত-কাব্যের প্রভাব কোথাও তাঁকে তার অনুকরণে রত করে নি। এ প্রভাব তাঁর প্রতিভার জারক রসে জীর্ণ হ'য়ে স্বতন্ত্র নব সৃষ্টির রস জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃত-কাব্যের সুর, ধ্বনি, ভাব ছড়ান রয়েছে; কিন্তু তার আস্বাদ সংস্কৃত-কাব্যের স্বাদ নয়। নব প্রতিভার নবীন রসায়নে তা থেকে নূতন রসের সৃষ্টি হয়েছে।"

(অতুলচন্দ্র গুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত-সাহিত্য)

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও উপন্যাসকে কোনও তত্ত্বের বাহন স্বরূপ রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কি-না বলিতে পারি না। তত্ত্বের সাগর আছে তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে, তাহা হইতে তীব্র জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইতে পারে, অশেষ শিক্ষার উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। সেই শিক্ষা প্রচার করাই তাঁর মনোগত ইচ্ছা ছিল কি-না জানি না। কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও তাঁর রসজ্ঞানের সমৃদ্ধিবশতঃ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁর উপন্যাস-মালার মধ্যে অকৃপণভাবে তিনি ছড়াইয়া দিয়াছেন তত্ত্বালোচনা; কিন্তু সে তত্ত্ব কোনও গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই; উপাখ্যানের পরিপূর্ণ রস-রূপের মধ্যে সে তত্ত্বালোচনা এমন একটা নির্দিষ্ট স্থান পাইয়াছে যেখানে রসসৃষ্টির দিক্ হইতে তার থাকিবার প্রয়োজন ছিল।...বহু তত্ত্ব, বহু আলোচনা আপাত-দৃষ্টিতে বহু অবান্তর বিষয়ের প্রচুর সমাবেশ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি প্রত্যেকটিই একটি পরিপূর্ণ রসবস্তু হইতে পারিয়াছে।"

(নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত : উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ)

"কবির গানের সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, তিনি হিন্দী গানের গঠনপ্রণালী সর্বদা মেনে চলেন; অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ গানে অস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ, এই চার ভাগের ব্যতিক্রম করেন না। রাগরাগিণীও বজায় রাখেন, তবে অনেক সময় ইচ্ছামত মিশ্রিত করেন। মিশ্ররাগ আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু কালক্রমে যে কয়টি মিশ্রণ প্রচলিত রয়ে গেছে, তদতিরিক্ত কিছু করলেই শুচিবায়ুগ্রস্ত কানে খট্‌কা লাগে। সব নতুন জিনিষেরই এই ধাক্কা সামলাতে হয়।...আমার মনে হয় তাঁর প্রথম দিক্‌কার গানে মিশ্রণ কম। শেষেরগুলিতেই সেদিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন; বিশেষতঃ 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু গানে' ভৈরোঁ (টোড়ী?) ও বিভাস

মিশিয়ে, বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইয়ে, বর্ণ-সঙ্করের চূড়ান্ত খেলা দেখিয়েছেন।"

(ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ)

"রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বাঙালী কবিরা বহু শত বৎসর যাবৎ নানা প্রয়াস ও সাধনার ভিতর দিয়ে অতি মন্থর গতিতে বাংলা ছন্দের স্বরূপ সন্ধানের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন; কিন্তু সে-তত্ত্বের আবরণ কেউ উন্মোচন করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের নিবিড় অন্তর্দৃষ্টির রশ্মিতে যেদিন সে-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হল, সেদিন দেখা গেল, বাংলা ছন্দের শক্তিও ক্ষীণ নয়, এবং তাঁর সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর নয়; সেদিন থেকে বাংলা ছন্দ তাঁর শঙ্খধ্বনির অনুসরণ ক'রে ত্রিপথগা ভাগীরথীর মতো তিনটি স্বতন্ত্র ও প্রবল ধারায়[১] ব'য়ে চলেছে।"

(প্রবোধচন্দ্র সেন : বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথ)

"একটু বিচার করিয়া সহজেই অনুমিত হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার মূল সূত্র রহিয়াছে এইখানে—রূপ ও অরূপের এই সম্মিলনে। তাঁহার অধিকাংশ গদ্যরচনার মধ্যেও এই অপরূপ মিলনের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। চতুরঙ্গ তাঁহার শ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্য। ইহার মধ্যে এই দুইটি জিনিসকে পৃথক করিয়া ও মিলিত করিয়া দেখান হইয়াছে। চতুরঙ্গের সত্যিকার অঙ্গ হইতেছে দুইটি—ইহার মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধি ও অনুভূতির উপর ভর করিয়াছে আর কেহ কেহ রসের সন্ধান করিয়াছে। রূপ ও রসের এই লুকোচুরিই এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। শচীশ এই দুয়েরই সন্ধান করিয়াছে, কাজেই এই কাব্য বিশেষ ভাবে শচীশের মনের ইতিহাস।"

(সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : চতুরঙ্গ)

---

১ এই তিনটি ধারা হল, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত।

"বাংলা-সাহিত্যে নরনারীর প্রেমকে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এক নূতন দৃষ্টিতে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সংস্কার-নির্মুক্ত সত্যের মধ্য দিয়ে অগ্নিশুদ্ধ উজ্জ্বলরূপে প্রেমকে সহজ সম্বন্ধের মধ্যে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করার পথ নির্দেশ করেছেন।...

"জীবনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, সর্ব-প্রকার স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে, মুক্তির মধ্য দিয়ে যে-প্রেম স্বেচ্ছায় বহুর মধ্য হ'তে একের কণ্ঠে মালা দেয়, সে-প্রেমের মূল্য যে বাধ্যকর বিবাহের অবশ্য-পালনীয় প্রেমের চেয়ে অনেক বড়ো এবং বিশ্বের বাতায়ন রুদ্ধ করে আঁধারকক্ষ-কোণে কাউকে পাওয়াটা যে তাকে অখণ্ডভাবে পাওয়া নয়, এ-কথা বাংলা-সাহিত্যে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেছেন।"

(রাধারাণী দেবী : বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান—প্রেমের নূতন রূপ)

"...অন্তর্নিহিত চিন্তাশীলতা না থাকিলে কোন কবির অনুভূতি বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠিতে পারে না।...পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি আছেন যাঁহারা চিন্তা এবং বিচারের দ্বারা জীবনের অনেক প্রশ্নের এবং সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়া একটা নির্দিষ্ট সত্যে আসিয়া পৌঁছিয়া তাহার পর সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কবিতা লিখিতে বসেন।...তাঁহাদের চিন্তা যেখানে শেষ হয় সেইখানে অনুভূতির আরম্ভ এবং এই অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই ইঁহাদের কবিতা গড়িয়া উঠে। সুতরাং ইঁহাদের কবিতার মধ্যে অনুভূতি একাই কাজ করিতে থাকে—চিন্তার সহিত এই অনুভূতির কোন সম্পর্ক থাকে না। ফলে, ইঁহাদের কবিতায় অনুভূতি বা আন্তরিকতা যথেষ্ট থাকিতে পারে; কিন্তু বৈচিত্র্য খুব বেশি থাকিতে পারে না।

"কিন্তু এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর কবি আছেন যাঁহাদের চিন্তার

পালা কবিতা লেখার বাহিরে চুকিয়া যায় না—কবিতার ভিতর হইতেও নূতন করিয়া উদ্ভূত হইয়া উঠে। প্রথমোক্ত চিন্তাশীল কবিদের চিন্তাধারা আসে কবিতার বাহির হইতে,—তাই ইঁহাদের কবিতার মধ্যে চিন্তার গতিবেগ নাই। শেষোক্ত কবিদের চিন্তা উদ্ভূত হয় কবিতার বুকের ভিতর হইতে। তাই চিন্তার গতিবেগে এই শ্রেণীর কবিদের কবিতাকে কোনদিন একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেয় না—ক্রমাগত সুমুখের পানে আগাইয়া লইয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। তাঁহার কবিতার মধ্যে চিন্তা এবং অনুভূতি একই সঙ্গে কাজ করিতে থাকে।...আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সচলতা যতটা পাওয়া যায়—এতটা বোধহয় পৃথিবীর আর-কোনও কবির কবিতায় পাওয়া যায় না।”

(বিশ্বপতি চৌধুরী ঃ রবীন্দ্র-কাব্যে বৈচিত্র্য)

“আমার কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, কবির পূর্ণাভিব্যক্তি হইল ‘সোনার তরী’। এই সোনার তরী লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা, জটলা, উদ্ভাবনা হইয়া গিয়াছে। কত দার্শনিক, সমালোচক, কবি কত-না অর্থই করিয়াছেন। আমাদের কাছে তাহাই অবোধ্য ঠেকিয়াছে। ঐ কবিতাটি রূপক মনে করিলে মনে হয় যেন উহার রূপটাকে কৌটায় ভরা হইয়া গেল। ঝঙ্কারময় ভাষায়, সরল অভিব্যক্তিতে, প্রকৃতির একখানি যথাযথ প্রতিকৃতি, তাহার মধ্যে গান গাহিয়া একজন চেনা-চেনা লোকের আগমন, তাহাকে শস্যসম্ভার দান ও তাহার চলিয়া যাওয়া, তাহার ভিতর মানুষের যাওয়া-আসা, আদান-প্রদানের স্বচ্ছ সরল ভাবের বিকাশ—ইহাই লইয়া হইল ‘সোনার তরী’।...সমস্ত চিত্রটাই এমন একটা স্থায়ী ভাবের ছাপ দিয়া যায়, এমন একটা শান্ত করুণ রসের সঞ্চার করে যে, তাহা প্রত্যেক পাঠকের মনে চিরদিন জাগিয়া থাকে। আর এক

দিক দিয়া 'সোনার তরী'-র একটি সুকুমার কলাসৌন্দর্য মানিতে হয় ; ছবিখানার ভিতর এমন একটা সর্বোপযোগী সত্যের আভাস পাওয়া যায় যে, এই কবিতার ভিতরের নানা অবস্থার, নানা ঘটনার, নানা বৈচিত্র্যের বর্ণনায় সে-সত্যকে মানাইয়া লওয়া যায়। ভাবে বিভাবে, ভাষায় ছন্দে, প্রাকৃতিকতায় ও অভিব্যক্তিতে, অন্তরের অকৃত্রিমতায় ও বাহিরের রূপে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র একমাত্র তুলনা উহাই।...

"আমি 'সোনার তরী'র যে-ধারণা করিয়াছি ইহার কোনও 'কেন'ও জানি না, 'কি করিয়া'ও বুঝি না। তবে কবিবরের জীবনী ও লেখা আলোচনা করিয়া দেখি যে, আমার ধারণার অনেক জিনিস পাওয়া যায়।...

"রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' তাঁহার সমস্ত জীবনব্যাপী সুখদুঃখ-জড়ানো মনোরাজ্যের রাজপাটের নিত্যসহচর। কবিবর একদিন লিখিয়াছিলেন, 'সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ', তাই মনে হয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাণ স্পর্শ করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতা পাই যেন তাঁহার তরী-জীবনে। তাঁহার সমস্ত রচনার ভিতর এই তরীর পরশ যেন ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছে।"

(নরেন্দ্রনাথ শেঠ : সোনার তরী)

"রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়ে একটি আকুলতার সুর ধ্বনিত হ'তে শোনা যায়। সে-সুর হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের, বিশেষের মধ্যে অবিশেষের, রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির জন্য অধীরতার সুর।...বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে এই সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে বাধাকে অস্বীকার ক'রে বা বাধাকে কাটিয়ে অগ্রসর হয়ে চলবার একটা আগ্রহ ও ব্যগ্র তাগাদা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। যা লব্ধ, তাতে সন্তুষ্ট থেকে তৃপ্তি নেই ;

অনায়ত্তকে আয়ত্ত করতে হবে, অজ্ঞাতকে জান্‌তে হবে, অদৃষ্টকে দেখে নিতে হবে—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বাণী, এই হচ্ছে তাঁর প্রধান বক্তব্য।

"যেখানে গতি আছে, সেখানে ব্যাপ্তিও আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার আর-একটি বিশেষত্ব হচ্ছে সর্বানুভূতি—জল-স্থল-আকাশে, লোক-লোকান্তরে, সর্বদেশকালে ও সর্ব-মানব-সমাজে আপনাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে মেলে দিতে তিনি নিরন্তর উৎসুক।"

(চারু বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান সুর)

"রবীন্দ্রনাথে বাংলাসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় যদি বলিতে হয় তবে বলিব, ইহাই রবীন্দ্রনাথের দান এবং এই সূত্রটির মধ্যে কবির সৃষ্টির স্বরূপও সম্যক আমরা ধরিতে পারিব। বলা বাহুল্য, আধুনিকতার অবতারণিকা রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই সুরু হইয়াছে; কিন্তু তাহার যে বিপুল প্রবাহ, যে-বন্যা বাঙ্গালার মনপ্রাণকে চারিদিক হইতে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথ হইতে।...

"ইউরোপই হইল আধুনিক যুগের ধর্মক্ষেত্র, পীঠস্থান। বর্তমান যুগে মানব-জাতির যে মুখ্য লীলাধারা, তাহা ইউরোপের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সুতরাং ইউরোপের সংস্পর্শে আসা অর্থই আধুনিক হইয়া উঠা।...

"পাশ্চাত্যের যাহা নিজস্ব বিশিষ্ট জিনিস, রবীন্দ্রনাথের অনু-প্রেরণার আগুনে গলিয়া গিয়া, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই—বাঙ্গালীরই নিজস্ব সত্তার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, হইয়া উঠিয়াছে তাহার চির-কালের সম্পদ। দেশ হিসাবে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি এই রকমে তির্যকভাবে প্রসারিত হইয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে বিশ্বকে। কাল হিসাবেও তাহা আবার অন্যদিকে বর্তমান হইতে উঠিয়া গিয়াছে

অতীতে। বৈষ্ণব-সাধকের অনুভব, উপনিষদের অনুভবের রাজ্যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন—এই দিককার অনুভবকে লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন আবার সেই তির্যক-প্রসারিত বিশ্ব-অনুভূতির মধ্যে। এই দুই-এর মিলকে সংযোগ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার কাব্য-জগতের আধুনিকত্ব যাহার প্রধান কথা হইল, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্ত্যের, অতীতের ও বর্তমানের একটা সামঞ্জস্য ও মিলন।···

"আমরা আধুনিক কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আধুনিক অর্থে অতি-আধুনিকও বুঝিব কি-না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটা চির-তারুণ্যের গতি, যৌবনরসে উচ্ছল ছন্দ বহমান, তাহার ধর্মই নিত্যনূতনের দিকে চলা, অভিনবের সাথে পরিচয় স্থাপন করা—সবুজকে সাদরে বরণ করা। সুতরাং আধুনিকতমেরও সহিত তাঁহার একটা সহানুভূতি, একটা সৌহার্দ কোথাও থাকাই স্বাভাবিক। তবুও একটি কথা স্মরণে রাখিতে হইবে—রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন সকলের উপরে রূপের—সুরূপের, আকারগত সৌষ্ঠবের পূজারী। রূপের কাঠামকে ভাঙ্গিয়া বদ্‌লাইয়া যতই তরল, যতই নমনীয় করুন না, তবুও পরিশেষে কাঠাম—একটা সুষীম কাঠামই—তিনি দিয়াছেন। অতি-আধুনিকেরা কাঠাম বলিয়া কোনো জিনিস আদৌ রাখিয়াছেন কি-না সন্দেহ—গঠনকে জলীয় নয়, প্রায় বাষ্পীয় করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা।···

"সকল নৈকট্য ও অবাধ পরিচয় সত্ত্বেও হাবে-ভাবে চলনে-বলনে তাঁহার কবিত্বে সর্বত্রই আছে একটা আভিজাত্য, একটা গরিমা ; ইহাও সম্পূর্ণভাবে অতি-আধুনিক হইবার পক্ষে তাঁহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

(নলিনীকান্ত গুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা)

আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আলোচনা। এই আলোচনা

করেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য' প্রবন্ধে। বিক্ষিপ্তভাবে এক একটি নাটক সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ইতি-পূর্বে দেখা গেছে, কিন্তু সমগ্রদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাট্য-কৃতির বিচার এই প্রথম।

এই বিচারে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন যে, "রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সাঙ্কেতিক নাট্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং এই নূতন নাটকের আদর্শেই তাঁহার নাটক-গুলির বিচার করিতে হইবে।" নাটকগুলির মধ্যে লেখক দেখলেন সাঙ্কেতিকতার ক্রম-বিবর্তন। এবং এই দিক দিয়েই নাটকগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা হল। নাটকগুলিকে এক-এক করে বিশ্লেষণ করে তাদের সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়েছে। লেখকের মতে, "...প্রায় সমস্ত নাটকগুলির বিষয়গত সামান্য পার্থক্য থাকিলেও মূলগত সুরটি এক। প্রায় সমস্ত নাটকেই একই প্রকারের ঘটনা ও চরিত্রের পুনরুক্তি হইয়াছে। বিশেষতঃ ঠাকুরদাদার চরিত্রটি সমস্ত নাটকগুলিরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ—সর্বত্রই তিনি ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখা দেন ও প্রায় একরকম খেলাই খেলেন। একজন স্বচ্ছ-দৃষ্টি, সবল-হৃদয়, আনন্দময় পুরুষ যিনি হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার আনন্দ-উৎসের মুখে পাথর না চাপাইয়া তাহার স্রোতোবেগ আরও বর্ধিত করিয়া দিয়াছে, যিনি বালকদের সমপ্রাণ বন্ধু, নায়ক ও ক্রীড়া-সহচর—এই আদর্শেই কবি ঠাকুরদাদার চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ...বাহিরের জগতে নানা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকিলেও কবির মনে একই প্রকার খেলা পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে—বাহিরের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এই অন্তর-লীলার ছায়াপাত হইয়াছে, কবির চক্ষু তাহাই মাত্র লক্ষ্য করিয়াছে। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'—তাঁহার গানের এই প্রসিদ্ধ চরণখানি অশ্রান্ত

সুরে তাঁহার নাটকের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোভাবেই তাঁহার নাটকে বাহ্য বৈচিত্র্যের অভাবের কারণ। সাধারণ নাটকের যে লক্ষণ তাহার অনেকগুলিই তাঁহার নাটকে মিলে না—কিন্তু ইহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অসীমের সুর তাঁহার নাটকে যেরূপ মধুর ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্নভাবে বাজিয়াছে, অন্য কোথাও তাহার তুলনা মেলে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকের আর-একটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। নাটকীয় চরিত্র নির্বাচন সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ধাপটি তাঁহার নাটকে অব্যাহতভাবে বজায় রাখা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের রাজসভার প্রতিবেশ তাঁহার সমস্ত নাটকেই দেখিতে পাই। সেই চির-পরিচিত রাজা, অমাত্য, বিদূষক, সেনাপতি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। সেই প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতি ও শাসন-ব্যবস্থা—রাজার সর্বময় কর্তৃত্বমূলক সমাজ-শৃঙ্খলা—সর্বত্র লক্ষিত হয়। এমন কি, অতি-আধুনিক সমস্যা ও বিশ্লেষণে সেই প্রাচীন প্রথার অবতারণা হইয়াছে।”

(শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য)

“রবীন্দ্র-সৃষ্টি পূরবী-পশ্চিমা, সূত্র-কর্মকৌশল স্বদেশ-বিদেশ ইত্যাদি সব কিছুই বটে, অথচ আবার এই সবের কোনো একটার গর্তে পড়িয়া রবীন্দ্র-শিল্প কানার মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না। জ্যান্ত চোখে দুনিয়া ভাঙিবার ও গড়িবার শক্তি রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বধর্ম।···

“রবীন্দ্রনাথকে কোনো ফর্মুলায়, কোনো বাঁধিগতে আটকাইয়া রাখা চলিবে না। কোনো শাসন-প্রণালীর মারপ্যাঁচে এই স্বচ্ছন্দ গতিশক্তিকে পাকড়াও করা সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন বা যৌবন—জীবনের ধারা, জীবনের স্রোত—সৃষ্টিশক্তির প্রতিমূর্তি। প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছেন—প্রতিদিনই জগৎকে রূপে-রঙে

বাড়াইয়া চলিয়াছেন—প্রতিদিনই অনন্ত যৌবনের সৃষ্টিক্ষমতা চাখিয়া ধরাতলকে তাহার স্বাদ পরিবেষণ করিতেছেন। দশকের পর দশক ধরিয়া দেশ-বিদেশের যুবারা আর যৌবনশীল প্রবীণেরা এই মহাযুবার তালে তালে রকমারি উদ্দীপনা লাভ করিতেছে।

"এইরূপ বিশালপ্রাণ, অসীমযৌবনসম্পন্ন, বিশ্বগ্রাসী মহাযুবা দুনিয়ার শিল্প-সংসারে বড় বেশী নাই। রবীন্দ্রনাথের জুড়িদার এক ছিল বৈচিত্র্যশীল জটিলতাপূর্ণ জর্মান-সন্তান গ্যেটে। এই আসরে আর-একজনের নামও মনে পড়িতেছে। সে ফরাসী-সাহিত্য-বীর ভিক্তর হুগো।"

(বিনয়কুমার সরকার: যৌবনমূর্তি রবীন্দ্রনাথ)

'জয়ন্ত-উৎসর্গ' গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল মোহিতলাল মজুমদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাসাহিত্য'। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিচারের আলোকে সমগ্র রচনাটি সমুজ্জ্বল। এ সমালোচনা একদিকে যেমন গুণগ্রাহী অন্যদিকে তেমনি সমীক্ষা-প্রয়াসী। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস এবং একালে সেই মানস-ধর্মের সাহিত্যিক প্রয়োজন কতখানি এই চিন্তাই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বাংলাসাহিত্যের প্রবাহধারার উৎস।—"বর্তমান বাংলা সাহিত্যের মর্মমূল হইতে তাহার শাখাপ্রশাখায় পত্রপল্লবে যে গূঢ়সঞ্চারী প্রাণরস প্রবাহিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই যে তাহার প্রধান, অথবা প্রায় একমাত্র উৎস, এ-কথা অত্যুক্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ যেন ইহার ভিত্তি হইতে শিখর পর্যন্ত সমুদয় বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল এ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নাই, ইহাকে নূতন করিয়া সংস্থাপিত করিয়াছেন। আর কোন সাহিত্যে কোন একজনের সৃষ্টি-শক্তি এতখানি প্রভাবশালী হইতে দেখা যায় নাই।

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভারতীয় ভাবপন্থা য়ুরোপীয় কাব্যপন্থায় মিলিত হইয়াছে—এই মিলনের গূঢ় তাৎপর্য না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের

অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় মিলিবে না।...কাব্যে শুধু ভাব নয়, অরূপ-রসের অর্ধব্যক্ত উল্লাসও নয়—এই জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে রসরূপে পূর্ণ প্রকাশিত করাই কাব্যের একমাত্র সার্থকতা।...যে-প্রেরণা এতকাল কাব্যকে দূরে রাখিয়া ভাব-সাধনার অন্যতম মার্গে ধাবিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই ভাব হইতে রূপে নূতন পন্থায় প্রবর্তিত করিলেন। ঋষির মন্ত্রদৃষ্টিকে, সাধনার ইষ্ট-স্বপ্নকে, অপরোক্ষদর্শী রসজ্ঞানীর প্রত্যয়ানন্দকে তিনি অন্তর হইতে বাহিরে—এই বিচিত্ররূপা প্রকৃতির হাবভাবের মধ্যেই উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছেন; তাঁহার কল্পনায় সেই মোহিনী অসতীই সতীমূর্তির কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ দেশের সাধারণ পাঠকের কাছে কেন দুর্জ্ঞেয় হয়ে আছেন তার কারণ জানাতে সমালোচক বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ অন্তর-গহনের দীপশিখাকেই বস্তু-পরিচয়ের মানস-রঙ্গভূমিতে প্রতি-ফলিত করিয়া কাব্যরসধারাকে এক নূতন উৎস হইতে প্রবাহিত করিলেন। তাঁহার কল্পনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এক অভিনব ভোগবাদের সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে; বৈরাগ্যসাধনের মুক্তি অপেক্ষা অন্যতর মুক্তির পন্থা এই বহির্জীবনের নাটমন্দিরে কবি-করধৃত বাণীদীপের আরত্তি-আলোক সুপ্রকাশিত হইয়াছে। বহু-কালাগত সংস্কারকে এমন করিয়া উল্টাইয়া ধরা কবির পক্ষেও কম দুঃসাহস নয়; তাহার ফলে আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের নিকট উহা এক মনোহর হেঁয়ালী হইয়া আছে। যাহারা পুরাতন কাব্য-রসে অভ্যস্ত তাহারা এ-রস আস্বাদনে সঙ্কুচিত; যাহাদের রসবোধ অপেক্ষাকৃত উদার, তাহারা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কাব্য-মন্ত্রদ্বারা এ-রস শোধন করিয়া তবে আস্বাদন করিয়া থাকে; যাহারা কোন রসেরই রসিক নয়, এ-কাব্যের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রাকৃত সংস্কার বিদ্রোহী হইয়া উঠে।"

লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন মনুষ্যজীবনের নবতন মহিমা-বোধ, যার ফলে বাংলাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এমন ভিন্নমুখী হয়েছে।—"রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার উচ্চতর ভাবসিদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যে মনুষ্য-জীবনের যে নবতন মহিমা-বোধ আমাদিগকে আশ্বস্ত করে, মানুষের অতি ক্ষুদ্র সাধারণ সুখ-দুঃখের উপরে, অতি পরিচিত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উপরেও তাঁহার সর্বাশ্রয়ী রস-কুতূহলী কল্পনা যে দিব্য আলোক প্রতিফলিত করিয়াছে, সর্ববস্তুতে আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী বিরাট সত্তার যে রসরূপ আবিষ্কার করিয়াছে তাহাতেই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এমন ভিন্নমুখী হইয়াছে।"

'গল্পগুচ্ছ' সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক অভিমত জানালেন, "রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তির মূলে আছে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গতিমূলক এক অপূর্ব গীতিপ্রবণতা; ইহাতেই তাঁহার মনের মুক্তি; সেই মুক্তির আনন্দে তাঁহার কল্পনা সকল সংস্কার, সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হইয়া এমন এক রসভূমিতে অধিষ্ঠান করে, যেখানে জীবনের সকল অসামঞ্জস্য, বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটা ভাবৈক-পরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয়।...গল্পগুচ্ছের কথা-অংশে বস্তুগত রোমাঞ্চ-বিস্ময়ের আয়োজন নাই, তথাপি তাহা যে বিস্ময়-রসে হৃদয় আপ্লুত করে তাহার কারণ, তুচ্ছতম বস্তুর উপাদানে লেখক মহত্তমের প্রকাশ দেখাইয়াছেন; আকাশের গ্রহতারকা হইতে ধূলিতলের তৃণপুঞ্জ পর্যন্ত যে একটি মহিমা অব্যাহত রহিয়াছে, প্রাণ তাহারি ভাবসঙ্গীতে পূর্ণ হইয়া ওঠে; তখন আর বাস্তবে ও কল্পনায় কোনও বিরোধ-বুদ্ধির অবকাশ থাকে না; কে বলিবে, গল্পগুচ্ছের কতটুকু বাস্তব, আর কতটুকু কল্পনা? গল্পগুচ্ছে এই ভাব যে-রূপ পাইয়াছে, তাহা সহজেই হৃদয়-মনের গোচর হয়, এবং যে একবার এই ভাবমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ

করিতে পারিয়াছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের মর্মসঙ্গীত তাহার কানে ও প্রাণে কোথাও আর বাধা পায় না।…সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে রবীন্দ্র-প্রতিভার সহিত সহজ পরিচয়ের উহাই উৎকৃষ্ট সোপান। এবং ইহাও আমার বিশ্বাস যে, গল্পগুচ্ছের মধ্যে কবিদৃষ্টির যে অতি-স্বতন্ত্র ও নিগূঢ় ভঙ্গী এবং রস-সৃষ্টির যে-কৌশল আছে, তাহা এখনও আমাদের দেশের সকল রসিকচিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, পারিলে অন্ততঃ একদিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত মর্যাদা বুঝিবার পক্ষে এত প্রতিবন্ধক ঘটিত না।”

রবীন্দ্র-সাহিত্যকৃতির ফলশ্রুতি কতখানি দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে লেখক বললেন, “…আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে-পরিমাণে মুগ্ধ হইয়াছি ততখানি সঞ্জীবিত হই নাই, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ কি? রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাণীকে ভাষায় ও ছন্দে যে নব কলেবর ধারণ করাইয়াছেন তাহাতেই একালের বাংলাসাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। কিন্তু ওই বাণীরূপের অন্তরালে যে ভাবের আত্মা আছে, তাহা বাঙ্গালীর রসবোধে সম্যক ধরা দেয় নাই—একটা স্বতন্ত্র ভাব-মুক্তির পরিবর্তে অন্ধভাবের ঘোর সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার সঙ্গীত কানে সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেই কাব্যকলার মূল প্রেরণা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কল্পনাকে স্বতন্ত্র মুক্তির সন্ধান দেয় নাই।”

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্ম-উদ্ঘাটন ও তার সম্যক বিচার দেশে যে এখনো হয় নি, এবং কোথায় সে অন্তরায় সে-প্রসঙ্গে লেখক বললেন, “রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার গতি প্রকৃতি যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার কবিজীবনের আদি, মধ্য, অন্তকে, সাহিত্যের আদর্শ ও তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার আদর্শ, এই উভয় আদর্শে সম্পূর্ণ-ভাবে বুঝিয়া লইবার সামর্থ্য যদি আমাদের থাকিত তবে আমাদের

সাহিত্যবোধ আরও সজাগ ও সজীব হইয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহাকে কোন দিক দিয়াই আমরা বুঝি নাই। আধুনিক কালে সাহিত্যের যে-আদর্শ, রস-সৃষ্টির যে-রহস্য, কাব্য-বিচারে যে নূতন সমস্যার সমাধান দাবী করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের কবি-কীর্তির মধ্যে সেই সমস্যা পুরামাত্রায় বিদ্যমান ; তাহার বিচারেও সেই রহস্যের সন্ধান, সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এই সাহিত্য-ধর্মকে এখনও স্বীকার করি না, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকেও যথার্থভাবে বরণ করিয়া লইতে পারি নাই।"

এই প্রথম অতি স্পষ্ট ভাষণে শোনা গেল যে প্রকৃত রবীন্দ্র-সমালোচনা করতে গেলে সমালোচনার নূতন মানদণ্ড প্রয়োজন। কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্য নূতন সৃষ্টি, তার রস-প্রমাণ করতে গেলে চাই যথাযোগ্য নূতন রসশিক্ষা। কিন্তু সেই নূতন মানদণ্ড ও রসশিক্ষার পরিচয় পেতে গেলে চাই এই মানদণ্ড ও রস-শিক্ষার দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার-ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। এ কাজ মোহিতলাল নিজেও এ সময় ক'রে দেখান নি। সুতরাং মনে হতে পারে সেই নূতন মানদণ্ড ও রসশিক্ষা কি ? মোহিতলাল এর উত্তর দেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর অনুযোগের হলকর্ষণ দ্বারা ভবিষ্যতে যাতে নূতনভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা হয় তার ক্ষেত্র প্রশস্ত ও শস্যসম্ভব ক'রে তুললেন।

১৩

[১৩৪০—১৩৫০ ; ১৯৩৪—১৯৪৪]

রচনা ঃ

শ্রাবণ-গাথা	১৩৪১	১৯৩৪
চার অধ্যায়	,,	,,
শেষ সপ্তক	১৩৪২	১৯৩৫
বীথিকা	,,	,,
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	,,	১৯৩৬
পত্রপুট	১৩৪৩	,,
ছন্দ	,,	,,
শ্যামলী	,,	,,
সাহিত্যের পথে	,,	,,
খাপছাড়া	,,	,,
কালান্তর	১৩৪৪	১৯৩৭
সে	,,	,,
ছড়ার ছবি	,,	,,
প্রান্তিক	,,	১৯৩৮
চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য	,,	,,
সেঁজুতি	১৩৪৫	,,
বাংলাভাষা পরিচয়	,,	,,
প্রহাসিনী	১৩৪৫	১৯৩৯
আকাশ-প্রদীপ	১৩৪৬	,,
শ্যামা নৃত্যনাট্য	,,	,,
নবজাতক	১৩৪৭	১৯৪০
সানাই	,,	,,
তিনসঙ্গী	,,	,,
রোগশয্যায়	,,	,,

আরোগ্য	১৩৪৭	১৯৪১
শেষলেখা	"	"

এই দশকে রবীন্দ্র-চর্চার বিশেষত্বের প্রথম ফল হল এ-দশকের শুরুতেই প্রকাশিত শান্তিনিকেতন-কর্মী ও কবির সাহচর্য-ধন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক'। ১৩৪০ সালে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। কবির সপ্ততিতম জন্মতিথি বা জয়ন্তী-উৎসব হয়ে গেল, তবু কবির কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী দেখা যায় নি। এই অপূর্ণতা দূর করতে অগ্রসর হলেন প্রভাতকুমার। বহুকাল পূর্বে কবি স্বয়ং নিজের যে আত্মপরিচয় লেখেন তাতে ফল হয় এই যে দেশের একশ্রেণীর লোকের কাছে তিনি আত্মঘোষণার অভিযোগে অভিযুক্ত হন,—সে লেখায় 'দম্ভ ও অহমিকা'র সন্ধান পাওয়া যায়—এবং যে জীবন-স্মৃতি লেখেন তা-ও 'পল্লবগ্রাহী' রচনা বলে আখ্যাত হয়! নিজের জীবনী নিজে লিখলে এইরকম বিপদ হবার আশংকা থাকেই, তাছাড়া কবি তাঁর জীবনীকে তথ্যাশ্রয়ী করেন নি, করেছেন তত্ত্বাশ্রয়ী ও আত্মবিশ্লেষক। সুতরাং কবির জীবনের ঘটনা ও সাহিত্য-সৃষ্টির একটি তথ্যনিষ্ঠ ধারাবাহিক কাহিনী রচনা করার অবকাশ দেখা দেয়। বাঙালীর সৌভাগ্য, প্রভাতকুমার এই অবকাশের সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক জানান, "সংসারের কোনো দায়িত্বকেই রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নাই। বিষয়-কর্মের কোনো দাবীকেই এড়াইতে চান নাই। কঠিন কর্তব্যবোধের তাগিদে বারম্বার তিনি দেশের দশের জন্য নানা দুরূহ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জমিদারি ও বিদ্যালয় পরিচালনা, সাহিত্য সেবা, মাসিকপত্র সম্পাদনা ও সংসার এবং আশ্রমের বিবিধ কর্মসাধনা—কোনো কিছুকেই তিনি বাদ দেন নাই।...যাঁহারা বাস্তব বিলাসের নেশায় জীবনের সমগ্র রূপ দেখিতে চান না, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জীবনের, তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির

এই বিপুল সাধনার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত এবং কাব্যগত জীবনের এই বৃহৎ সম্মিলিত রূপ সংহত করিয়া দেখানোই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।"—(ভূমিকা)। এবং লেখক ঠিকই বলেছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের জীবনী বাংলায় এভাবে লিখিবার চেষ্টা পূর্বে হয় নাই।"—(ভূমিকা)।

এ গ্রন্থের বিবৃতি-রীতি ডায়েরি বা রোজনামচার মতো। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের ইতিহাস জানাতে গ্রন্থের কাহিনীকে আরম্ভ করা হয়েছে ১৫০০ খৃঃ অব্দ থেকে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে শুরু করে প্রতি বছরের ঘটনা—কবির জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম—পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনায় সবটাই তথ্য-সমাবেশ নয়, আলোচনাও আছে। গ্রন্থের শিরোনামায় 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক' কথাটির সার্থকতা ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে তথ্য-সমাহরণ এবং রচনার সাহিত্য-ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। বহু স্থানেই বাহিরের ঘটনা কবির জীবনে ও সাহিত্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার ইতিবৃত্ত দেওয়া হয়েছে। দুএকটা উদ্ধৃতি দিলেই রচনার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।—"মানসী যুগের কবিতা ও নাট্যগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো একটি সাধারণ ভাবসূত্রের যোগ না পাইলেও একটা বিষয়ে সুরের মিল পাই। সেই হইতেছে কবির মনের মধ্যে সংশয় বিষাদের ছায়াময় সঞ্চরণ। সমস্ত লেখার মধ্যেই একটা বেদনার সুর মাখা—নাট্যগুলির মধ্যেও একটি গভীর করুণ সুর ধরা পড়ে।

"রবীন্দ্রনাথের জীবন এখানে কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে যেন আশ্রয় পায় নাই, তাই কেবলই পরিবর্তন চোখে পড়ে। বহুকাল ধরিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।··· রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে যে বিষাদসুরের কথা বলিয়াছি, তাহা তাঁহার সংশয়িত চঞ্চল জীবনের পরিচায়ক। শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, মন তেমনি নূতন স্থান, নূতন রূপ, নূতনের জন্য

ব্যস্ত—কেবলি চলিবার জন্য উন্মুখ। শান্তিনিকেতন হইতে আসিবার প্রায় তিনমাস পরে 'উচ্ছল' কবিতায় লিখিতেছেন—

কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরাণ মম…
আমি আমারে চিনিনে তোমারে জানিনে
আমার আলয় কই!…

"নিজের অন্তরের মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের, কল্পনার সঙ্গে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত বাধিয়াছে—সেই দুঃসহ অভিমান ভরে বলিতেছেন ঃ—

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ
অনিয়ম শুধু আমি!
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধরে' দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী,
শুধু আমি নিজবেগ সামলিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী। (৫ই ভাদ্র, ১২৯৭)

এই চঞ্চল মন যেন কোথাও থাকিয়া সুখী হইতেছিল না; সে নিজের বেগ নিজেই সামলাইতে না পারিয়া কেবলই স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিতেছিল। এই তিন বৎসরের মধ্যে কলিকাতা, বন্দোরা, সাহজদপুর, শিলাইদহ, পুণা, খিরকি, দার্জিলিঙ, শান্তিনিকেতন ভ্রমণ করিয়াছেন। এবার চলিলেন বিলাত। হঠাৎ যাওয়া ঠিক হইল: তাঁহার বাল্যবন্ধু লোকেন্দ্র পালিত বেড়াইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে জুটিলেন।"[১]

"চৈত্র (১৩০২) মাসের মাঝামাঝি হইতে রবীন্দ্রনাথ পতিসরের

১ পৃ. ২১৪-২১৭।

সম্মুখে নৌকায় আছেন।···দারুণ গ্রীষ্ম, নৌকার খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরকে দেখিতেছেন; সম্মুখ দিয়া ছায়ার মত ঘটনা-স্রোত বহিয়া চলিয়াছে; তাহাই কাব্যের তুলিতে আঁকিয়া চলিয়াছেন—কোথাও একটু বাহুল্য নাই, শুধু ছবি। কোথায় ইটকাটা মজুরের ছেলেমেয়ে, কোথায় পতঙ্গ, কোথায় ছাগশিশু—যাহা চোখে আসিতেছে তাহাই লেখনীতে রূপ পাইতেছে।···'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র নিবিড় কল্পনারাজি প্রকাশের পর প্রত্যক্ষ জীবনের ছবি আঁকিতে কবি আনন্দ পাইতেছেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে উচ্ছ্বাস নাই, রঙের ব্যবহার সামান্য—যেন পেন্সিল দিয়া আঁকা স্কেচ।···এই কবিতাগুলির নাম দেন 'চৈতালি', কারণ ইহার অনেকগুলি কবিতা চৈত্র মাসে লিখিত, চৈত্র মাসের ফসলকেও চৈতালি বলে।···

"চৈতালির সুর পূর্ণতার সুর। পূর্ণতার উদ্বোধনে যে-বেদনা, যে গভীরতর শান্তি, যে সমাহিত চেতনার ব্যাপকতর স্নিগ্ধ দীপ্তি—তাহাই এই কাব্যের ঐক্যসূত্র। এই পূর্ণতা মানুষকে, প্রকৃতিকে, অতীতকে, বর্তমানকে অখণ্ড-ভাবে দেখিতেছে—কোথাও ছেদ নাই, বিচ্ছিন্নতা নাই। সমস্ত বৎসরের অন্তে 'ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে' ডালা ভরিয়া কবি 'চৈতালি'র অর্ঘ নিবেদন করিয়াছেন।"[১]

এই গ্রন্থ পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্ধিত হয়ে বিপুলকায় ধারণ করেছে। চারখণ্ডে সমাপ্ত এই সুবৃহৎ জীবনী বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জীবনীগ্রন্থরূপে পরিগণিত। রবীন্দ্র-জীবনের এই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ভবিষ্যৎ রবীন্দ্র-চর্চার অপরিহার্য আকর-গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত যে-কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্যে এ গ্রন্থের স্মরণ না নিয়ে উপায় নেই। এই মহৎ কর্মের জন্যে প্রভাতকুমার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১ পৃ. ৩০৩-৪।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ দেশের সুধীজনের কাছে পরম সমাদর লাভ করেছে। গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে এমন সময় যখন রবীন্দ্র-চর্চা ক্রমবর্ধমান, এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা দ্বারা আমাদের জাতি ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধিত হবে এই বোধ প্রবলভাবে জাগরিত। সুতরাং এমন গ্রন্থ খুবই সময়োপযোগী হয়ে দেখা দিল, এবং সকলেই একান্ত আগ্রহভরে এই গ্রন্থকে স্বাগত জানালেন।

তবে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, এ গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা ও ক্রটি সম্বন্ধে দেশের সুধীজনকে সচেতন হতে দেখা গেছে। চিন্তাশীল বিনয়কুমার সরকার এ গ্রন্থে যে অসম্পূর্ণতা দেখেছেন তা হল এই—"প্রত্যেক লেখক, শিল্পী, দার্শনিক, ধর্মপ্রচারক, বক্তা, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি কৃতী লোক-সম্বন্ধে আমি চাই তার লাইব্রেরির বৃত্তান্ত, বিশেষতঃ রবির মত পড়ুয়া সাহিত্যস্রষ্টা সম্বন্ধে। কোন্-কোন্ দেশী-বিদেশী বই তাঁর ঘরে-লাইব্রেরিতে-বৈঠকখানায় দেখা যেতো? কোন্-কোন্ বইয়ে তাঁর নিজের হাতের দাগ দেখতে পাওয়া যায়? এইসব পড়াশুনার ভেতর হয়ত রবীন্দ্র-সাহিত্যের মস্ত-মস্ত উৎস বা প্রেরণা রয়েছে। তা যে জানে না, সে রবির মুড়োটা আর হৃদয়টা পুরোপুরি দখল করতে পারবে না। পড়াশুনার বহর ও দৌড় থেকে আবিষ্কার করতে হবে দেশী-বিদেশী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার গড়ন।"[১]

কথাটি ভেবে দেখবার মতো। রবীন্দ্র-জীবনীতে এই অভাব লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনা সম্পর্কে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে এক বৃহৎ গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে বলে মনে করি।

বিনয় সরকার আর একটি ক্রটির কথাও উল্লেখ করেছেন।—"রবীন্দ্রনাথের পরিবার ছিল সে-কালের কল্‌কাতায় দেশী-বিদেশী-সমাগমের বৃহত্তম আড্ডা। পাশ্চাত্য লোকজন বিশেষতঃ ইংরেজ

১ বিনয় সরকারের 'বৈঠকে', ১ম খণ্ড, ১৯৪৪। পৃ. ৬১৩।

নরনারী ঠাকুর-পরিবারে ঢুঁ মেরে গেছে কত-গণ্ডা বা কত-ডজন ফি বছর? তা জানা আবশ্যক। রবীন্দ্র-শিল্পের কথাবস্তু আর প্রেরণা বুঝবার জন্য এসব চাই। উনবিংশ-শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে ১৯০৫ পর্যন্ত যুগটায় কল্‌কাতার ভেতর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বারোআরিতলা বেশী ছিল না। এইদিকে ঠাকুর-গুষ্টির বিশেষত্ব খুব বেশী।"[১]

'রবীন্দ্র-জীবনী'তে রবীন্দ্রনাথের আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়নি—একথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি বলেছেন, "...তথ্যের...আধিক্য সত্ত্বেও, কিংবা সেইজন্যই, রবীন্দ্রনাথ কোনো-একটি পৃষ্ঠাতেও জীবন্ত হয়ে ওঠেননি; কোথাও নিঃশ্বাস পড়েনি তাঁর, একবারও শুনতে পেলাম না তাঁর হৃদস্পন্দন। ভিক্টরীয় ইংলণ্ডের 'সরকারি' জীবনীর অনুসরণে প্রভাতকুমার অধিগম্য সকল তথ্যই একত্র করেছেন, তার উপর নায়ককে অবতীর্ণ করেছেন প্রথম থেকেই মহত্ত্বের ইস্পাত-জামা পরিয়ে। অবশ্য এ-বিষয়ে তিনি সচেতন যে জীবনী-কারের অতিভক্তি জীবনীর অভিব্যক্তির প্রতিকূল; তিনি প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন অভিভূত না-হ'তে। সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথের মতের বিরুদ্ধে তর্ক তুলেছেন, রচনার দুর্বল অংশগুলিকে দুর্বল বলেই ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি—তবু-যে বিগ্রহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন নি তার কারণ এই যে গ্রন্থটি ক্রমবিকশিত নয়, নির্মিত, অর্থাৎ, লেখক প্রকৃতির অনুকরণে তাঁর পাত্রকে উন্মোচিত করেন নি, প্রথম থেকেই ধ'রে নিয়েছেন, এবং পাঠককে বুঝতে দিয়েছেন, যে তিনি মহাপুরুষ, তার উপর একটি মহৎ বংশের রত্নোত্তম।

"ঐ শেষোক্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ আপত্তি ছিলো। 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রথম বেরোবার পর—প্রভাতকুমার তাঁর দ্বিতীয়

১ বিনয় সরকারের 'বৈঠকে', ১ম খণ্ড, ১৯৪৪। পৃ ৬১৩।

সংস্করণের 'সূচনা'য় জানিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বইখানা রবীন্দ্রনাথের জীবনী হয়নি, হয়েছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী। এই আর্ষ বাক্য মেনে না-নিয়ে উপায় থাকে না, যখন অতিবিস্তৃত বংশপরিচয়ের পরেও প্রভাতকুমার ঘন-ঘন দ্বারকা-দ্বারস্থ হন, এমনকি রবীন্দ্রনাথের বিবাহপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে 'সামাজিক আর্থিক আধ্যাত্মিক কোন দিক 'হইতেই' অভিজাত ঠাকুর-পরিবারের সহিত ইঁহাদের [অর্থাৎ কবিপত্নীর পিত্রালয়ের] তুলনা হইতে পারে না।' সত্যি বলতে, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে এখনো অনেকটা আচ্ছন্ন করে আছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি; তিনি যেন ঠাকুর-বাড়িরই কৃতিত্ব, কিংবা ঠাকুরবাড়ির বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথ এইরকম মোহপ্রসূত বাক্য মাঝে-মাঝেই শোনা যায়।…একেই ইংরেজিতে বলে স্নবিশ।"[১]

প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-জীবনী'র পরেও যে রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখার অবকাশ আছে, সে-কথা জানিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "জীবনী রচনাও একরকমের শিল্পরচনা; জীবনীকারকে নির্মম হতে হয়, নির্লোভ হতে হয়, ভূরিপরিমাণে উপকরণ সংগ্রহ করে ফেলে দিতে হয় অনেকটাই, বাছাই করে-করে সাজাতে হয় একাধারে সত্য আর সৌষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে; মনে রাখতে হয় ভালো করে বলাই সবচেয়ে বেশি বলা, আর সার কথা মানেই সব কথা। অবশ্য নায়কের জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর অনতিপরে, এ-আদর্শে জীবনীরচনার সম্ভাবনা বেশি থাকে না; কেননা একজন অমৃতপুত্রকে আমরা তখনই আবার সহজভাবে তাঁর মর্ত রূপে ভাবতে পারি, যখন সময়ের ব্যবধানে অনেক অবান্তর সঞ্চয় ঝরে পড়ে, আবার সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হবারও বাধা থাকে না। রবীন্দ্রনাথকে তাই

১ সাহিত্য-চর্চা, ১৩৬১, পৃ. ১৫৬।

অপেক্ষা করতে হবে, হয়তো দীর্ঘকাল—অন্তত যতদিন-না 'রবীন্দ্র-জীবনী' পরিবর্ধিত হবার পরেও নূতনতর তথ্য নিয়ে অনুরূপ গ্রন্থ আরও বেরোয়।"[১]

১৩৪১ সালে প্রকাশিত হয় সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ'। গোটা রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা এই গ্রন্থেই প্রথম দেখা দিল। বিভিন্ন বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস ও সাহিত্য-তত্ত্ব সম্পর্কে সমালোচনা আছে। লেখকের উদ্দেশ্য হল "নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও বিচার; স্তুতি বা নিন্দা নহে।" সুতরাং উদ্দেশ্য যে প্রকৃত সমালোচকের সেটা জানা গেল। কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে লেখক কতকগুলি বিষয়কে ভাগ করেছেন, যথা—প্রেমের কবিতা, স্বদেশ : নবীন ও প্রাচীন ভারত, প্রকৃতি-গাথা, জীবন-দেবতা, শিশু, পলাতকা : লিপিকা : পুনশ্চ। নাটক আলোচনাকালেও, রূপক নাটকগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাবমূলক ব্যাখ্যাই এই গ্রন্থের উপজীব্য। এ আলোচনায় লেখক কবির জীবনী-কাহিনীকে কোথাও টেনে আনেন নি। অর্থাৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যকে রবীন্দ্র-জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করেন নি। সেদিক থেকে এ আলোচনা উল্লেখযোগ্যভাবে বস্তুনিষ্ঠ—সাহিত্য-আলোচনা করতে গিয়ে লেখক সাহিত্য-রচনাকেই সামনে রেখেছেন। তবে রচনার শিল্পপ্রাণের দিকে লেখকের দৃষ্টি নেই, রচনার ভাববস্তু নিয়েই তাঁর সমস্ত কারবার।

এই গ্রন্থের অবতরণিকায় লেখক সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মানসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক দেশের রবীন্দ্র-সমালোচনার দুটি ক্রটিপূর্ণ প্রত্যয়ের কথা উল্লেখ

---

১ সাহিত্য-চর্চা, ১৩৬১, পৃ. ১৬২-৩।

করেন, এবং সে ত্রুটি সংশোধন করতে প্রয়াস পান।—"আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুইটি আলোচনা করা হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে তাঁহার কাব্যে অসীম, অনন্ত, অজানার ছড়াছড়ি খুব বেশী এবং ইহার জন্য কাব্যে অস্পষ্টতা আসিয়াছে। মানুষ তাহার প্রাত্যহিক জীবনের খণ্ডতা লইয়া ব্যস্ত থাকে; ইহা তাহার পক্ষে সত্য। কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে একমাত্র সত্য নহে। সে ইহার অতিরিক্ত, ইহার অতীত আরও কিছুতে বিশ্বাস করে। এই কারণেই তাহার জীবন সুসহ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই সত্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু তিনি অপর সত্যকেও বাদ দেন নাই। বরং উভয়ের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় তাঁহার কাব্যের প্রধান গৌরব। আবার অনেক সমালোচক বলিয়াছেন যে মহাকবি হইতে হইলে মহাকাব্য রচনা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বড় একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নাই।···প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই সমালোচনা বুঝি কেবল 'মহাকবি মহাকাব্য' এই দুইটি শব্দের সাদৃশ্যকে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে ইহাকে তত অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে মানবজীবনের উত্থান পতনের ইতিহাস একদিনের কাহিনী নহে; তাহার উপক্রমণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া উপসংহার পর্যন্ত বহু ঘাত প্রতিঘাত আসে ও যায়; তাহাদিগকে বাদ দিলে মনুষ্যজীবনের যে চিত্র আমরা পাই, তাহা অতিশয় অপূর্ণ।···রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইহার অবকাশ নাই, কারণ তিনি শুধু দুই একটি চরম মুহূর্তের সন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই চিরপরিচিত পদ্ধতি হইতে যে ব্যতিক্রম করিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তিনি জীবনের সুন্দরতম মুহূর্তগুলিকে গাঁথিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যেখানে সাধারণ জীবনের কথা বলিয়াছেন তাহাকেও অসাধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কাব্যের কারবারই হইতেছে অসাধারণের সঙ্গে ; অ্যাকিলিস সামান্য যোদ্ধা নহেন, রাম সাধারণ মানুষ নহেন ! কাব্যের শিকড় রহিয়াছে প্রাত্যহিক জীবনের জমিতে, কিন্তু তাহার ফুল ও ফল অপার্থিব। যাঁহারা সুদীর্ঘ কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহারাও বুঝিয়াছেন যে সব ঘটনার বর্ণনা, সকল বিষয়ের আলোচনাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। তাই মহাকাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য আসে ফাঁকে ফাঁকে, আর মাঝখানে থাকে গদ্যের নীরস বর্ণনা ; ছন্দের অলঙ্কার দিয়া তাহাকে শুধু বিড়ম্বিত করা হয় মাত্র। মহাভারত, রামায়ণ, Iliad, Odyssey, Divina Commedia, Paradise Lost, মেঘনাদবধ কাব্য—ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য আছে, কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে এইসব কবিতায় কাব্য-বিবর্জিত অংশ কবিত্বপূর্ণ অংশ হইতে হ্রস্বতর নহে। পূর্বকালে মহাকাব্য লিখার রীতি ছিল ; কিন্তু বর্তমানকালে গদ্যও শ্রেষ্ঠ রচনার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাই Les Miserables, Forsyte Saga, Buddenbrooks প্রভৃতি সুদীর্ঘ মহাকাব্য গদ্যেই রচিত হইয়াছে।···

"রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার মধ্যে মহাকাব্যের সার আছে, তিনি ইহাকে আশ্রয় করিয়া সুদীর্ঘ মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে তাহার গুণ বাড়িত না। বরং যে প্রতিভা ক্ষুদ্রের মধ্যেও মহত্তের সন্ধান পাইয়াছে, সীমার মধ্যে অসীমকে চিনিয়াছে তাহা গদ্যের মরুভূমিতে আপনার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিত।"[১]

লেখকের বিচারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একাধিক স্থানে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দেখা দিয়েছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে পারেন নি ব'লে তাঁর রচিত জাতীয় কাব্য অসম্পূর্ণ।

১ পৃ. ৩২-৩৫।

ইতালীর কবি কার্দুচির জাতীয় কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনা ক'রে একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে:—

"রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও তাঁহাকে ভারতবর্ষের জাতীয় কবি বলা যায় না। তিনি পরিপূর্ণতার কামনা করিয়াছেন তাই তাঁহার জাতীয় কাব্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।...সমগ্র ভারতকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ দুইটি কবিতা রচনা করিয়াছেন: 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা' আর 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে।' এই দুইটি কবিতাও কবির প্রতিভার অপূর্ণতারই পরিচয় দেয়। 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ' ও 'শকহূনদল পাঠান মোগল'—ইহাদের মধ্যে কবি যে সংযোগ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক, ঐতিহাসিক নহে। যে চিরসারথিকে কবি ভারতভাগ্যবিধাতা বলিয়া আবাহন করিয়াছেন, তিনি বিশ্বদেবতা, দেশ দেশ তিনি নন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে ভারতবর্ষের কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ভারতবর্ষকে মহামানবের তীর কল্পনা করিয়া কবি যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অবশ্য ভারতবর্ষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন:

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহূনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

কবি ভরসা করিয়াছেন যে বহুর মধ্যে একের অনুভূতিই ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান কথা হইবে। কিন্তু এই যে ঐক্যের কথা, এই যে বিরাট হিয়ার কথা কবি বলিতেছেন, ইহার রূপ কি রকম, ইহাকে কবি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোথায়, কি আকারে

দেখিয়াছেন? ইহা যদি স্বপ্ন না হইয়া থাকে, ইহা যদি সত্যই ভারতবর্ষের মর্মকথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কবি তাহাকে জীবন্ত করিতে পারিতেন যদি তাহাকে তত্ত্ব হিসাবে না জানাইয়া রূপবিশিষ্ট চিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেন।

"এই সম্পর্কে রসজ্ঞ পাঠক ইতালীর বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি কার্দুচির (Carducci) Ode to the Fountain of Clitumnus কবিতার কথা স্মরণ করিবেন। এই কবিতাটি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই অপরূপ কবিতাটিতে কোন সর্বজনপ্রযোজ্য তত্ত্বকথা নাই, কবি নানাদিক হইতে ইতালীর যুগযুগান্তপ্রবাহিত প্রাণধারাকে রূপ দিয়াছেন। কিংবদন্তী, কাব্যকথা, ইতিহাস, নিসর্গরূপ ও বর্তমান যুগের যন্ত্র-সভ্যতা—এই কবিতাটির মধ্যে সবাইর কথাই আছে। ভার্জিল, হানিবল হইতে আরম্ভ করিয়া মেষপালক পর্যন্ত সকলের কথাই কবি গাহিয়াছেন এবং সকলের মধ্যেই ইতালীয় জীবনধারার বিশিষ্ট ছাপ মুদ্রিত হইয়াছে। কবি যে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার কথা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে ইতালীর পন্থা, Janus ও Camesene-র আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা ইতালীর যাত্রী, যে দেবকে আহ্বান করিয়াছেন তিনি ইতালীর জলদেবতা Clitumnus, দেশ দেশ নন্দন চিরসারথি নহেন। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রণ ও এই স্পষ্ট আকারবান্ অনুভূতির কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা বাষ্পের মত প্রাণহীন।"[১]

'রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বর্ণনা কালিদাসের বর্ণনার অপেক্ষা অসুন্দর ও নীরস ঠেকেছে লেখকের কাছে।—

১ পৃ. ৮১-৮৪।

"রবীন্দ্রনাথের বসন্তবর্ণনা খুব উচ্চ শ্রেণীর হইলেও তাহা কালিদাসের বর্ণনা অপেক্ষা নীরস। কালিদাসের কাব্যে বসন্তের যে সরসতা, যে নবীনতা, যে সুষমাস্তীর্ণতার চিত্র পাই, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা নাই।

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ
সর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতেহি,
রক্তাংশুকা নববধূচির ভাতি ভূমিঃ। (ঋতুসংহার)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই সমৃদ্ধি নাই। মনে হয় তিনি বসন্তের চিরনবীনতা ও অমরত্বের কথা এত বেশী করিয়া লিখিয়াছেন যে উহার নবীনতা ও চঞ্চল ঐশ্বর্য একটু বাদ পড়িয়া গিয়াছে।"[১]

লেখকের মতে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের কবিদের মতো নবপুরাণ-সৃষ্টি (myth-making) করেছেন বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রেও সেই তুলনা। রবীন্দ্রনাথের শরৎ-লক্ষ্মী ও বর্ষশেষ কবিতা দুটি কীট্‌স ও শেলীর অনুরূপ কবিতার তুলনায় হীনপ্রভ ঠেকেছে।—

"বর্তমান যুগের কোন কোন কবি প্রাচীন কাব্যের অনুকরণে প্রকৃতিকে দেবতা অথবা কিন্নরের বিহারভূমি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই নবপুরাণসৃষ্টি (myth-making) বর্তমানকালের নিসর্গ কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য অভিযান। ইংরেজী সাহিত্যে এই বিষয়ে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন শেলী ও কীট্‌স এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই প্রচেষ্টা আছে।

"...এই প্রকারের কবিতায় উৎকর্ষলাভ করিতে হইলে, দুইটি গুণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রথম কথা প্রকৃতিকে মনে করিতে হইবে

১ পৃ. ১০৯

সজীব এবং এই সজীবতাবোধ হওয়া চাই খুব সহজ ও সরল। ইহাকে তর্কের দ্বারা কণ্টকিত করিলে চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ কবির প্রতিভা আত্মলীন (subjective) হইলে চলিবে না ; কবির দৃষ্টি হইবে নৈর্ব্যক্তিক, বস্তুলীন (objective)।...যে শ্রেণীর কাব্যের কথা আলোচনা হইতেছে, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতা হইতেছে কীট্‌সের To Autumn। কীট্‌স অতি সরলভাবে শরতের লীলার চিত্র দিয়াছেন, এই চিত্রে তাঁহার নিজের সুখদুঃখের কথা নাই এবং শরতের রূপ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দ্বারা তাঁহার কল্পনা কক্ষচ্যুত হয় নাই। শরতের সাধারণ লীলার মধ্য দিয়া কবি অনায়াসে শরৎ-লক্ষ্মীর প্রতিমা গড়িয়া তুলিয়াছেন।

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নবপুরাণসৃষ্টির যে পরিচয় আছে তাহার মধ্যে এই সহজ, স্বচ্ছ দৃষ্টি নাই এবং কবি প্রায় কোথাও নির্লিপ্ত-ভাবে প্রকৃতির রূপ আঁকিতে পারেন না। কবি প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন নিবিড়ভাবে অনুভব করিয়াছেন ও তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু যখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির অন্তর্লীন প্রাণকে মূর্তরূপ দিতে চাহিয়াছেন তখনই তাঁহার কল্পনার দীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার শরৎ-লক্ষ্মীর কথাই ধরা যাক্‌। ইহা একটি সুন্দর কবিতা, কিন্তু কীট্‌সের কবিতার অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। কীট্‌সের ভাষায় যে সংযম আছে তাহা এইখানে নাই। আর রবীন্দ্রনাথের শরতের চিত্রে শরৎ গৌণ হইয়া গিয়াছে, অন্নদানরতা বঙ্গমাতাই মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই কেন্দ্রচ্যুতি নিসর্গ কবিতার ত্রুটি।"[১]

"এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত শেলীর তুলনা করা হইত। এই তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের প্রতি

---

১ পৃ. ১১০-১১২।

অবিচার করা হয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সকল নিসর্গ কবিতায় কবি শুধু প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াই থামিয়া যান নাই, সেই প্রাণকে বিশিষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করাইতে চাহিয়াছেন, সেই সকল কবিতা শেলীর অনুরূপ কাব্য হইতে নীরস। কালবৈশাখী সম্বন্ধে উভয়েরই কবিতা আছে। Ode to the West Wind ও 'বর্ষশেষ'—ইহাদের তুলনামূলক সমালোচনা করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে যে এই দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে নাই। শেলী প্রবেশ করিয়াছেন কালবৈশাখীর অভ্যন্তরে এবং তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া নববেশে সজ্জিত করিয়াছেন। এই বহিরাবরণের অন্তরালে রহিয়াছে কালবৈশাখীর অমানুষী শক্তি যাহার বলে বিবর্ণ বিশীর্ণ শুষ্কপত্র আলোড়িত হয়, বর্ষণভারাক্রান্ত বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ সঞ্চালিত হয় এবং ভূমধ্যসাগরের সুগভীর স্বপ্ন চূর্ণ হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ও প্রাণের উন্মাদনা—ইহাদের অপূর্ব সম্মিলনে শেলী নবপুরাণ সৃষ্টি করিয়াছেন। শেষের দিকে তিনি তাঁহার নিজের জীবনের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এই নবপুরাণসৃষ্টি ব্যাহত হয় নাই। শেলী কালবৈশাখীর মধ্যে আপনাকে লীন করিয়া দিতে চাহিয়াছেন; তিনি প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ প্রকৃতির নৈর্ব্যক্তিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শেলীর কাব্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আছে মাত্র। তাঁহার কাব্যে ভাষার সংযমের একান্ত অভাব। 'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে তিনি বর্ণনা দিয়াছেন কাল-বৈশাখীর সন্ধ্যায় ধূসরপাংশুল মাঠ ও নদীপথে ত্রস্ত তরীর। এই বর্ণনায় প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ প্রাণের স্পন্দন নাই; ইহা একেবারে বহির্জগতের সাধারণ বর্ণনা: শুধু শব্দ ও অলঙ্কারের আতিশয্যেই চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছে।

ঝঞ্জার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবশৈাখীর
নৃত্য হোক তবে।

এই রকম দুই একটি ছত্র ছাড়া এই বর্ণনার কোথাও বৈশিষ্ট্য নাই। শেষের দিকে কবি নূতনকে আহ্বান করিয়াছেন; কাব্য হিসাবে এই অংশ আরও নিকৃষ্ট। কবি জানেন না যে নূতন কি বিশিষ্ট বাণী আনিবে এবং তাহার সঙ্গে ঝড়ের কি সম্বন্ধ তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তাঁহার এই অস্পষ্ট ধারণাকে কবি অনুপ্রাস ও অন্যান্য অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছেন যদিও ছন্দের ঝঙ্কারে ভাবের দৈন্য ঢাকা পড়ে নাই।"[১]

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসও লেখকের কাছে উচ্চাঙ্গের ঠেকে নি।—

"রবীন্দ্রনাথ শুধু যে গীতিকাব্যলক্ষণাক্রান্ত নাটক লিখিয়াছেন তাহা নহে, অনেক প্রহসনও রচনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ গীতি-কাব্য-রচয়িতাদের রচনায় হাস্যরসের অবতারণা করা হয় না। গীতি-কবি মাত্রেই অ-রসিক এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু গীতিকাব্যের রস ও হাস্যরস অনেকটা পরস্পরবিরোধী।...কবি থাকেন স্বপ্নের রাজ্যে যেখানে সাধারণ জীবনের নিয়ম খাটে না, রসিক থাকেন সর্বদা সজাগ—কোথায় সাধারণ আইনের লঙ্ঘন করিয়া অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইল। কাজেই গীতিকবিতার সঙ্গে রসিকতার বিরোধিতা আছে।

"রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী। মুখ্যতঃ গীতিকবি হইলেও তিনি প্রহসনও রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্পে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে।...তাঁহার প্রতিভার সঙ্গে গীতি-কবিতার বিশেষ মিল আছে বলিয়াই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক তাঁহার রচনায় হাস্যরস প্রায় কোন স্থানেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই।[২]

১ পৃ. ১১৪-১১৫।
২ পৃ. ২৩১-২৩২।

"রবীন্দ্র-সাহিত্যের হাস্যরসের একটা মৌলিক দোষের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানুষের ভাষা যে কত সমৃদ্ধ হইতে পারে, তাহার সম্ভাবনীয়তা যে কত বিচিত্র তাহা রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া দেখাইয়াছেন এমন বর্তমান যুগে আর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ভাষার গৌরব তাহার কাব্য, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ গৌরব কিন্তু ইহা তাহার রসরচনার একটা প্রধান দোষ। তিনি শুধু কথার মারপ্যাঁচ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। ইহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তাহা অপকৃষ্ট হাস্যরস। বিলাতী অলঙ্কার-শাস্ত্রে এই প্রকার হাস্যরসকে Wit বলা হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় Humour অপেক্ষা Wit-এর আধিক্য বেশী। অনেক জায়গায় শব্দের ঝিক্‌মিকিই মুখ্য হইয়া গিয়াছে, অর্থের গৌরব অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে।...শব্দবিন্যাসে হাস্যরসের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি লঘু। শেক্সপীয়র, মলিয়ের প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের রচনায় বাক্যবিন্যাস আছে যথেষ্ট, কিন্তু বাক্যের অন্তরালে অর্থের মাধুর্যই তাঁহাদের রসরচনার প্রধান মাহাত্ম্য। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনে অনেক জায়গায় বাক্যই মুখ্য; তাহার দ্বারা চরিত্রসৃষ্টি বা আর্টের অন্যান্য অবশ্যকর্তব্য কাজের সহায়তা হয় নাই।"[১]

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় চেয়েছেন তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার ও মূল্যায়ন করতে। কিন্তু লেখকের এই প্রয়াসে পণ্ডিতিয়ানা যতটা আছে ততটা রসবোধ ও বিচারনৈপুণ্য নেই। তুলনামূলক সমালোচনার অর্থ এ নয় যে একজনের সৃষ্টি অন্যজনের সৃষ্টির সঙ্গে ভাসা ভাসা ভাবে তুলনা ক'রে ভালো-মন্দের রায় দেওয়া। দুজনের সৃষ্টি যদি তুলনা করতেই হয়, তাহলে দেখতে হবে দুজনেরই

১ পৃ. ২৪০।

বিষয়বস্তু, দৃষ্টিকোণ, উদ্দেশ্য এবং শিল্প-প্রত্যয় ও কৃতি একই পর্যায়ের কি না; যদি তা না হয় তাহলে ভালো-মন্দ রায় দেবার অবকাশ থাকে না, তখন সমালোচনার একমাত্র কাজ হল দুজনের সৃষ্টির মধ্যে পরিচয়-সংযোগ স্থাপন করা, সম্বন্ধের সেতু নির্মাণ করা। সুবোধ সেনগুপ্তের আলোচনা ত্রুটিপূর্ণ এই কারণে যে তিনি তুলনা করার অতি উৎসাহে এই বিচার করতে ভুলে গেছেন যে যার সঙ্গে যার তুলনা তিনি করেছেন তারা প্রকৃতপক্ষে কতোখানি অনুরূপ শিল্পবস্তু।)

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'রবি-দীপিতা'[১] এই দশকের তৃতীয় রবীন্দ্র-সমালোচনা গ্রন্থ। লেখক তাঁর আলোচনার স্বরূপ সম্বন্ধে জানিয়েছেন, "রবি-প্রভব কাব্যকে আমার অল্পবিষয় মতির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিব এই দুরাশা লইয়া এই সমালোচনাগুলি লিখিত হয় নাই। তাঁহার কাব্য পড়িয়া মনে যে স্পন্দন আসিয়াছে, আমারই চিত্তবিনোদনের জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রকাশের দীপিকা নহে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা চিত্তের যে উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছি তাহারই ক্ষণস্থায়ী স্ফুলিঙ্গ মাত্র।"[২]

লেখক 'আলোচন' নামক মুখবন্ধে কাব্য-সমালোচনার তত্ত্ব—তার উদ্দেশ্য ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আলোচন বলিতে বুঝা যায় দেখা—দেখা শব্দটির অর্থের যে কোথায় আরম্ভ, কোথায় শেষ, তাহার সীমারেখা নির্ণয় করা সুকঠিন। কবি যে দৃষ্টিতে তাঁহার কাব্য বা কবিতাকে কাব্য-রচনার সময় দেখেন, সে দৃষ্টির মধ্যে কাব্যের বস্তুভাগ শব্দ ও

১ প্রকাশকাল, ১৩৪১। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪৮

২ পৃ. ৷৹।

ছন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া রসবেগের মধ্যে স্পন্দিত হইতে থাকে। সেই স্পন্দিত সত্তা একটি পূর্ণ সত্তা। সেই সত্তার মধ্যে বস্তু বা অর্থ, শব্দ ও ছন্দ, ইহাদের কাহাকেও পৃথক করিয়া পাওয়া যায় না।···

"যে আলোচক কবির কাব্য কবির সমগ্র পুরুষীয় অনুভবের সহিত একান্বয়ে দেখিতে চেষ্টা করে তাহার প্রধান বিপদ এই যে কবির সমগ্র পুরুষের সহিত তাহার অপরোক্ষ যোগ নাই। কবির নিজের পক্ষেও তাঁহার কাব্যসমালোচন করার বিপদ কম নহে, কারণ নিজের সমগ্র পুরুষীয় অনুভবটি কবির কাছেও কাব্য রচনার সময় কিংবা কাব্য সমালোচনার সময় অপরোক্ষ নহে।···সমস্ত সমালোচকের পক্ষেও কোন কবির কাব্যকে তাঁহার সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত একান্বয়ে আলোচন করিবার সুযোগ সম্ভব নয়।

"কিন্তু কবির কাব্যকে যে কেবলমাত্র সেই কবিরই সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত একান্বয়ে আলোচন করিতে হইবে এমন কোনও দাবী ন্যায়সঙ্গত নহে।···কবি যে পুষ্পকে তাঁহার মাল্য হইতে খসাইয়া দিলেন, তাহা তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত হইলেও তাহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব নহে, তাহা বিশ্বমানবের। প্রত্যেক মানুষের সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত একান্বয়ে তাঁহার এক একটি নূতন পরিচয় আছে, সেইজন্যই কাব্যবিচারে এত মতভেদ।···

"কবির কাব্যরচনাই যে রচনা তাহা নয়, আলোচনও একটি মহতী রচনা। উভয়ের মধ্যে এইটিই প্রধান পার্থক্য, যে কবির রচনা দৃশ্য বিষয় ও তাঁহার স্বকীয় অনুভবকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, সমালোচকের রচনা উৎপন্ন হয় কবির কাব্যকে লইয়া। উভয়েরই উদ্ভূতি সমগ্র-পুরুষীয় অনুভব হইতে। সমালোচক যখন কবির কাব্য পড়েন, তখন কবির সমগ্র কাব্যের মধ্যে তাঁহার যে সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবটি স্তরে স্তরে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, সমালোচক

সেই সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবটির সহিত নিজের সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের সহিত পরিচয় করিবার চেষ্টা করেন।···

"তিনিই আদর্শ সমালোচক, যিনি কবির দানের মহত্ত্বকে মহত্ত্বররূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এরূপ আদর্শ সমালোচককে পাওয়া কঠিন, কিন্তু তথাপি আদর্শকে খর্ব করা যায় না। কিন্তু সমালোচনের এখানে একটি সীমারেখা আছে, যে তাহা কবির সমগ্র কাব্যের অনুগত হইবে ও তাহার তাৎপর্যকে প্রকাশ করিবে। এই আনুগত্যকে অবহেলা করিয়া কেবল ব্যোমমার্গে বিচরণ করিবার অধিকার সমালোচকের নাই।···কবির মধ্য দিয়া কবির সহিত একাত্ম-যোগে সমালোচক তাহার আত্মপরিচয় দিয়া থাকে।···

সুধীসমাজে অনেকদিন হইতে এই একটি দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, যে কাব্য বুঝিবার জন্য সমালোচনের আবশ্যক আছে কি না। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই দ্বন্দ্ব অনেক পরিমাণে নির্মূল, কারণ রস বুঝাইতে যদিও সমালোচনের আবশ্যক নাই, অথাপি বস্তু-ধ্বনি বুঝাইতে, সমালোচনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।"

এ গ্রন্থ রবীন্দ্রকাব্য বা সাহিত্য সম্পর্কে কোনো ধারাবাহিক আলোচনাকে আশ্রয় করেনি। গ্রন্থটি আসলে প্রবন্ধ-সংগ্রহ। প্রথম তিনটি রচনা তিনখানি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা—কড়ি ও কোমল, ফাল্গুনী ও বলাকা। চতুর্থ এবং শেষ আলোচনাই এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এ আলোচনা রবীন্দ্র-কাব্যের একটি বিশেষ দিক নিয়ে গড়ে উঠেছে। বিষয়টি হল প্রেম। লেখক রচনার নামকরণ করেছেন—রবীন্দ্র-সাহিত্যে কান্তাপ্রেম।

কড়ি ও কোমল প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।—"আমাদের প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরাও পার্থিব প্রেমের ভাষায় একটা অপার্থিব নিত্য প্রেমের বর্ণনা করেছেন।···সেই জন্যেই

অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে আমরা বৈষ্ণব কবিদের একটা ছায়া দেখতে পাই এবং রবীন্দ্রনাথের ভোগস্পর্শী বর্ণনার মধ্যে জয়দেব ও বিদ্যাপতির আভাস অনুভব করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এইখানে যে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে যেমন কেবল মাত্র একটা রূপকের সাহায্যে তত্ত্বটিকে পরিস্ফূর্ত করবার চেষ্টা রয়েছে তাঁর মধ্যে সে ভাবে সেটা প্রকাশ পায় নাই। সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষী প্রাণের যে বিশ্ব-প্রচার আমরা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, সুন্দরের অন্বেষণে সমস্ত বিশ্ব পরিক্রম করে যেমন একটা "নেতি নেতি" ধ্বনির সন্ধান পাই, বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে তা পাওয়া যায় না।...তাঁর কাব্যের মধ্যে আমরা বেদনাময় সৌন্দর্যলিপ্সু প্রাণের যেমন একটা জীবন্ত ইতিহাস দেখতে পাই বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে তা পাওয়া যায় না।"[১]

ফাল্গুনী সম্পর্কে লেখক জানালেন, "পূর্বে আমাদের দেশে ছলিক বলে একরকম গীতাভিনয় হোত, সেই অভিনয়ে অভিনেতা আপন মনের কোনও গূঢ় অভিপ্রায় অভিনয় ও গানের অছিলায় প্রকাশ করত; নাচ ও গান ছিল তার প্রধান অঙ্গ, পাত্রপাত্রীর চরিত্র সমাবেশের বাহুল্য তাতে কোনও স্থান পেত না। কাব্যরসের মধ্য দিয়ে অভিনেতার কোনও ইঙ্গিত যাতে সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠতে পারে —এই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

"ফাল্গুনীকেও আমরা একরকমের নূতন ধরনের ছলিক বলতে পারি। তবে এতে কোনও ব্যক্তিগত ইঙ্গিত নেই। সমস্ত জগতের লীলাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিতটি যুগযুগান্তর ধরে নিত্য নব ভাবে ফুটে উঠছে, সেইটিই হচ্ছে এই ছলিকের ভিতরকার কথা।"[২] এই ভিতরকার কথাই ফাল্গুনী আলোচনার সবটা জুড়ে আছে।

---

১ পৃ. ১৮-১৯।

২ পৃ. ২১।

লেখক এ আলোচনার কোথাও জানালেন না যে ফাল্গুনীর সাহিত্য-রূপ ছলিকের সঙ্গে কিভাবে ও কতখানি জড়িত। আমাদের দেশের ছলিক অভিনয়ের ইতিবৃত্ত ও উদাহরণ দিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে ফাল্গুনীর নাট্যরূপ বিচার করার যে সুন্দর অবকাশ ছিল লেখক তার সদ্ব্যবহার করেন নি। তাঁর দৃষ্টি রইল নাটকটির তত্ত্বের প্রতি, তার শিল্পরূপের প্রতি নয়।

বলাকা আলোচনাতেও এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যাই সব। আলোচনার ভূমিকায় লেখকের উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট।—"বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক দুই একজন বন্ধুর সহিত যখনই আলাপ ও আলোচনার সুযোগ হইয়াছে তখনই শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্য অনেকাংশ দুর্বোধ্য এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার স্থান কোথায় তাহা নির্দেশ করা কঠিন। একদিন রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ক্লাশে যখন পাওয়া গিয়াছিল তখন তাঁহাকেও এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। কবি তাহার উত্তরে তাঁহার সুললিত কণ্ঠে বলাকার কয়েকটি কবিতা পড়িয়া শুনান। বলাকায় তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা তিনি বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা স্পষ্ট সরল গদ্যে তাহা বুঝান সম্ভব নয়, ইহাই বোধ হয় কবির ব্যঞ্জনা। অধ্যাপক বন্ধুরা আমাকেও মধ্যে মধ্যে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যখন যতটুক সুযোগ পাইয়াছি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ এই প্রবন্ধে 'বলাকা' সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা আলোচনা করিব। কবির মর্মকথা উদ্ঘাটন করিতে পারিব কি না জানি না। তবে আমি নিজে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।"[১]

---

১ পৃ. ৪২।

বলাকার কবিতাগুলির মর্মব্যাখ্যা করার পর লেখক জানিয়েছেন বলাকায় কবিমানস কীভাবে স্ফূর্ত হয়েছে এবং তার অপূর্ণতাই বা কোথায়। অবশ্য এসবই তত্ত্বের দিক থেকে। "...রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন কোনও Theory বা মতকে অবলম্বন করিয়া যাত্রা করে নাই। সৌন্দর্যপিপাসু, ভোগপিপাসু চিত্ত তার আপন স্বাভাবিক গতিতে প্রকৃতি ও মানুষকে যে চক্ষুতে দেখিয়াছে তাহা লইয়াই তাঁর কাব্যজীবনের আরম্ভ। সেই ভোগই তাঁহার কাব্যে ভোগাতীতকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগের অনেক কবিতা ও গানের মধ্য দিয়া শ্রেয়োবোধের যে এই অঙ্গুলি সংকেত তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত ও মানুষের সহিত যে শান্তিময় স্পন্দন তাঁহার কাব্য-জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা যখন নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া একটি নবীন জাগরণে তাঁহার চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল, তাহারই একটি পূর্ণ পরিণতি আমরা বলাকার মধ্যে পাই। বলাকা রচিত হইবার প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব হইতেই যে এই ভাবধারাটি তাঁহার চিত্তের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাও এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। যখন একথা বলা যায় যে, শ্রেয়োবোধের পরম সত্য ও পরম বাণীটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে নাই, তখন আমরা ইহাই বুঝি যে, যে জাগরণের মধ্যে, যে চলৎস্বরূপের মধ্যে, যে অজানার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য একটি অদ্ভুত বিশ্বজাগরণের মহিমায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারি সহিত তুল্য সামঞ্জস্যে সেই শ্রেয়োবোধের বাণীটি স্ফুট হইয়া উঠে নাই, সে অজানার স্বরূপকে আমাদের নিকট পূর্ণতরভাবে পরিচিত করিয়া দেয় নাই।..."[১]

'রবীন্দ্রসাহিত্যে কান্তাপ্রেম' প্রবন্ধে লেখক 'মহুয়া' পর্যন্ত রবীন্দ্র-

---

১ পৃ. ১২১-২।

কাব্যে প্রেমের যে রূপ পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যা দুইভাগে বিভক্ত। এক, মহুয়ার পূর্বকাল ; দুই, মহুয়ার কাল। লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন, "মহুয়ার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের যে স্বরূপের আমরা পরিচয় পাই, তাহাতে দেখা যায় অন্তর-গুহাবর্তী আত্মস্বরূপ প্রেমধাতু আমার অন্তরের মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে ও নরলোকের পরম মৈত্রীর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।...কিন্তু প্রায় অধিকাংশ কবিতাতেই পুরুষের দিক হইতে প্রেমের আত্মপরিচয় দিবার জন্যই যেন কবি ব্যস্ত। নারীর প্রেম তাহার আপন স্বাধীনতায় ও স্বতন্ত্রতায় যেভাবে আত্মপরিচয় দেয়, তাহার কোনো বিশেষ সন্ধান মহুয়ার পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থে স্ফুট হইয়া উঠে নাই। চিরপ্রাণময়ী প্রকৃতির মধ্যে ও নবজাগরণময়ী নারীর মধ্যে প্রেম কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে মহুয়াতেই আমরা তাহার প্রথম পরিচয় পাই।"[১]

"সমস্ত মহুয়া কাব্যের মধ্যে নারীর যৌবন বহ্নি, তাহার মদির রস, তাহার উদ্দাম আকর্ষণ, তাহার ধৈর্যগাম্ভীর্যের সহিত, তাহার অশ্রুয়চ্ছায়ার সহিত তাহার ঊর্ধ্বোন্নত মুক্তিচারী অনন্তের আহ্বানের সহিত, কেমন কঠিনে মধুরে মিলন ঘটিয়াছে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সহিত নারী ও নরলোকের যে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে, নানা বন্ধনের মধ্য দিয়া নারীপ্রেম যে বিচিত্র মুক্তির ইঙ্গিতে আমাদের অন্তরাত্মাকে শিহরিত করিয়া দেয়, সে শিহরণ যে শুধু অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসের কারাগৃহের মধ্যে, আপন অনুভবের মুক্তি-সংগীতের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাহা যে মানুষকে নরসমাজের ও প্রকৃতিলোকের বিচিত্র, দুর্ধর্ষ সংগ্রামের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যে, বিরহের মধ্যে দুঃখসন্তাপের মধ্যে ধৈর্যে অটল,

১ পৃ. ১২৪-৫।

গতিতে বাধাহীন মুক্তিবিহারী করিয়া তোলে। তাহারই আঘ্রাণ মহুয়া কাব্যের মধ্য হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মনে হয় যেন নারীপ্রেমের অনুভব ও কল্পনা মানুষের চিত্তলোকে যা কিছু দীপ্তি, যা কিছু বর্ণচ্ছটা, যা কিছু তপস্যা, যা কিছু শৌর্য, বীর্য ও অগ্নিদীক্ষা আনিতে পারে, মহুয়ার পর্ণপুটে কবি তাহা নিঃশেষে ভরিয়া দিয়াছেন।"[১]

এই দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবি-রশ্মি'।[২] এই সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত সকল কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা প্রায় একটি একটি ক'রে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 'ক্ষণিকা' থেকে 'তাসের দেশ' পর্যন্ত রচনাগুলির ব্যাখ্যা আছে। কেবল ছোটগল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য গদ্যরচনাগুলিকে এ-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এ গ্রন্থ আমাদের মনে করিয়ে দেয় Browning Encyclopaedia অথবা Browning, Tennyson Handbook জাতীয় গ্রন্থগুলির কথা।

চারুচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল কবির সঙ্গে। এবং এই পরিচয়ের সুযোগ তিনি যথেচ্ছা গ্রহণ করেছেন নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কবির কাছ থেকে যাচাই করে নিতে। তিনি নিজেই ভূমিকায় এই ঋণ স্বীকার করেছেন।—"যখন যেখানে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার গোচর করিয়াছি, এবং তিনি আমার প্রতি তাঁহার অহেতুক স্নেহাতিশয়তার অনুরোধে সংশয় মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার অনেক কবিতা ও কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব

১ পৃ. ২৪৭-৮।

২ প্রকাশকাল ১৯৩৮-৩৯। ২ খণ্ড।

ও ভাব আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি; এবং আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক স্থানে কবির ভাষাই পরিগৃহীত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা ছাড়াও লেখক তাঁর পূর্ববর্তী "বহু লেখকের পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে অসঙ্কোচে উপকরণ ও ভাব আহরণ" করেছেন। বহু-বিক্ষিপ্ত উপকরণ একত্র সংগ্রহ করার মাধুকরীর সঙ্গে লেখক নিজের বক্তব্যও যুক্ত করেছেন।

এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে 'সোনার তরী' সম্পর্কিত পৃষ্ঠাগুলি পড়লেই। লেখক প্রথমে সোনার তরী কবিতার ওপর যতগুলি বিশিষ্ট আলোচনা হয়েছে তাদের মোটামুটি সকলেরই উল্লেখ করেছেন এবং বিশিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করেছেন। তারপর নিজের মন্তব্য জানিয়েছেন। মন্তব্যটি মূল্যবান। তিনি বলেছেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ যখন এই কবিতাটি লেখেন তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৩২ বৎসর, আর যখন এই সব ব্যাখ্যা লেখা হয় তখন কবির বয়স হইয়াছে ৪৫ বা তদূর্ধ্ব। প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ অনেক আধ্যাত্মিক ও মিষ্টিক কবিতা লিখিয়া লোকের মনের উপর এমন একটা ধারণা বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন যে ব্যাখ্যাকারেরা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে সোনার তরী কবিতা লেখার পূর্বে বা সমকালে কবির আধ্যাত্মিক রচনা-সৃষ্টি অধিক হয় নাই। প্রৌঢ়-কবির মনোভাব যুবা কবির কবিতাতে আরোপ করাতে কালানুচিততা দোষ anachronism ঘটিয়াছে।"[১]

এরপর লেখক জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন ক'রে এই কবিতা সম্পর্কে কবির আপন ব্যাখ্যা তিনি যা পেয়েছেন। ১৩১৫ সালে লেখক কবিকে যে প্রশ্ন করেন তার উত্তর, এবং পুনরায়

---

১ পৃ. ২২৮।

১৩৩৯ সালে [গ্রন্থপ্রকাশের নিকটবর্তীকালে] যে সব প্রশ্ন করেন তার উত্তরও এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। চারুচন্দ্র কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন বলেই আমরা পেয়েছি কবির ব্যাখ্যা—যে মানস-পরিবেশে তিনি সোনার তরী রচনা করেছিলেন। কবির যে পত্র চারুচন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন তাতে কবি লিখেছেন, "...এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্ত দ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে।...যেমন সোনার তরী কবিতাটি। ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারানত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচাধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকা হু হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ঐ অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলিধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত। মনে আছে এগ্রিকাল্‌চারাল বিভাগীয় দ্বিজুবাবু বিদ্রূপ করেছিলেন শ্রাবণ মাসের ধানের অসাময়িকতা উল্লেখ করে।

"ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদল দিনের ছবি 'সোনার তরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।..."[১]

এই পত্রের পরেও চারুচন্দ্র কবিকে জানান যে সোনার তরী কবিতার রচনা-কাল দেওয়া আছে ফাল্গুন, অথচ কবিতায় আছে শ্রাবণ মাসের ঘটনা। এ অসঙ্গতির কী মীমাংসা? কবি জানান, "...যেদিন বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচাধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে সেদিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজো আমার মনে আছে। সেই দিনেই 'সোনার তরী' কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে,

১ পৃ. ২২৯।

তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই।···আমার মনে সোনার তরীর যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণদিনের ইতিহাস, সেটা কোন্ তারিখে লিখিত হয়েছিল সেইটেই আকস্মিক···।"[১] রবীন্দ্রনাথের এই পত্র দুটি মূল্যবান, কারণ তা আমাদের জানায় কাব্যরচনার প্রেরণা কীভাবে উৎপন্ন হয়, এবং প্রেরণা এলেই যে কাব্যের প্রকাশ ঘটে এমন কোনো কথা নেই।

সোনার তরীর প্রেরণা সম্পর্কে কবির কথাই যে সব নয়, সেই কথা জানাতে চারুচন্দ্র পরিশেষে একজন লেখকের আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন। এই আলোচনা থেকে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথ যখন পদ্মায় কাঁচা ধানে বোঝাই নৌকার ছবি দেখেন তখন তাঁর মনে পড়ে ছেলেবেলার স্মৃতি—যখন কবি বিহারীলালের একটি গানে তিনি সুর দেন এবং যে গান তাঁর খুব ভালো লেগেছিল—

সোনার তরী নয়নে নাচে নাচে।
পা না দিতে দিতে ডুবে যে আচম্বিতে···

এই তথ্যের সঙ্গে চারুচন্দ্র যোগ করলেন, "কমলাকান্তের দপ্তরে 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধের মধ্যে 'সোনার জাহাজ' শব্দটি আছে। কমলাকান্ত আফিম-দেবীকে বলিতেছেন—"তুমি বৎসর বৎসর সোনার জাহাজে চড়িয়া চীনদেশে পূজা খাইতে যাও।" এই 'সোনার জাহাজ' কথাটিও হয়ত কবির মনে সোনার তরীর ভাব উদ্রেক করিয়া দিয়া থাকিবে।"[২]

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের প্রতি যে সমালোচকদের পড়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এ যুগের রবীন্দ্র-সমালোচনার

---

১ পৃ. ২৩০।

২ পৃ. ২০১।

মধ্যে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 'রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ'[১] পুস্তকে দুই বোন, মালঞ্চ, বাঁশরী, চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা গ্রন্থগুলির একটা বিশেষ দিক থেকে সমীক্ষা করলেন। দিকটি হল মনোবিকলনতত্ত্বের। লেখক নিজেই ভূমিকায় জানিয়েছেন, "ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মনের অতল-প্রদেশের যে সব রহস্য ধরা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কবির দৃষ্টি থেকে সে সব রহস্য এড়িয়ে যেতে পারে নি। একজনের পদ্ধতি বিশ্লেষণমূলক; আর একজন মানুষের মনের জীবনকে বুঝেছেন শিল্পীর সহজ অনুভূতি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক লেখাগুলি পড়তে পড়তে বারে বারে ফ্রয়েডের কথা মনে হয়েছে। ফ্রয়েডের দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি এই প্রবন্ধ গুলির মধ্যে।"

এই ব্যাখ্যা যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে খুশী করেছিল সে-কথাও লেখক জানিয়েছেন—"এ ব্যাখ্যা অন্যের কাছে কেমন লাগবে জানি না, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ খুসী হয়েছেন এবং একাধিক পত্রে সেই খুসীর কথা জানিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।"

যে গ্রন্থগুলি নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন সেগুলিতে রবীন্দ্র-নাথ নর-নারীর হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক ও সংঘাত এবং তথাকথিত যৌন-আকর্ষণের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এই চিত্র লেখক ফ্রয়েডিয় তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েড ছাড়াও এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার এবং তুলনামূলক আলোচনার জন্যে রোমাঁ রলাঁ, বার্নাড শ' ও দুএক স্থানে ব্রাউনিংকে টেনে এনেছেন। শ'-এর 'ম্যান্ এণ্ড সুপারম্যান্' থেকে বহু স্থানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। লেখক ফ্রয়েড মিলিয়ে মিলিয়ে কীভাবে নিজের বক্তব্য খাড়া করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে। মালঞ্চ উপন্যাসটি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,

১ প্রকাশকাল ১৩৪৩। পৃ. ৯৬।

"ভাই-বোনের মত তুজনে পাশাপাশি মানুষ হয়েছে, কখনও তো তাদের মনের কোণে এই সত্য উঁকি মারেনি যে তারা পরস্পরকে এমন ক'রে ভালোবেসে এসেছে। অথচ তাদের ভালোবাসার মত এমন সত্যবস্তু আর নেই! নীরজাকে নিয়ে আদিত্য দশ বৎসর সংসার করলে—অথচ এই দশ বৎসর কাল ধরে সরলার প্রতি তার গভীর অনুরাগ তার নিজের কাছেই রইলো অজ্ঞাত!

"কেন এমন হয়? সাইকোএ্যানালিষ্টগণ বলেন, মানুষ তার নিজের ঘরেরও সব খবর জানে না। তার মনের নির্জ্জান প্রদেশে দিবারাত্রি চলেছে বিচিত্র চিন্তারাশির অদ্ভুত তরঙ্গ-লীলা, সেখানে গোপন মনের কত নিবিড় কামনার ঠেলাঠেলি। কত বিবাহিত আদিত্যের মনে ঘুমিয়ে আছে কত সরলার অস্পষ্ট মুখখানি; কত কুমারী সরলার মনে রয়েছে অন্যের স্বামীর প্রতি গভীর আসক্তি। বাহিরে তারা সমাজের চোখে কত নিষ্কলঙ্ক, অন্তর্যামীর চোখে কিন্তু অন্তরের সমস্ত গূঢ় রহস্য অনাবৃত হয়ে রয়েছে। ফ্রয়েড লিখেছেন:

"But men's craving for the grandiosity is now suffering the third and most bitter blow from present-day psychological research which is endeavouring to prove to the *ego* of each of us that he is not even master in his own house, but that he must remain content with the veriest scraps of information about what is going on unconsciously in his own mind.

"ছেলেবেলায় আমাদের মনের গভীরে এমন অনেক কিছু ঘটে যার সংবাদ আমরা নিজেরাই জানি না। ফ্রয়েড বলেন, The little human being is frequently a finished product in his fourth or fifth year, and only gradually

reveals in later years what is buried in him. চার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিশুমন এমন করেই একজনকে ভালোবেসে ফেলে যে সেই ভালোবাসার ছাপ শেষ পর্যন্ত থেকে যায় আমাদের মনে। কিছুতেই তাকে মুছে ফেলতে পারি না। অদৃশ্য বন্ধনে তার সঙ্গে আমরা আজীবন বাঁধা থেকে যাই। এই যে ছেলেবয়সের গোপন অনুরাগ—এই অনুরাগ অনেক দিন পর্যন্ত নিজের কাছেও লুকানো থাকে। তারপর ঘটনাচক্রের ঘাতপ্রতিঘাতে হয় তো কারও বিরাগের আগুনের আভায় সেই গোপন অনুরাগ নিজের কাছে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন আর সংশোধনের উপায় থাকে না। নীরজার আর আদিত্যের মধ্যে যে মিথ্যা খাড়া হয়েছিল—সেই মিথ্যা সহসা ভেঙে যায়। সরলার প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল সহজ সম্বন্ধের তলায়—সেই ভালোবাসাই আদিত্যের কাছে সকলের চেয়ে সত্য হয়ে জেগে ওঠে।...”[১]

বিজয়লাল আর একটি পুস্তকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্য একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এ দিকটি হল রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাস্তব বাংলার নিসর্গচিত্র এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের বাস্তব জীবনযাত্রার চিত্র কতোখানি ফুটেছে, তারই পরিচয়। পুস্তকের নাম ‘রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র’।[২] আলোচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক জানিয়েছেন, “রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা উঠিলে এমন কথা আজও শুনতে পাওয়া যায়—তিনি শহরের বিলাসী কবি, নগরের অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃত্রিম জীবনের সঙ্গেই তাঁর লেখনীর কারবার। এই ধারণা ভুল। কতখানি ভুল, তারই

১ পৃ. ৩৩-৩৫।

২ প্রকাশকাল ১৩৪৫। পৃ. ৭৪।

পরিচয় দেবার জন্য একদা লেখা হয়েছিল এই প্রবন্ধগুলি। পল্লীর প্রকৃতি আর পল্লীর মানুষের প্রতি যে বিপুল দরদ প্রকাশ পেয়েছে কবির অসংখ্য গল্পে, প্রবন্ধে ও কবিতায়—তার মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি বিশাল সত্য। এই সত্যটি হোলো, দুনিয়ায় যারা অনাদৃত আর শৃঙ্খলিত তাঁদের প্রতি তাঁর অন্তহীন সমবেদনা।”

আলোচনা অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত। কয়েকটি ছোটগল্প ও তাদের প্রধান চরিত্রের উল্লেখ, কবিতা থেকে পল্লীচিত্র বিষয়ক অংশবিশেষের উদ্ধৃতি ও ‘পলাতকা’ কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুর কিছু ব্যাখ্যা দ্বারাই লেখক নিজের বক্তব্য সম্পূর্ণ করেছেন।

কিন্তু লেখকের আলোচনা স্তুতিমূলক হওয়াতে, আলোচনায় যতটা উৎসাহ আছে, ততটা বিচার নেই। অতি-উৎসাহে লেখক এমন কথা বলেছেন যাতে মনে হয় বুঝি রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যেই বাংলাদেশের খাঁটি চিত্র প্রথম পাওয়া যায়। নবজাগ্রত বাংলা-সাহিত্যে খাঁটি বাংলাদেশ ও জাতির পরিচয়ের অভাব ছিল একথা রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম বয়স থেকেই জানতেন, সেকথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ছিন্নপত্র থেকে।—

“১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত ছিন্নপত্রের একখানি চিঠিতে আছে, ‘বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে বলেছেন, সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড়বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোক হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতির এবং দেশ-কালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চির-পীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তু-ভিটাবলম্বী প্রচণ্ডকর্মশীল-পৃথিবীর এক নিভৃতপ্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো

ক'রে বলে নি।' ” এরপর লেখক মন্তব্য করলেন, “এই শান্ত বাঙালীর কাহিনী রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভালো ক'রে আঁকলেন আমাদের সাহিত্যে। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম দেখতে পেলাম সেই চিরদিনের বাঙলাকে, যেখানে নদীর ঢালু তটে চাষী চাষ করে, ওপারের জনশূন্য, তৃণশূন্য বালুতীরতলে হাঁস উড়ে চলে, যেখানে চোখে জাগে নারকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, নাকে আসে প্রস্ফুটিত সর্ষেক্ষেতের গন্ধ, কানে শোনা যায় ঘাটের মেয়েদের উচ্চ-হাসি, মিষ্টকণ্ঠস্বর।···নদীর দুইধারে মেয়েরা স্নান করচে, কাপড় কাচচে এবং ভিজে কাপড়ে একমাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী নিয়ে ডান হাত দুলিয়ে চলেছে, জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্যে চিল উড়ছে,···রাখাল বালক গরু চরাচ্ছে—এই তো আমাদের সোনার বাংলার চিরন্তন ছবি। কত সন্ধ্যায়, কত প্রভাতে নির্নিমেষ নয়নে এই ছবি দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ আর বিচিত্র ভাষায় বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন এই ছবি দেখার অপূর্ব আনন্দকে।”[১]

অতি উৎসাহের বন্যায় লেখকের চিন্তা বানচাল হওয়াতে তিনি জানালেন রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম দেখতে পেলাম সেই চিরদিনের বাঙলাকে। চিন্তার রাশ টেনে রাখতে পারলে তিনি বাংলার মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য, বাউল ও ভাটিয়ালী গানের কথা ভেবে এমন কথা নিশ্চয়ই লিখতে পারতেন না।

১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হয় প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ।' রবীন্দ্র-কবিমানসও কাব্যপ্রকৃতি একটা সমগ্রদৃষ্টিতে দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। এই দুটি জিনিসের বিকাশ ও পরিণতিই

---

১ পৃ. ৩-৪।

তাঁর আলোচ্য বিষয়। এ আলোচনা যে কাব্যগ্রন্থগুলিকে আশ্রয় করেছে তা'রা হল সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে বলাকা। এই কাব্য-সাহিত্যকে লেখক চারটি পর্বে ভাগ করেছেন। যথা—

১ সন্ধ্যাসঙ্গীত পর্ব: সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে মানসী পর্যন্ত ;
২ সোনার তরীর পর্ব: সোনার তরী থেকে ক্ষণিকা ;
৩ খেয়া পর্ব: খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি
(কিন্তু লেখক তাঁর আলোচনা থেকে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি বাদ দিয়েছেন) ;
৪ বলাকা পর্ব: বলাকা ও অন্যান্য কাব্য।

লেখক নিজেই তাঁর সমালোচনা-রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি ; কাব্যের মধ্যে তাঁহার মনের শ্রেষ্ঠ অংশের প্রকাশ ; আবার তিনি কবি ছাড়াও ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার ইত্যাদি ; কাজেই মনের অপর অংশ সাহিত্যের ঐ সব শাখায় বিকশিত ; কাজেই তাঁহার সম্পূর্ণ মনকে বুঝিতে হইলে কাব্যের সঙ্গে অন্যান্য রচনা মিলাইয়া পড়া দরকার ; রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনা পরস্পরবিরোধী নয়, পরস্পর পরিপূরক। একই সময়ে লিখিত কাব্যে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে মনের লীলার ঐক্য থাকাই সম্ভব ; বিভিন্ন রচনায় তাহার প্রকাশ বিচিত্র হইতে পারে—কিন্তু মূলে একই মনের প্রকাশ ; সুতরাং একটু তলাইয়া পড়িলে মিল পাওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস।...কবিমনকে বুঝিবার জন্যই কবির সম্পূর্ণ মনকে জানা প্রয়োজন—এবং এই সম্পূর্ণ মনকে জানিতে হইলে একই কালে লিখিত কাব্যের সঙ্গে পরিপূরকভাবে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক।"[১] গ্রন্থকার নিজে এইভাবে

১ পৃ. ১/০-১৵০।

আলোচনা করেছেন। এবং সুফলও পেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রকাব্য-মানস অনেক ব্যাপক হয়ে ধরা পড়েছে।

গীতাঞ্জলির কবি রবীন্দ্রনাথকে লেখক কিন্তু আমল দিতে রাজী হন নি।—"গীতাঞ্জলি-সম্বন্ধে আমি নীরব।...রবীন্দ্রনাথ বিদেশে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশেরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি গীতাঞ্জলির কবি বলিয়া পরিচিত। গীতাঞ্জলি তাঁহার প্রতিভার মূলধারা না হওয়াতে এই পরিচয়ের দ্বারা লোকে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝিয়াছে; রবীন্দ্র-প্রতিভার মূলধারার আলোচনায় গীতাঞ্জলি-সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা থাকিলে লোকের এই ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত।"[১]

কিন্তু বিশী মহাশয়ের একথার পরেও যে অন্য কথা আছে তা প্রমথ চৌধুরী তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ যে ইউরোপে বিশ্বকবি হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছেন সে ঐ গীতাঞ্জলির প্রসাদে। সুতরাং গীতাঞ্জলির কথা উহ্য রেখে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না।—"বিশী মহাশয় মনে করেন, ভগবদ্ভক্তিই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব, অপর পক্ষে মানব-প্রীতিই হচ্ছে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রাণ। ইউরোপের মনীষীরা কি সকলেই ভগবদ্ভক্তিতে গদ্‌গদ আর humanity কথাটা কি ইউরোপে অজ্ঞাত? গীতাঞ্জলি কাব্য হিসাবে যে একটি অমূল্যরত্ন বলে' ইউরোপে কেন গণ্য হয়েচে তার বিচার থাকলে কাব্য-প্রবাহ পূর্ণাঙ্গ হত।"

যাই হোক, বিশী মহাশয়ের আলোচনার আসল উদ্দেশ্য, যে কবি-মানস রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের স্রষ্টা তার স্বরূপ নির্দেশ করা। গ্রন্থের প্রথমে তিনি জানিয়েছেন রবীন্দ্র-কাব্যের চারটি পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মানস কীভাবে ও কতখানি বিকাশলাভ করেছে; কোন অভিজ্ঞতা ও উপাদান কবি কাজে লাগিয়েছেন, এবং তার ফলে

---

১ পৃ. ১৶৹।

বিভিন্ন পর্বের কাব্য কীভাবে রূপ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি রবীন্দ্র-কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি মূল সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। এবং কালিদাস, কীটস্ ও শেলীর কাব্য-প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা ক'রে এই সূত্রগুলিকে আরও ঘষে মেজে নিয়েছেন। তারপর প্রতি পর্বের অন্তর্ভুক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির আলোচনার দ্বারা রবীন্দ্র-কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্তগুলিকে সুপরিস্ফুট করা হয়েছে।

বিশী মহাশয় রবীন্দ্র-প্রতিভার তিনটি মূল উপাদানের সন্ধান দিয়েছেন। প্রথম, রবীন্দ্রপ্রতিভার মানবমুখিতা। তাঁর মতে, "কালিদাসের পরে এত বিরাট মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।"

দ্বিতীয়ত, "মানবমুখিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রধান ধর্ম হইলেও তাহাতে কোথায় যেন একটা ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে যাহাতে তিনি সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র, খণ্ড, দোষত্রুটি-বহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, কিন্তু শক্তি নাই; বারে বারে তিনি মানুষের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দ্বার খোলে নাই। তিনি দ্বারের বাহিরে বসিয়া অনুমানের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা, আভাসে, ইঙ্গিতে যেটুকু পাইয়াছেন তাহার দ্বারা, ভিতরের জীবনযাত্রাব চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মানবের সংসারের গান গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন।... মানবের সিংহদ্বারে বসিয়া বাঁশী বাজাইবার অধিকার মাত্র আছে, তাহার অধিক নাই। ইহাই রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার ট্র্যাজেডি।"

তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিণাম হল প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়সাধন।—"রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিণাম কোথায়? সিংহদ্বারে বসিয়া বাঁশী বাজানোকেই তিনি পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কি না, বা অন্য কোন উপায়ে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে;

ওয়ার্ডস্বার্থ প্রকৃতির মধ্য দিয়া জগৎসত্তাকে জানিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবসত্তাকে জানিয়াছেন; প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে তিনি মানব-প্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন। বাল্য ও কৈশোরের স্বাভাবিক প্রকৃতি-প্রীতি পরিণত বয়সে গভীর অর্থদ্যোতক হইয়া কবির জীবনে দেখা দিয়াছে; জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ওঠা-পড়া ও মূর্ছনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভা বহুদিন পরে 'সমে' ফিরিয়া আসিয়াছে।"[১]

যদিও লেখকের আলোচনা মূলত ভাবাশ্রয়ী, এবং সেই কারণে কাব্যের মধ্য দিয়ে কবির চিত্তলোকের সন্ধান, এবং কবিচিত্তের সন্ধান নিয়ে কাব্যের প্রকৃতি বিচার করা হয়েছে, তথাপি মাঝে মাঝে কাব্যের বহিরঙ্গ বা শিল্পরূপের প্রতিও লেখকের ক্ষণ-সজাগতা দেখা যায়। এই সজাগতার ফলে লেখক রবীন্দ্রকাব্যের রচনারীতির ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে সাহসী হয়েছেন। তাঁর চোখে রবীন্দ্রকাব্যে প্রধানত দুটি দোষ; সামান্যকথন ও অতিকথন।—"এই যে দুইটি দোষের কথা বলিলাম, সামান্যকথন ও বহুকথন, সংক্ষেপে আমরা এ দুটিকে এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি। গদ্যের গুণের দ্বারা পদ্যের আক্রমণ এবং পদ্যের গুণের দ্বারা গদ্যের আক্রমণ।

"সামান্যকথন, অবশ্য পরিমিত মাত্রায়, গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণের দ্বারা কবির বহু নাট্য উপন্যাস ও প্রবন্ধ আক্রান্ত হইয়াছে। বহুকথনকে অর্থাৎ সাহিত্যের পদাতিকতা গুণকে গদ্যের প্রধান লক্ষণ বলিতে পারা যায়, ইহা-দ্বারা কবির কাব্য বিশেষরূপে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে।"

লেখক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা নিয়ে এই দুই দোষের কিছু বিশদ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মুখ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে

---

১ পৃ. ৮৶৹—১৴৹।

সোনার তরী কবিতাটিকেই নেওয়া হয়েছে। আবার সেই সোনার তরী! কিন্তু এবার এ-কবিতাটির সম্বন্ধে যে অভিযোগ আনা হল তা রীতিমত অভিনব বলতে হবে। লেখকের মতে সোনার তরী কবিতাটি সামান্যকথন-দোষে দুষ্ট। এই দোষ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে: "প্রথম দুইটি শ্লোকে বর্ষাপ্রভাতের চিত্র সুন্দর। তৃতীয় চতুর্থ শ্লোকে সোনার তরী ও তাহার নাবিকের চিত্র; পঞ্চম ও ষষ্ঠে সবটার পরিণাম। চতুর্থ শ্লোক পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু পঞ্চম শ্লোকের পূর্বে আর একটি শ্লোক থাকিলে যেন কবিতাটির আরো ঠাস বুনানি হইত, এবং পাঠকে যে অস্বস্তি বোধ করে তাহা ঘটিয়া উঠিত না।...এ কবিতাটি যে পাঠকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে, তাহা ইহার তত্ত্বের জন্য নয়, কবিতাটির পরিচিত বর্ষানদীর চিত্ররস এবং অপূর্ব ছন্দের জন্য। অবশ্য ইহার একটা তত্ত্বের দিকও আছে, কিন্তু চিত্রে ছেদ পড়িয়া যাওয়াতে তত্ত্ব ও চিত্রের মধ্যে একটা ভাগ হইয়া গিয়াছে। আরো দুই একটি তুলির টান পড়িলে এই ছেদ অন্তর্হিত হইয়া কবিতাটি চিত্রে-তত্ত্বে একাত্মা হইয়া অনবদ্য হইয়া উঠিত।"[১]

লেখকের মতে মানস-সুন্দরীর মতো কবিতাও অতিকথন-দোষে দুষ্ট। তিনি এ কবিতার শেষে অনাবশ্যক কয়েকটি ছত্র ঝুলে থাকতে দেখেছেন। তাঁর মতে:

রজনী গভীর হল দীপ নিবে আসে;

থেকে

মরণ সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি শয়নে।

অংশ কাব্যহিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।—"ইহার মধ্যে যে অংশে পদ্মা-তীরের বর্ণনা কাব্য-সৌন্দর্যে তাহার কোনো বিশিষ্টতা নাই; এতদপেক্ষা

১ পৃ. ৬২।

উচ্চাঙ্গের বর্ণনা কবি নিজে বহুবার করিয়াছেন। বিশেষতঃ, এত উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টির পরে এমন সাধারণ বর্ণনা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে।

"এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
* * *
জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।"

বস্তুত এখানেই কবিতার সমাপ্তি, এবং মানস-সুন্দরীর ইহাই রহস্য। কবিতার স্বাভাবিক আবেগ যেখানে শেষ হইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কলম তাহার পরে আরো খানিকটা চলে। কবি ও শিল্পীর মধ্যে এই ব্যবধান ঘুচাইতে রবীন্দ্রনাথের অনেকটা সময় লাগিয়াছে। সত্য বলিতে কি, গানগুলি বাদ দিলে, বলাকার পূর্বে এই পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নাই।"[১]

কবিতাকে কবিতা হিসেবে আলোচনা করতে গেলে কাব্যের ভাব কীভাবে কাব্যের রূপ সৃষ্টি করেছে সে কথা জানানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আলোচনার এই বৈশিষ্ট্য বিশী মহাশয়ের লেখায় মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে। যেমন, চৈতালির বাহন কেন সনেট তার একটা কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে চৈতালিতে "ভাবের আবেগ, কল্পনার মাধুর্য, আসক্তির তীব্রতা কিছুই নাই তবু ইহা, পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতার গভীর মাধুর্যে স্নিগ্ধ ও কর্মাবসানের সার্থকতায় নীরব।

"সেই কারণেই চৈতালির ভাবের বাহন সনেট। লিরিক কবিতা উদ্বাহিত নদীর স্রোতের মত—তাহাতে তীব্রতা আছে, আবেগ

১ পৃ. ৬৫।

আছে, তাহার প্রধান ধর্ম দ্রুতি বা চলতা। তাহা দিয়া চৈতালির আসক্তিহীন ভাবগুলি প্রকাশ করা চলে না। লিরিক যদি প্রবাহিত নদীর স্রোত, সনেট সেই নদীর হিম-কঠিন তুষার, নিতান্তই স্থিতি-ধর্মী। তাহাতে সুবিধা এই—সনেট ভাবিয়া চিন্তিয়া, রহিয়া বসিয়া, অবসর মত লেখা চলে, তাহাতে লিরিকের ত্বরা নাই। সনেট স্থপিত-বিদ্যার সগোত্র, লিরিক সগোত্র সঙ্গীতের।···চৈতালির ভাবের অনেকটা মন্থর ভাব, তাহা বর্ষার পদ্মার মত অত্যন্ত সচল নহে, শীত-শেষের পদ্মার ন্যায় অনেকটা স্তিমিত—কাজেই সনেট এখানে স্বভাবতই ভাবের বাহন হইয়া পড়িয়াছে। একই কারণে নৈবেদ্য কাব্যও সনেটবহুল।···সনেটের গঠনের যে একটি অমোঘ নিয়ম-কৌশল আছে রবীন্দ্রনাথ সেদিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নাই—মিল ও শ্লোক-বিভাগ তাঁহার ইচ্ছাকৃত।"[১]

সমগ্রভাবে দেখলে এই কথাই মনে হয়, বিশী মহাশয়ের সমালোচনার রীতি মনগড়া সূত্র বা ফরমূলা-আশ্রয়ী। রবীন্দ্র-মানসের ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্র-প্রতিভাকে নিজের তৈরী ফরমূলায় বাঁধতে চেয়েছেন। গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ যেহেতু তাঁর গড়া ছকে ধরা পড়েন না, অতএব সে-রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁর মতে গীতাঞ্জলি রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল ধারা নয়। কিন্তু এই আপ্ত মতকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যতটা বিচার-প্রমাণ প্রয়োজন, তার কিছুই লেখক দেন নি অথবা দিতে পারেন নি। ফরমূলাপন্থী সমালোচনার ত্রুটি এই যে এ-সমালোচনা চট্ ক'রে সিদ্ধান্ত করে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তকে যথোচিত যুক্তি-বিচারের ওপর দাঁড় করাতে পারে না। এই ত্রুটি বিশী মহাশয়ের আলোচনাতেও দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তিনি যে

১ পৃ. ১০৬

ঘোষণা করেছেন, তাতে গলারই জোর আছে, বিচার-বিশ্লেষণের জোর কিছুই নেই। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা থেকে পাঠ নিয়ে অতি সহজেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে কবি মানবের সিংহদ্বারে বসে শুধু বাঁশী বাজিয়েছেন। তাছাড়া লেখকের সাহিত্যচিন্তাও সর্বত্র খুব স্বচ্ছ বলা চলে না। যেমন, সামান্যকথন ও বহুকথনকে লেখক পদ্য ও গদ্যের গুণের সঙ্গে জড়িত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই? সামান্যকথন ও বহুকথন দোষ ঘটে ভাব ও ভাষার বিরোধে, অর্থাৎ ভাবের ওজন ও ভাষার ওজনে যখন ভারসাম্য থাকে না। ভাষার রূপ অর্থাৎ পদ্য কিংবা গদ্য সে বিরোধের সঙ্গে জড়িত নয়। লেখক নিজেই যে উদাহরণ দিয়েছেন তাতে তিনি ভাব ও ভাষার বিরোধই দেখিয়েছেন। পদ্যের সামান্যকথন ও গদ্যের বহুকথন গুণের মিশ্রণ বা একের অন্যকে আক্রমণ-জনিত দোষ তাতে কোথায়?

বিচার-বিশ্লেষণ না ক'রে রায় দেবার অতি উৎসাহে সমালোচনা কতটা পঙ্গু হয়ে পড়ে তার দৃষ্টান্ত বুঝি বিশী মহাশয়ের এ-গ্রন্থে যথেষ্ট রয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের দোষ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "গদ্য জমিতে সঞ্চরণশীল পদাতিক; তাহাকে প্রতিপদক্ষেপে নানা বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া চলাফিরা করিতে হয়। এইরূপ পদচারণার দ্বারাই সে আমাদের সগোত্রত্ব প্রচার করিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইয়া ওঠে। গীতি-কাব্যের মত সুরের পক্ষে বিচরণ করিলে তাহার চলে না। রবীন্দ্র-নাথের অনেক উপন্যাস ও নাটক গীতিকাব্যের সহিত অত্যন্ত সগোত্র হওয়ায় যেমনভাবে আমাদের রসবোধ জাগরণ করা উচিত তেমনভাবে করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার ছোটগল্পগুলি স্বভাবতই গীতি-কাব্যের সগোত্র হওয়ায় সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে, রসবোধ-জাগরণে তাহারা সমর্থ।"[১] এই সামান্য কয়টি পংক্তির মধ্যে লেখক একাধিক

---

১ পৃ. ৬০।

গুরুত্বপূর্ণ মত ব্যক্ত করেছেন, অথচ গ্রন্থের মধ্যে তাদের কোনোটিকেই যুক্তি-বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন নি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নাটক ও ছোটগল্প সম্পর্কে কোনো আলোচনা না ক'রেই সরাসরি একটা মূল্যায়ন করা হয়ে গেল। একে সমালোচনার দাপটই বলতে পারি।

আর এক স্থানে বলা হয়েছে, "পরবর্তীকালে কবি তাঁহার অনেকগুলি পূর্বলিখিত ও সুন্দর নাট্যকে পুনর্লেখন করিতে গিয়া তত্ত্বের ভারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজা ভাঙ্গিয়া অরূপরতন, অচলায়তন ভাঙ্গিয়া গুরু ও শারদোৎসব ভাঙ্গিয়া ঋণশোধের সৃষ্টি। এগুলিকে কবি-প্রতিভার অনাসৃষ্টি বলা উচিত।"[1] বিশ্লেষণ না ক'রে এইভাবে আত্মমত জাহির করাকেও সমালোচনার অনাসৃষ্টি বলা উচিত নয় কি ?

১৩৪৬ সালে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়' গ্রন্থে শচীন সেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য, উপন্যাস ও নাটকে রবীন্দ্র-সাহিত্য-মানস যেভাবে বিকশিত হয়েছে তার পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের সমালোচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখক 'নিবেদনে' জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার কতকগুলি মূলসূত্র আছে, তাঁহার দৃষ্টির বিশেষ ভঙ্গি আছে এবং সুরের বিশিষ্ট ঢং আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই পথের সন্ধান জানা আবশ্যক। এই গ্রন্থ সেই সন্ধানই দিতে চাহিয়াছে। এখানে বিশ্লেষণ ও আলোচনার সাহায্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা আছে—কোন তুলনামূলক বিচারের ভান নাই।"

গ্রন্থে কাব্য-বিষয়ক আলোচনাই জায়গা জুড়েছে। এ আলোচনার

---

১ পৃ. ১০।

বিশেষত্ব হল এই যে লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ নিয়ে কোনো ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করেন নি। তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের কতকগুলি দিক বা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন, জীবন-দেবতা, বিশ্বৈক্যানুভূতি, প্রেম-সাধনা, বৈষ্ণব-প্রভাব ইত্যাদি। আলোচনার প্রথমে কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও পাশ্চাত্য মনীষীগণের ধারণা পরিবেশিত হয়েছে নানা উদ্ধৃতি-সহকারে।

লেখক রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে কোনো নূতন আলোকপাত কিংবা মূল্যায়ন করতে পারেন নি। কাব্য-আলোচনায় প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের ও অন্য সমালোচকের কথা উদ্ধৃত ক'রে ও তার কিছু ব্যাখ্যা ক'রে এক একটি প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। গোটা কাব্য-আলোচনায় রবীন্দ্র-কাব্যকে কাব্য হিসেবে দেখা হয় নি, কাব্য-নিরপেক্ষ ভাব ও কাব্য-অনুষঙ্গী বিষয়ের প্রতিই লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার একটা বিবরণ দিয়ে, উপন্যাসগুলির অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদপত্রীয় পরিচয়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করা হয়েছে। এই পরিচয়ে আছে প্রতি উপন্যাসের মূল ভাব এবং প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু-চার কথা। এখানেও সাহিত্য-রূপের প্রতি লেখক একান্তই উদাসীন। উপন্যাসগুলির গঠন-প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য নিয়ে কিছুমাত্র আলোচনা নেই।

নাটকের মধ্যে কেবল ডাকঘর ও ফাল্গুনীর আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনাও শুধু নাটকের ভাব বিশ্লেষণ করতেই ব্যস্ত। ডাকঘর প্রসঙ্গে লেখক জানালেন, "ডাকঘর একটি বিগ্রহরূপী নাটক। ইহাতে নাটকত্ব কিছুই নাই, অথচ নাটকের আবরণে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।" যদি নাটকত্ব কিছুই নেই, তাহলে নাটকটির আলোচনাই বা কেন? কারণ, সম্ভবত লেখক যা বলেছেন, অর্থাৎ,

"এই সব রূপক নাটক কবির কোন বিশেষ চিন্তাধারার বাহন—তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেই রূপক নাটক সার্থক ; নাটকের ঘটনা শুধু কবির বক্তব্যকে প্রকাশ করিবার ছল মাত্র। তাই রূপক নাটিকাকে বিচার করিতে গেলে ভিন্ন মাপকাঠির প্রয়োজন—নাটক-রচনার প্রচলিত নীতি বা রীতি সেখানে পাওয়া যাইবে না।" লেখক কিন্তু এই ভিন্ন মাপকাঠির সন্ধান পান নি। কারণ, দেখা গেল যে লেখক এ নাটক-বিচারে সে মাপকাঠির কোনো প্রয়োগই করেন নি। স্রষ্টার চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারলেই রূপক নাটক সার্থক—লেখকের একথা নাট্য-সমালোচনার মৌল প্রতিজ্ঞাকেই অস্বীকার করে। রূপক নাটক স্রষ্টার চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তার একটা নিজস্ব নাট্যরূপ আছে। সেই রূপের পরিচয় সূক্ষ্মদর্শী নাট্য-সমালোচকের পক্ষেই পাওয়া সম্ভব।

নীহাররঞ্জন রায় ইতিপূর্বে পত্রপত্রিকায় নানা প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসগ্রাহী আলোচনা ক'রে আসছিলেন। এবার সেই আলোচনা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ক'রে এবং নূতন লেখার সঙ্গে সংযোজন ক'রে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[১] এই ভূমিকা প্রণয়নে লেখকের উদ্দেশ্য ও প্রয়াস সম্পর্কে লেখক নিবেদনে জানিয়েছেন, "রবীন্দ্র-সাহিত্যসাধনার সকল দিক এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। যে-সব দিক আলোচিত হইয়াছে তাহাও অসম্পূর্ণ, কারণ, একান্ত অধুনাতন রচনাগুলি ইচ্ছা করিয়াই আমি এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। কাব্য-প্রবাহের আলোচনায় 'পূরবী'তে (১৩৩১), ছোটগল্পে 'নামাঞ্জুর' গল্পে (১৩৩২), নাটকে 'রক্তকরবী'তে (১৩৩১) এবং উপন্যাসে 'শেষের কবিতা'য়

---

১ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৫। পৃ. ৪৯০।

(১৩৩৫) পৌঁছিয়াই ছেদ টানিয়াছি। কোনও ক্ষেত্রেই এই ছেদের বিশেষ কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই; সাধারণভাবে এইটুকুই শুধু বলিতে পারি, একান্ত সাম্প্রতিক রচনাগুলি সম্বন্ধে সমসাময়িক মানসদৃষ্টি কতকটা আচ্ছন্ন থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। সেই আশঙ্কায় আমি সে-চেষ্টা করি নাই।...আমার আলোচনা কালানুক্রমিক; রবীন্দ্র-মানসের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিবর্তন এই কালানুক্রমিক পাঠ ও আলোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ বুদ্ধিগোচর হয় না বলিয়া আমার বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ, আমি সর্বত্রই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, কবির ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। আমার ধারণা, এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দেখিলে, রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিবার সুবিধা হয়। কলাকৌশলের আলোচনা আমি ততটুকুই করিয়াছি যতটুকু রবীন্দ্র-কবিমানসকে বুঝিবার জন্য প্রয়োজন, যতটুকু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাব ও রসানুভূতির সহায়তা করে।"[১]

লেখক অজিত চক্রবর্তী দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত। বহুস্থলেই তিনি অজিতকুমারকে সাক্ষ্য মেনেছেন। এবং এই প্রভাব বশতই তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের "কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অথবা জীবনকে কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোনও উপায় নেই। অন্যান্য কবিদের পক্ষে যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহার জীবনের বাহিরে তাঁহার কাব্যের কোনও অস্তিত্বই নাই; কাব্যই তাঁহার জীবনের গভীরতম সত্তা, তাঁহার অন্তর্নিহিত চৈতন্য।"[২] একথা অজিতকুমারের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি।—

"কোনো কবির কাব্য যে তাহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা

---

১ পৃ. ১/০-১৶০।

২ পৃ. ৫২।

করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কোনো কবির জীবনে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। সেইজন্যই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনার সময়ে তাঁহার জীবনের কথা বেশী করিয়া পড়িতে হয়।"[১]

রবীন্দ্র-সমালোচনার কালে কবিকীর্তির মূল-নিহিত কোনো নিগূঢ় নিয়ম বা কোন মূল সুর আবিষ্কারের চেষ্টা, কিংবা সে কাব্যের মধ্যে তত্ত্বান্বেষণ করাটিকে লেখক রবীন্দ্রকাব্য-আস্বাদনের অন্তরায় ব'লে মনে করেন।—"প্রত্যেক বৃহৎ প্রতিভা, বৃহৎ জীবনের মধ্যেই একটা কালানুক্রমিক বিকাশ, বিবর্তনের একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-কবিকীর্তির মধ্যে এই বিকাশ, এই বিবর্তন ধারা অত্যন্ত স্পষ্ট।…কিন্তু…এই পরিচয়ই রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, ইহা স্থূল পথরেখার নির্দেশ মাত্র।…এই বিবর্তন ধারা সর্বত্র এক নহে, রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিজীবন সর্বত্র একই ধারা অনুসরণ করিয়া চলে নাই। জীবনের এক এক পর্যায়ে তাঁহার কবি-মানস এক একটি ভাববন্ধন স্বীকার করিয়াছে, আবার কিছুদিন পর সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাকে সবলে মুক্ত করিয়াছে, মুক্ত করিয়াছে আবার নূতন করিয়া নূতন ভাববন্ধনে বাঁধা পড়িবার জন্য। এই বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্তি-বন্ধনের প্রেরণাই অন্যদিক হইতে বলিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি, তাঁহার কবিধর্ম, তাঁহার কবিজীবনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই যে বন্ধন ও মুক্তি, মুক্তি ও বন্ধন, আমি আগেই বলিয়াছি, এর কোনও পরিণতি নাই, ক্রমাগত পরিবর্তনই এর পরিণতি।"[২]

লেখকের রসশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই মন্তব্য দ্বারা যে,

১ কাব্যপরিক্রমা, ২য় সং, পৃ. ১৫৭৮।

২ পৃ. ৫৪।

রবীন্দ্রকাব্য পাঠে তত্ত্বান্বেষণ প্রবল হয়ে উঠলে তাতে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।—“কবির কাব্যে তত্ত্ব নাই, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নাই এ-কথা আমি বলি না, কেহই বলিবেন না, কিন্তু সে-তত্ত্ব অনুভূত সত্য মাত্র এবং কবির কবি-মানসকে অতিক্রম করিয়া সে-তত্ত্বের, সে-জিজ্ঞাসার কোনও মূল্য নাই। সে-তত্ত্ব কবির কাব্য-নিরপেক্ষ নয়, কাব্যের বাহিরে তাহার কোনও সত্তা নাই। একথা বলিতেছি এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে, কোনও নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট তত্ত্বের শাসন তাহার মধ্যে নাই, বরং মনে হইবে যে, তাহার কাব্য তত্ত্বকে যতটুকু আশ্রয় করিয়াছে তাহা অত্যন্ত গৌণ, তাহা শুধু তাঁহার কবি-মানসের মুক্ত স্বাধীন বিহারের জন্যই তাহার রস ও রহস্য কবি-মানসের বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিতে সহায়তা করিয়াছে মাত্র।···বিশেষ কোনও একটি তত্ত্বের দিক হইতে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করিলে তাহার অসংখ্য রঙ ও রেখার বৈচিত্র্য প্রাণরসের প্রাচুর্য, কবি-মানসের স্বচ্ছন্দ লীলা, কিছুই আমাদের চিত্তগোচর হয় না। পাঠকের সমগ্র দৃষ্টি তাহাতে ব্যাহত হয়, রসোপলব্ধির ব্যাঘাত হয়, এবং তাহার ফলে কবি ও কাব্য দুইই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া যায়।”[১]

কিন্তু সমালোচক হিসেবে লেখক যে দায়িত্ব নিয়েছেন তা সাহিত্যের রূপবিচারকে বাদ দিয়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, ছোটগল্প ও উপন্যাস কেন পৃথকভাবে আলোচনা করা হল তার কোনো কারণ বোঝা যায় না। নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “যেহেতু আমার উদ্দেশ্য রবীন্দ্র-মানসের পরিচয়, যে-মানস তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে সেই মানসের বিবর্তন

১ পৃ. ৫৫-৬

আবর্তনের ইতিহাস, সেই হেতু নাট্যলক্ষণের বিচার আমার কাছে মুখ্য নয়, সাহিত্য-বিচার এবং সেই সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্র-মানস কতখানি কি উপায়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার আলোচনাই প্রধান।”[১]

একান্তভাবে রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় দেবারই যখন ইচ্ছা, তখন লেখক নিজের আলোচনাকে বিশুদ্ধভাবে কালানুক্রমিক করলেই পারতেন। একই কালে বা পর্বে কীভাবে রবীন্দ্র-মানস কবিতায়, নাটকে, গল্পে-উপন্যাসে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে—তা বোঝাতে সুবিধাই হত। ফর্মের দিক থেকে যখন রবীন্দ্র-সাহিত্যকে ভাগই করা হল তখন ফর্মের বিচার আবশ্যক বৈকি। নাটক আলোচনায় নাট্যলক্ষণের বিচার মুখ্য না ক'রে তার 'সাহিত্য-বিচার' কেমন ক'রে সম্ভব। লেখকের নাটক আলোচনার আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে তিনি চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপকে এ আলোচনা থেকে বাদ দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে এগুলি কাব্যই, নাটক-লক্ষণগ্রস্ত নয়।

গ্রন্থকার ভূমিকায় জানিয়েছেন যে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন “কবির ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে।” সে চেষ্টা যে তিনি কিছু করেছেন তার পরিচয় নিচের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে।—“জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি রবীন্দ্রনাথের বাল্যাবস্থায় নবজাগ্রত বাঙালী উচ্চমধ্যবিত্ত-মানসের লীলাক্ষেত্র ছিল।···তখন দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথের সামন্ত-পরিবারের প্রাচীর ধীরে ধীরে ভাঙিতেছে: ঠাকুরবাড়িতে যাহারা জমায়েৎ হইতেছেন, তাহারা নূতন উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাহাদের মানস ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নানান বিচিত্র সম্বন্ধের

১ পৃ. ২৮২।

লীলা ও আলোড়নই তাহাদের ঔৎসুক্যের বিষয়, এবং সেই সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের মানস ও ভাবকল্পনা মুক্তি পায়। সমাজ ও রাষ্ট্র-শাসনমুক্ত যে মানবত্ব সেই মানবত্বের পাঠ তাহারা লইয়াছেন তদানীন্তন বাঙলা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ধারা হইতে, এবং এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবত্বই তাহাদের কামনার বস্তু। স্বভাব ও সংস্কারের, অভ্যাস ও অহংকারের, সর্বপ্রকার শাসন ও বন্ধনের দাসত্ব হইতে মুক্ত যে মানুষ সেই মানুষের জয়গানই বাঙলাদেশের ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের একমাত্র ধর্ম, যাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল প্রথম পাদে রামমোহন এবং পরবর্তী যুগে তত্ত্ববোধিনী সভাকে কেন্দ্র করিয়া, এবং যাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ বাঙলাদেশে দেখা গেল বিংশ শতকের প্রথম পাদে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষের জয়গানই রবীন্দ্রসাহিত্যেরও ধর্ম এবং এই ধর্ম রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ভাবে ও রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোনও ভারতীয় সাহিত্যেই এই যুগে আর দেখা যায় নাই।”[১]

এই দশকে সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-সমালোচনা সম্পর্কিত যে-সব লেখা প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে ‘পরিচয়ে’র রবীন্দ্র-সংখ্যার প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যা প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ সালে, রবীন্দ্রনাথের ৮১ বৎসর পদার্পণ উপলক্ষ্যে। হরপ্রসাদ মিত্রের ‘গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধটি একটি বিশিষ্ট রচনা। গল্পগুচ্ছের মূল্যায়নে লেখক যথেষ্ট সূক্ষ্ম রসদৃষ্টির পরিচয় দেন। তিনি লেখেন, “ছোটগল্পের আঙ্গিকের প্রধান দুটি বিশেষত্বের একটি হলো objective বা নৈরাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী ; দ্বিতীয়টি গল্পের বক্তব্য ও পরিমাপ

১ পৃ. ২৯১।

নির্দেশক।...জীবনের বিশেষ একটি ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে নাটকীয় রীতিতে—এই হলো ছোটগল্পের আদর্শ।

"গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির মধ্যে এই আদর্শের নিখুঁত প্রকাশ চোখে পড়ে। কিন্তু সেইটাই বড়ো কথা নয়। মনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তার মননে, তার সৃষ্টিতে।...এইসব গল্পে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার আশ্চর্য প্রসার আমাদের মুগ্ধ করে। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের ভাঙা ইস্কুলের নগণ্য পণ্ডিত যে গল্পের নায়ক হতে পারে, এমন অদ্ভুত কথা গল্পগুচ্ছ পড়বার আগে কে-ই বা বিশ্বাস করতো? নিতান্ত সাধারণ, এবং অতিশয় সামান্যের মধ্যে অসামান্যের আবির্ভাব দেখা গেলো। এক রাত্রি, পোস্টমাস্টার, মাস্টারমশায়—আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের এই লেখাগুলি অতীতের একটা বিদ্রোহের মতোই আকস্মিক।...

"'বিচারক' এবং 'পুত্রযজ্ঞের' মধ্যে অবৈধ প্রেমের কথা আছে।... রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে যে দরদ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনার যে নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি যে নৈরাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেছে শরৎচন্দ্রের একাধিক পতিতা-জীবনীর ফলশ্রুতির সঙ্গে তা তুলনীয়।..."

পরিশেষে লেখক গল্পগুচ্ছের সামগ্রিক রূপায়ণ করেছেন এইভাবে—"চেকভের গল্প পড়ে গর্কি বলেছিলেন, এ যেন শরৎকালের এক বিষণ্ণ বিকেল। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে আমি দেখলাম পরিপূর্ণ একটি পৃথিবী,—হাসিতে-কান্নায়, শোকে-আনন্দে, কথায়-নীরবতায়, ত্যাগে-স্বার্থপরতায়, মৃত্যুতে-অমরতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি মানুষ; তাদের চারিদিকে দিনরাত্রির সনাতন লীলা, তাদের মাথার উপর অনন্ত আকাশের নীল, সেখানে কিছুই দেখা যায় না, শুধু অদৃশ্য এক বিধাতার অক্লান্ত হাত নিরন্তর তাদের জীবনের পট পরিবর্তন করে,—সেই হাত ঋজু ও বলিষ্ঠ, সেই বিধাতা রসিক এবং নির্মম—গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ।"

এ লেখা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করার যোগ্যতা অর্জন করে। পরিচয়-সম্পাদককে কবি লেখেন,

"আমার বয়স তখন অল্প ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয়নি, এই দুঃখ আমার মনে ছিল। এবার তোমাদের 'পরিচয়ে' এতদিন পরে আমি যথোচিত পুরস্কার পেয়েছি। তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, পুরোপুরি সম্ভোগের কথা। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না।"[১]

'রবীন্দ্রকাব্য আধুনিক কেন?' প্রবন্ধে শচীন সেন জানালেন, "সাধারণতঃ কালের গণ্ডীদ্বারা আমরা কাব্যের আধুনিকতা বিচার করি। সে কারণেই আমাদের দেশে আধুনিকতার উপাসক সমালোচকবৃন্দ রবীন্দ্র-কাব্যকে সেকেলে বলে প্রচার করেন। তাঁরা রবীন্দ্র-কাব্যের মর্মকোষে প্রবেশ করেন নি—শুধু রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার আত্মলীন ভাববিভোরতাকে উনিশ শতকের রোম্যান্টিক পর্যায়ে ফেলে এবং ঐকান্তিক আদর্শপ্রধান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় মনোজগৎকে বস্তুতন্ত্রহীন ভেবে রবীন্দ্র-কাব্যে আধুনিকতার মালমশলার অভাব অনুভব করেন।...

"কাব্য-সাহিত্যের আধুনিকতা বিচার করতে হলে মতের আশ্রয় নেওয়া অসঙ্গত। তাই কে কি মতবাদ প্রচার করলেন তা বিচার্য নয়—প্রশ্ন হল যে-সাহিত্য আধুনিক তার ভিতর গতি আছে কিনা। এই গতি যাঁর থাকে, তিনি নানা বাঁক ফেরেন এবং নানা মর্জির

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪০।

পরিচয় দেন। কাব্যসাধনার পক্ষে এই গতিই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং যে সাহিত্যে গতি আছে এবং যে সাহিত্য কোন বিশিষ্ট নীতি বা ধর্ম প্রচার করতে চায় না, সে-সাহিত্য চিরকালের আধুনিক।···

"রবীন্দ্র-কাব্যে মার্কসিজ্‌ম খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে না—হাটের হট্টগোল বা সাময়িক ফ্যাশন মিলবে না। তবুও রবীন্দ্র কাব্য সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। জীবনের আঘাতে জীবন জেগে ওঠে—রবীন্দ্রনাথের মত রূপদক্ষ একথা বিশ্বাস করেন এবং তিনি তা কাব্যে প্রচার করেছেন। এই দৃষ্টি আধুনিক দৃষ্টি—এই দৃষ্টি চিরকালের এবং সর্বলোকের সম্পদ।"

আর একজন মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের ফলশ্রুতি বিচার করলেন।[১] তিনি লিখলেন, "···মন তাঁর গতিধর্মী; কিন্তু সে কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমানায় এসে ঠেকল? তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব যার দ্বারা মানুষ অশান্তি-জর্জরিত হলো—তাকে কি তিনি কেবল ধর্মের প্রলেপ দিয়ে মুছে ফেলতে চান? ধর্মের সংহতিকারী শক্তি কি আছে, রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে আর কোনো আমূল পরিবর্তন কি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় নয়? দেখলুম না তো তাঁর রচনায় সে মানুষের স্বীকৃতি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে এ জগৎ সৃষ্টি করে। দেখলুম শুধু উদার অনুকম্পা। যে মানুষ আজ বুঝেচে যে এ জগৎ তারই আপন হাতের সৃষ্টি, সে নেবে অধিকার—অনুকম্পাকে সে অপমান জ্ঞান করে। রবীন্দ্রনাথ গতিধর্মী; কিন্তু সামন্তপ্রথা থেকে বুর্জোয়াতন্ত্রের গতিমুখে ধনশক্তি প্রতিভূদের নায়কতায় রাষ্ট্র ও সমাজবিধানেই কি ইতিহাসের পথে তাঁর দৃষ্টি থেমে গেলো?···"

এই সংশয়-প্রশ্নের পর লেখক মার্কসবাদীর দৃষ্টিতেও যে রবীন্দ্র-

---

১ বসুধা চক্রবর্তী : মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্যের মূল্য রয়েছে তা জানান। সে মূল্য কি, তার ব্যাখ্যা করা হল এইভাবে—"প্রাণোজ্জ্বল জীবনের বেগবান গতিপথ আমরা লাভ করব বিপ্লবের ভেতর দিয়ে, আগে নয়; কিন্তু অতীতের চড়া থেকে নৌকো ছাড়বার যে প্রেরণা, রবীন্দ্রনাথের নিকটে আমরা তা পেতে পারি। তারপর পথ যখন শেষ হবে না, মার্কস্‌বাদী সমাজ রূপ নেবার বেলায় আমরা নিরীক্ষণ করব রবীন্দ্রনাথে বুর্জোয়া সংস্কৃতির এক পরম বিকাশ। তার যা ভাবসম্পদ সে সব তখন জনগণের সামগ্রী হবে, বর্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্যাহত জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীগণ্ডীতে তার সার্থকতা সীমাবদ্ধ থাকবে না। সেই তো মার্কস্‌বাদীর পরম অভীপ্সা, মানুষের সব সুন্দর সৃষ্টিকে রক্ষা করা ও জনগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া। রাশিয়ায় মার্কস্‌বাদী নূতন ক'রে জনচিত্তে সেক্সপীয়র ও টলস্টয়ের আসন গড়ে দিচ্চে, ভারতের মার্কস্‌বাদীও কখনো সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের দান অস্বীকার করবে না—জনগণের মধ্যে বিপুল সার্থকতায় তাকে ভরে দেবে। সে আজ নয়; কিন্তু সেদিনে উত্তীর্ণ হবার পথেও কি বন্ধনমুক্তিতে অবিরত যাত্রাধর্মী বুর্জোয়া প্রাণশক্তির রবীন্দ্রনাথের সে বাণীর প্রয়োজন নেই?"

এই সংখ্যাতেই ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কবির 'আরোগ্য' ও 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে জানালেন, "...কলকাতায় এসে শুনলাম ও পড়লাম যে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি![১] এককালে

১ এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ রচিত 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা' (১৯৪০) পুস্তক দ্রষ্টব্য।—"যে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি, শান্ত সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের মলিন অবশিষ্ট ত্যাগ-সাধনার ও নূতন প্রবিষ্ট ধনতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পুষ্ট, তাতে 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া' এবং 'শেষের কবিতা'র উপন্যাস-গদ্যকবিতা সবই অবশ্যম্ভাবী..."—পৃ. ১১৯।

ছিলেন তিনি শেলী ও বায়রণ, আজ অন্য নাম অর্জন করেছেন! আমাদের মনের দাসত্ব কি কখনও ঘুচবে না? আমি এই মাত্র বলি ; ধরতাই বুলির নাগপাশে রবীন্দ্রনাথকে বাঁধতে গেলে নিজেদেরই অপমান করা হয়।"

'পরিচয়'-এ প্রকাশিত ধূর্জটীপ্রসাদের 'রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য'[১] লেখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটিতে লেখক আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব ও রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রমণ প্রয়াসের স্বরূপ বিচার করেছেন। তাঁর মতে, "সাহিত্যকে বাঙালী মোটামুটি ব্যবহারিক জগতের বাইরেই রেখেছে। লোক-সাহিত্যে নিশ্চয় দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন ঘটেছিল, কিন্তু গত শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই তার প্রতিপত্তি এতই কমে যায় যে আজ তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গবেষণার প্রয়োজন। এই অ-ব্যবহারিকতা রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনায় অ-পার্থিব অ-স্বাভাবিকতায় যে পর্যবসিত হয়নি সেজন্য সত্য, আনন্দ, মঙ্গল, সৌন্দর্য প্রভৃতি সার্বজনীন সাধারণ মূল্যের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে তাঁর গভীর বিশ্বাসই দায়ী। কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত লেখকের রচনায় এই প্রকার আন্তরিক বিশ্বাস ধরা দেয় না, এবং সেগুলির পরিবর্তে কোনো স্থির প্রতিজ্ঞারও সাক্ষাৎ মেলে না। তাই এই সব রচনায় নানা প্রকার দোষ বর্তাল। তাদের মধ্যে অর্থহীন ছন্দ-সুষমা, সংযমের ও বক্তব্যের অভাব ও প্রগলভতাই প্রধান।..."

যে গুণে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা সম্ভব তার একটা সূত্রও দিলেন লেখক।—

"রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার অর্থ তাঁর আদর্শবাদকে অগ্রাহ্য

[১] পরিচয় : ১৩৪৭, বৈশাখ।

করা নয়, কিংবা তার বদলে বস্তী ও 'বস্তুতান্ত্রিক' সাহিত্য উৎপন্ন করা নয়। গদ্যসাহিত্যে শরৎচন্দ্র থেকে 'কল্লোল' 'কালি-কলমে'র দল এবং পদ্যে মোহিতবাবু থেকে সমর সেন পর্যন্ত সকলেই সে চেষ্টা করেছেন ও বিফল হয়েছেন। বিষয়বস্তু উলটে দিলেই রবীন্দ্রনাথের ভাঁড়ার খালি করা যায় না। সাধারণ প্রতিজ্ঞার সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষ কখনও জয়ী হতে পারে না। বিশেষ থেকে কবিতার উপযুক্ত কার্য-বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বিশেষকে নিয়মাবদ্ধ করতে হয়, সে-নিয়মের রীতি মর্মে মর্মে বুঝতে হয়। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে গেলে অন্তরে বিশ্লেষণ-বুদ্ধি ও তার যুক্তিতে বিশ্বাসকে অধিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই তাঁর সর্বজনবিদিত লিরিক মনোভাব তাঁর তুলনা-উপমার প্রাচুর্যের বদলে বাক্য-ধর্মী ও গতিপ্রাণ কবিতা রচনা সম্ভব হবে।"

এই লেখাতেই ধূর্জটীপ্রসাদ জানালেন, "বাঙলাসাহিত্যের নিজেরও একটা বেগ ছিল যার পরিণতি রবীন্দ্রনাথে।" এ কথাকে লেখক ভেঙে বলেন নি, কিন্তু কথাটি প্রণিধানযোগ্য। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্য বিচার-আলোচনা করার কাজে কথাটি একান্ত স্মরণীয়।

॥ ১৪ ॥

[১৩৫০-১৩৬০ ; ১৯৪৪-১৯৫৪]

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব হয় ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ সাল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার একটা সুবিধা দেখা দিল এই যে এখন সমালোচকের মনে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব অস্তিত্ব কোনো প্রভাব বিস্তার করবে, এমন অবকাশ রইল না। এখন সমালোচক রবীন্দ্র-অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ হয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যকৃতির প্রতি পূর্ণদৃষ্টি দেবার নিরঙ্কুশ সুযোগ পেলেন। এই অবস্থার প্রভাব রবীন্দ্র-তিরোভাব পরবর্তী আলোচ্য দশকের রবীন্দ্র-সমালোচনায় দেখতে পাওয়া যায়। এই দশকের রবীন্দ্র-সমালোচনার আর একটি বিশেষত্ব হল রবীন্দ্র-সাহিত্যের শেষ পর্ব আলোচনার বিষয়ভুক্ত করা। তাছাড়া কবির অচলিত রচনা, বিশেষ করে কাব্যগ্রন্থগুলির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি পতিত হল।

এই দশকের শুরুতেই দেখা দিল নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা'র দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। কিছু পরিশোধিতও বটে। এবার গ্রন্থ রূপ নিল দুই খণ্ডে। এবং একটি তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে—সে ঘোষণাও করা হল। আলোচনা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখাকেই অন্তর্ভুক্ত করল। প্রথম সংস্করণের মূল কাঠামো সাধারণভাবে এ সংস্করণেও বজায় রাখা হল। আলোচনার পদ্ধতিও বহাল রইল, অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যকে বুঝতে চেষ্টা করা হল "কবির ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে।" এবার সে পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া হল[১] ;—"ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিবর্তন ইতিহাস"ই হয়েছে লেখকের লক্ষ্য। লেখক

---

১ পৃ ৮৪-৮৭।

হয়ত বলতে চেয়েছেন তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক পদ্ধতির সমালোচনা শুধু কালানুক্রমিক আলোচনা অথবা পরিবার-পরিবেশ তথ্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে না। অথচ নীহারবাবুর আলোচনায় এই দুটি জিনিসেরই প্রাধান্য দেখি।

প্রমথনাথ বিশী পূর্ণোদ্যমেই এই দশকে নিজেকে নিয়োজিত করেন রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায়। রবীন্দ্রনাথের অচলিত কাব্যগ্রন্থ ও নাটক এবার হল তাঁর বিষয়বস্তু। অচলিত কাব্যগ্রন্থগুলি নিয়ে যে আলোচনা তার নাম হল 'রবীন্দ্রকাব্য-নির্ঝর'। গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩৫৩।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল, লেখকের ভাষায়, "রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ও মানসের উৎসমূলে পৌঁছিবার চেষ্টা।"[১] এই চেষ্টার বশবর্তী হয়ে লেখক গ্রন্থের প্রথমে রবীন্দ্র-কাব্যের পরিবেশ নির্দেশ করেছেন, তারপর আলোচনা করেছেন কবির বাল্যকালের রচনা—'বনফুল', 'কবি-কাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' ও 'শৈশব-সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থগুলি। কবির অচলিত কাব্যগ্রন্থগুলির একটা আলোচনা সর্বপ্রথম প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ একদা প্রবাসীর পৃষ্ঠায় করেছিলেন।[২] তারপর সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে প্রমথনাথ বিশীর এই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

এই আলোচনায় সমালোচক যুক্তিসঙ্গতভাবেই অন্বেষণ করেছেন তৎকালীন রবীন্দ্র-মানস কোন কোন কবির দ্বারা কতোখানি প্রভাবান্বিত হয়েছে। কবির কাব্য তখন বিকাশোন্মুখ—এই সময়ে স্বভাবতই অন্যের প্রভাব অপরিণত কবিমানসে অধিকার বিস্তার করে। সমালোচক বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে দুএকটি দৃষ্টান্ত

১ ভূমিকা।

২ রবীন্দ্র-পরিচয়। প্রবাসী, ১৩২৮, মাঘ-চৈত্র ; ১৩২৯, জ্যৈষ্ঠশ্রাবণ।

দ্বারা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কতোখানি এই সময় বিহারীলাল, হেমচন্দ্র ও মধুসূদন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিহারীলাল ও হেমচন্দ্রের প্রভাব লেখক দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু মধুসূদনের তেমন কোনো প্রভাব তিনি দেখেন নি।—"তৎকালীন কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার প্রভাব একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।"[১]

কিন্তু এ-সব প্রভাব লেখকের মতে এহ বাহ্য, অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের 'বহির্লোকে মাত্র তা প্রতিফলিত হয়েছে এবং অতি অল্প-কালের মধ্যেই তিরোহিত হয়েছে। কিন্তু যে-সব কবিদের প্রভাব রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্লোক পর্যন্ত পৌঁছেছে তাঁরা হলেন বৈষ্ণব কবি, শেলী ও কালিদাস। লেখকের মতে, এঁদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কৈশোরপর্বে মাত্র পর্যবসিত নয়—ভিন্ন আকারে, সূক্ষ্মতর ভাবে ইঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সহচর হয়ে পরিণত বয়স পর্যন্ত চলেছে।[২]

রবীন্দ্রনাথের ওপর শেলীর প্রভাব সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "বিদেশী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপরে শেলির প্রভাব গভীরতম। অনেকের ধারণা 'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে শেলির প্রভাবের যুগ—বাস্তবিক তাহা নয়। 'কবি-কাহিনী' ও 'বনফুল'-এও শেলির প্রভাব অবিরল। শেলির সমাজ-সহিষ্ণুতা তাঁহার শ্রেণীবর্ণশাসনহীন সমাজ-পরিকল্পনা, তাঁহার মানবহীন বিশুদ্ধ প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ, আর প্রকৃতির হাতেই যে মানবজীবনের সর্বদুঃখের সর্বৌষধি আছে এই ধারণা—এসমস্তই পূর্বোক্ত দুই কাব্যে আছে। শেলির ভাব ও অলংকারের আতিশয্যজাত অসংযম, ছবির পরে ছবি আঁকিয়া

১ পৃ. ২৫।

২ পৃ. ২৬ দ্রঃ।

রেখান্যাস অস্পষ্ট করিয়া ফেলা, রঙের পরে রঙ ঢালিয়া সব ঝাপসা করিয়া দেওয়া—শেলির এই সব শিল্পরীতির অনেকগুলিই 'কবি-কাহিনী' হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"[১]

কাব্যগ্রন্থগুলি আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে চেয়েছেন, এবং তাঁর অন্বেষণ প্রায় প্রতিপদেই চেয়েছে এইকালের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের ছবি পেতে। এই বিশ্লেষণেই তাঁর শক্তি নিয়োজিত করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কাব্যে পরবর্তী পরিণত কাব্যের অঙ্কুর আছে, এমন কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেগুলি কি? বিবাহ ও প্রেম দুটি স্বতন্ত্র বস্তু; একটি সাংসারিক প্রথা, একটি মানসিক অবস্থা: ...রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'আমার তো মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।' বিবাহ সাংসারিক প্রথামাত্র বলিয়া সসীম, প্রেম মানসিক রসমাত্র বলিয়া সীমাহীন—এ দুয়ের সামঞ্জস্যের চেষ্টা, ঐ সীমার মধ্যে অসীমের সমন্বয়ের চেষ্টা ছাড়া আর কি?...প্রথম কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত এই সমস্যা কবিকে ভাবিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্যা পরবর্তী কবি-কাহিনী ও ভগ্নহৃদয়েও আছে।"[২]

শৈশব-সংগীত আলোচনার প্রারম্ভে লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের লিরিকের ও নাটকের প্রকাশ-তারিখের তুলনামূলক একটা তালিকা পাশাপাশি স্থাপন করেছেন, এবং দেখিয়েছেন যে এ সময় নাটক ও লিরিক সমান্তরালভাবে চলেছে, কিন্তু লিরিকের চেয়ে নাটকের পরিণতি ও পূর্ণতা তাঁর প্রতিভায় অনেক আগে ঘটেছে।

১ পৃ. ২৭।

২ পৃ. ৪৭-৪৮।

লেখক এর কারণ নির্দেশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন।—"সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য জীবন-পরিচয় দরকার; সে পরিচয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত হইতে পারে, কিম্বা অপরের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাইতে পারে। এই জীবন-পরিচয়ের ঐকান্তিক অভাব শৈশব-সংগীতে···এই সময়ের নাটক যে অনেক বেশি পরিণত তাহার কারণ জীবন-পরিচয়ের জন্য এখানে কবিকে নিজের অভিজ্ঞতার জগতে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় নাই। নাটকের গল্পাংশেই তিনি তাহা হাতের কাছে পাইয়াছেন। এই গল্পাংশ অর্থাৎ অপরের জীবনের অভিজ্ঞতা—কবির পক্ষে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা—অবলম্বন করিয়া তিনি শিক্ষাসমুদ্রে পাড়ি দিয়াছেন; শৈশব-সংগীতের খড়কুটা দিয়া তাহা করা সম্ভব হয় নাই।"[১]

এই আলোচনায় রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-শিল্পকে তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় নি। অথচ এর প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথের অচলিত রচনা যেকালে রচিত সেকালের সাহিত্য-পরিবেশ ও রুচি একালের থেকে রীতিমতো পৃথক ছিল। সেই পরিবেশে রবীন্দ্র-মানস ও শিল্প কতোখানি অভিনব বৈশিষ্ট্যে দেখা দিয়েছিল তা তৎকালীন সাহিত্যবস্তু ও রচনাশৈলীর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারাই জানা সম্ভব। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি-কাহিনীর সমালোচনায় এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে। এই রকম আলোচনায় কবির এই কাব্যগ্রন্থগুলির বিচার আরো বিষয়ানুগ হত। কিন্তু তা হয় নি, তার কারণ বিশী মহাশয়ের মনোযোগ খুব সামান্যই কাব্যবস্তুর প্রতি; তাঁর গোটা মনোযোগই কবি-মানসে। কিন্তু শুধু কবি-মানসের বিশ্লেষণে কাব্যের উৎস হয়ত জানা যায়, সেই উৎস থেকে যে নির্ঝর প্রবাহিত হয়েছে তার রূপের

---

১ পৃ. ১০৪-৫।

পরিচয় ও উপভোগ-সংবাদ অজানাই থাকে। রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর-এ এই অভাবজনিত ত্রুটি খুবই স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের গোটা নাট্যসাহিত্যের একটা বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থ-কলেবরে প্রথম প্রকাশ করার কৃতিত্ব বিশী মহাশয়েরই। দুইখণ্ডে রচিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' রবীন্দ্র-সমালোচনা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাট্যকৃতিকে কালানুক্রমিক ভাবে বিচার করা হয় নি। রবীন্দ্রনাট্যের বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী ও রূপকর্ম কিভাবে বিভিন্ন পর্বে বিকশিত ও অভিব্যক্ত হয়েছে তার কোনো পরিচয় এ গ্রন্থে তেমন নেই। এ সমালোচনার উদ্দেশ্য আলাদা। প্রস্তাবনায় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা হয়েছে।—"সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের লীলাই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ …সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের সমাধান কিভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে তাহা সাহিত্যসমালোচকের এলাকা বহির্ভূত, এ দুইয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অনুসরণই সমালোচকের কর্তব্য—রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে তাহাই করিবার চেষ্টা হইয়াছে।"

এ গ্রন্থের প্রধান বিশেষত্ব যা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'কাব্যনাট্য' পরিচ্ছেদ। এই অংশে রবীন্দ্রনাথের সেই-সব রচনাগুলি আলোচিত হয়েছে যা এর পূর্বে বাংলা সমালোচনায় হয় অবহেলিত হয়েছে, নয় কাব্যহিসেবে বিচার করা হয়েছে। তবে এগুলি কেন কাব্যনাট্য হিসেবে শ্রেণীবিভক্ত বা অভিহিত করা হয়েছে তার কোনো সঙ্গত কারণ লেখক স্পষ্ট করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, "এগুলিকে কাব্যনাট্য বলিবার তাৎপর্য এই যে, কাহিনী-রীতি এবং নাটকীয়-রীতির সমন্বয়ে এগুলি গঠিত।"[১] তাঁর

১ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, ২য় সং (১৩৫৫), পৃ. ১৫।

সংজ্ঞায়, "কাব্যনাট্য কাহিনী ও নাটকের মিশ্ররীতির রচনা।"[১] কিন্তু কাব্যনাট্য কি তাই? কাহিনী ও নাটকের মিশ্ররীতির রচনা গদ্যনাট্যও তো হতে পারে। কাব্যনাট্য প্রকৃতপক্ষে একটা বিশেষ নাট্যরূপ কি না সে বিচার গভীরভাবে করার প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরস-সৃষ্টির দক্ষতা সম্পর্কে লেখক যে মূল্যায়ন করেছেন তা হল এই—"রবীন্দ্রনাথ কখনোই বিশুদ্ধ নাটকীয় কৌশলকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। নাটকের মূল রহস্য এই যে, নাট্যকারকে একই সঙ্গে নাটকের পাত্রপাত্রীর মনের গভীরতার মধ্যে তলাইয়া যাইতে হইবে আবার সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটিকে অনিবার্য পরিণামের দিকে দুর্নিবার বেগে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। গতির এই দ্বিত্ব, গভীরতামুখী ও পরিণামমুখী, শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে এই দুই গতিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারেন না, অন্তত সম্পূর্ণভাবে, সুনিপুণভাবে পারেন না। তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক প্রাণতা অন্তর্মুখী, পাত্রপাত্রীর মনের গভীরতার দিকে তাঁহার ঝোঁক বেশি ; নাটকীয় পরিণামমুখী সক্রিয় সচলতার প্রতি তাঁর একটা অবহেলার ভাব আছে, কাজেই বিশুদ্ধ নাটকে এই দ্বিত্বগতির বিপরীতমুখী প্রেরণায় তাঁহার প্রতিভা যেন আংশিক বাধাগ্রস্ত ; কখনো কখনো অলৌকিক শক্তির সাহায্যে কতক পরিমাণে তিনি সফলতা লাভ করিয়াছেন, যেমন রাজা ও রাণীতে মালিনী ও বিসর্জনে।"[২]

কিন্তু এই সাফল্য রাজা ও রাণী এবং বিসর্জনে কীভাবে দেখা দিয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। এবং এও আশ্চর্য যে এই দুই রচনার কোনো নাট্যগত সমালোচনা গ্রন্থে স্থান পায় নি।

১ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, ২য় সং (১৩৫৫)। পৃ. ১৫।

২ পৃ. ১৬।

যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা 'ঋতু-চক্র' নামক পরিচ্ছদে[১] স্থান পেয়েছে। এই পরিচ্ছদে লেখক দেখাতে চেয়েছেন রবীন্দ্র-নাথের কতকগুলি নাটকে 'মানবলীলা ও ঋতুলীলার ভাবের কি রাখী-বিনিময়' হয়েছে। অচলায়তন, বিসর্জন, শারদোৎসব, ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, ফাল্গুনী, এবং রাজা ও রাণী, তপতী সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "এই কয়খানি নাটক মনোযোগ দিয়া পড়িলে দেখা যাইবে—ইহাদের ভিতর দিয়া বৎসরের ঋতুচক্র ঘুরিয়া আসিয়াছে—এবং আবর্তন গতানুগতিক মাত্র নয়—প্রত্যেক নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে এক-একটি ঋতুর ভাবসংযোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ নাটকের মানব-পাত্রপাত্রীর জীবনে যে লীলা চলিতেছে প্রকৃতির পরিবেশে সেই একই ভাবের লীলা—প্রকৃতি ও মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক···।"[২] এই দৃষ্টিতে লেখক বিসর্জনকে দেখেছেন বর্ষাকালের নাটক, এবং বসন্তের নাটক রাজা ও রাণী।

এই আলোচনায় পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্মতা থাকতে পারে, কিন্তু নাট্য-সমালোচনায় এর মূল্য যৎসামান্য। বিসর্জন এবং রাজা ও রাণীর মতো নাটকের কেবলমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গীজাত আলোচনা নাটকীয় হতে পারে, কিন্তু নাট্যগত নয়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে যে-সব নাটক আলোচিত হয়েছে, গ্রন্থকার তাদের নাম দিয়েছেন তত্ত্বনাট্য। এ নামকরণ নূতন। এবং লেখক তাঁর স্বেচ্ছাকৃত নামকরণের কৈফিয়ৎ-স্বরূপ বলেছেন, "এই পর্যায়ের নাটকগুলিকে নানা জনে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। রূপক, সাঙ্কেতিক, প্রতীকী, সমস্যামূলক প্রভৃতি বিচিত্র নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিলেই দেখা যাইবে ইহাদের কোন একটি

১ প্রথম খণ্ড

২ পৃ. ১২৯।

নামের দ্বারা সমগ্র পর্যায়টির প্রকৃতি বর্ণনা সম্ভব নয়। ইহাদের কোন কোন নাটক রূপক (আংশিক রূপক), কোন কোন নাটক প্রতীকী বা সাঙ্কেতিক এবং কোন নাটককে সমস্যামূলক বলা চলে সত্য, কিন্তু তাহাতে নাটকবিশেষের প্রকৃতিমাত্র প্রকাশ পায়, সমগ্র পর্যায়ের প্রকৃতি প্রকাশ পায় না। এই অসুবিধার জন্যই সমগ্র পর্যায়টার প্রকৃতি প্রকাশ করিতে পারে এমন একটি সামান্য বা সাধারণ নামের অভাব অনুভব করিতে থাকি। 'তত্ত্বনাট্য' সেই অভাব দূর করিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কোন নাটক রূপক, প্রতীকী বা সমস্যামূলক যেমনি হোক তাহা যে তত্ত্বপ্রধান সন্দেহ নাই। ইহাই এই শ্রেণীর নাটকের সামান্য বা সাধারণ লক্ষণ। প্রকৃতির প্রতিশোধ বা মুক্তধারাতে পার্থক্য যতই হোক দুয়ের মধ্যেই তত্ত্বের প্রাধান্য অবিসম্বাদী। আবার ফাল্গুনী ও কবির দীক্ষায় পার্থক্য যতই প্রকট হোক—দুয়ের ঘনিষ্ঠতা তত্ত্বের প্রাচুর্যে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বের প্রকটতা ও প্রাচুর্য এইসব নাটকের শ্রেণীলক্ষণ।"[১]

এই তত্ত্বনাট্যগুলির সমস্যাসমূহকে নির্গলিত ক'রে লেখক তিনটি সমস্যা পেয়েছেন। সেগুলি হল—(১) মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক ; (২) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ; (৩) মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক।[২]

এই নাটকগুলির আলোচনায় লেখক নাটকের তত্ত্বব্যাখ্যা, চরিত্র বিচার, নাটকের পরিবেশ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই করেছেন, কিন্তু তাদের প্রকৃত নাট্যগত বিচার করেন নি। তাদের নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও নাটকগত গতি-প্রকৃতি কীভাবে ও কতোখানি ফুটে উঠেছে সে বিচার-বিশ্লেষণ পাই না। ফলে, লেখক পরিশেষে এই তত্ত্বনাট্যগুলির যে দোষের

---

১ পৃ. ১।

২ পৃ ৬ দ্রঃ।

বর্ণনা দিয়েছেন, তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। লেখক বলেছেন, "তত্ত্বনাট্য (রূপক, সাঙ্কেতিক প্রভৃতি নাটক, বা যে কোন জাতীয় তত্ত্ব রচনা, যাহা নিছক তত্ত্বমাত্র নয়, তত্ত্বমূলক শিল্প) একাধারে জীবন-তত্ত্ব ও জীবনচিত্র হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এইসব রচনায় তত্ত্ব ও শিল্প স্বতন্ত্র থাকিলে চলিবে না—দুই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়া এক ও অচ্ছেদ্য হইয়া যাওয়া আবশ্যক।··· রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে তত্ত্বও আছে চিত্রও আছে কিন্তু কদাচিৎ দুটি এক ও অচ্ছেদ্যরূপে দেখা দিয়াছে। এইসব রচনায় তত্ত্ব ও চিত্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইবার ফলে কখনো তত্ত্ব চোখে পড়ে, কখনো চিত্র চোখে পড়ে, কিন্তু কদাচিৎ তত্ত্ব ও চিত্র অচ্ছেদ্য শিল্পরূপে একত্র চোখে পড়ে। সমস্ত নাটকেই তত্ত্বের ভার এমন গুরুতর যে, জীবনচিত্রের উপরে তাহাদের যেন চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে—চিত্রতত্ত্বকে বহন করিতে পারে নাই, পীড়িত হইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছে—কাজেই দুইকে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের চোখে পড়ে।"[১] নাটকগুলির সম্পর্কে এই যে রায় দেওয়া হল, প্রশ্ন হতে পারে, এই রায় কোন্ বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত? লেখক কোনো বিচার না ক'রে মনগড়া ধারণা বশবর্তী হয়ে রায় দিয়েছেন। সাহিত্য-সমালোচনায় একেই বলতে পারি কাজীর বিচার।

রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়যোগ্যতা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "রবীন্দ্রনাটকের কাব্যরস, মানবরস ও বিচিত্র নরনারীর লীলাকে স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প নয়।"[২] কেন নয়, তার কারণ হিসেবে বলেছেন, "এগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অনির্বচনীয় জাদুমন্ত্রের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ওঠে নাই। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জাদুপূত হইলেই যে উচ্চশ্রেণীর নাট্যশিল্প সৃষ্টি হয় একথা বলিতেছি

১ পৃ. ২০১ এবং ২৩৩।

২ প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

না, বলিতেছি যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রভাবের বাহিরে কখনো পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক অসাধারণ, কিন্তু ঐ অসাধারণত্বেই তাহার ত্রুটি, সাধারণের নিকট কিছু পরিমাণে নতি স্বীকার করিলে তবেই এগুলি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প হইয়া উঠিতে পারিত। কাজেই, আমার আশঙ্কা এই যে, দেশে যতই শিক্ষা বিস্তারিত হোক, রুচি যতই উন্নত হোক, রবীন্দ্রনাটক কখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বস্তু হইয়া উঠিবে না। এগুলি অত্যন্ত বেশিভাবে এককের সৃষ্টি। নাটক যৌথ-শিল্প, তাহা যদি উগ্রভাবে এককের সৃষ্টি হয়, তবে তাহার একঘরে হইয়া থাকার আশঙ্কাই প্রবল।"[১]

রবীন্দ্র-নাট্যশিল্প সম্পর্কে এই রায় দেওয়া হয়েছে নাট্যশিল্প সম্বন্ধে অতি চিরাচরিত ধারণার বশবর্তী হয়ে। নাট্যশিল্পের আধুনিক সমালোচনা স্মরণে রাখে নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের আধুনিক বিবর্তন ও অবস্থা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ যেকালে শুধু অর্থগৃধ্নু প্রমোদকেন্দ্র সেকালে প্রকৃত নাট্যসাহিত্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চের 'অনির্বচনীয় জাদু-মন্ত্রের দ্বারা পুষ্ট' হ'তে চায় না, কারণ সে জানে সে-জাদুমন্ত্র নিতান্তই অলীক, অ-নাট্যকে নাট্যরূপে প্রচার করার মোহ-সৃষ্টি মাত্র। এ যুগের নামকরা নাট্যসাহিত্য তাই অ-সাধারণ মঞ্চ মারফৎই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ও করছে। রবীন্দ্রনাটকও যদি সাধারণ মঞ্চের বস্তু না হয় তাতে আশঙ্কার কিছু নেই; আশঙ্কার কারণ হবে যদি রবীন্দ্রনাটক অ-সাধারণ মঞ্চেরও বস্তু না হয়।

১৩৫৪ সালে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা —প্রথম খণ্ড (কাব্য)' নামে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-রচনাবলীর যে আলোচনা প্রকাশিত হয় তারই দ্বিতীয় সংস্করণ 'রবীন্দ্র-কাব্য-

১ প্রথম খণ্ড, পৃ ১৭৫।

পরিক্রমা' নামে প্রকাশিত হয় ১৩৬০ সালে। গ্রন্থটি বৃহৎ কলেবর। প্রায় সাত শ' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই গ্রন্থে লেখক যা করতে প্রয়াস পেয়েছেন তার চুম্বক ভূমিকায় নিবেদন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, "এক বিরাট কবি-প্রতিভা ষাট বৎসরের অধিককাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে বিভিন্ন রূপে, বিচিত্র ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সৃষ্টিস্রোতের বাঁকে বাঁকে কবি-মানসের যে ক্রম-বিবর্তমান রূপ-বৈচিত্র্য, ভাব-কল্পনার যে নব নব অভিব্যক্তি ও বর্ণচ্ছটার বিকাশ হইয়াছে, তাহারই বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করিয়া নিরন্তর সৃষ্টি-শীল ও ক্রম-অগ্রসরমান কবি-মানসের সম্যক্ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যে কবিত্বোন্মেষের সময় হইতে শেষ রচনা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সমস্ত কাব্যগ্রন্থগুলির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য ও ক্রম-পরিণতি আলোচিত হইয়াছে এবং প্রায় চারিশত প্রধান প্রধান কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা মর্মার্থ দেওয়া হইয়াছে।"

এক কথায়, এই গ্রন্থ হল রবীন্দ্র-কাব্যের running commentary এবং এই commentary বা ব্যাখ্যা রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র কাব্যকে ভাবের দিক থেকেই গ্রহণ করেছে। ফলে, রবীন্দ্র-মানসের 'সম্যক' পরিচয় প্রদানের চেষ্টা কেবলমাত্র কবিতার মর্মার্থ ব্যাখ্যাতেই সীমিত থেকেছে। লেখক এক জায়গায় বলেছেন, "অজিতকুমার চক্রবর্তীই প্রথম রবীন্দ্র-কাব্যে কবি-মানসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করিয়া আলোচনা করেন। এখন পর্যন্তও কোনো সমালোচক তাঁহার বিচারের অতিরিক্ত বিশেষ কোনো নূতন আলোক-সম্পাত করিতে পারেন নাই।"[১] একথা লেখকের সম্বন্ধেও বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। তিনিও কোনো নূতন চিন্তা অথবা কাব্য-বিচারের

১ পৃ. ২১৫।

নিদর্শন স্থাপিত করতে পারেন নি; অন্ধভাবে অজিতকুমারকেই অনুসরণ করেছেন, এবং দু-এক জায়গায় অজিতকুমারের নজির এমন-ভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে তাঁর বক্তব্য প্রায় হাস্যাস্পদ ঠেকে। যেমন, সোনার তরীর যে ভাব-ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তার পরে তিনি জানিয়েছেন যে "অজিতকুমারও সোনার তরী কবিতাটি এইভাবেই বুঝিয়াছেন।"[১] সুতরাং আমাদের স্বীকার করতেই হবে লেখক যেভাবে বুঝেছেন তা সঠিক ও মূল্যবান, কারণ অজিতকুমারও যে সেইভাবে বুঝেছেন!

সমগ্র আলোচনা যেভাবে করা হয়েছে তাতে মনে হয় এ গ্রন্থের আসল উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনসাধক রবীন্দ্র-কাব্যের টীকা প্রস্তুত করা। এ টীকা শুধু রবীন্দ্র-কাব্যের ভাবার্থ অন্বেষণ করেছে। কিন্তু কেবল কবিতার বিশেষ অর্থ বিশ্লেষণ করাই কি কাব্য-পরিক্রমা কিংবা কাব্য-বিচার?

তা যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য' গ্রন্থে।[২] এই গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনার যে পন্থা অবলম্বন করেছেন সে-সম্বন্ধে ভূমিকায় বলেছেন, "এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' নামক কাব্য-সংগ্রহের কবিতা-গুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার কবি প্রতিভার স্বরূপ-সন্ধান এবং সেই সঙ্গে অধিকাংশ কবিতার ব্যাখ্যা ও সমালোচনা থাকিবে। ঐরূপ একটি নির্বাচনের সাহায্যে গীতি-কবি রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা ও কাব্য-কলার পরিচয়-দান যুক্তিযুক্ত তেমনই সুসাধ্য। এইজন্য আমি অনেক চিন্তার পর এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। ইহার

১ পৃ. ২১৫।

২ প্রকাশকাল ১৩৫৯-৬০। দুই খণ্ড।

প্রধান সুবিধা এই যে, কোথাও কবিতাকে ছাড়াইয়া কবির সম্বন্ধে উপর হইতে কোন স্বকল্পিত আলোচনা করিতে হইবে না, প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত কবিতার সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে। আমি রবীন্দ্র-কাব্যের এই যে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি, তাহাতে কবির ব্যক্তিগত ভাব-জীবনের ধারা অনুসরণ করা আমার কর্তব্য হইবে না; আমি মুখ্যতঃ কাব্য-পাঠই করিব, কবিকে পাঠ করিব না। তথাপি রবীন্দ্রনাথের মত আত্মস্বতন্ত্র কবির কাব্যরস বিচারে, কাব্যের অন্তরালে কবি-মানসের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।...কবির ব্যক্তিধর্ম যাহাই হোক, তাঁহার সেই ব্যক্তি-জীবনের ভাবনা ও চিন্তা, সংশয়-বিশ্বাস যেমনই হোক, সেই সকলের ভাষ্যরূপে কবিতা পাঠ করিব না; অথবা কবিতার মধ্যে তাহারই সন্ধান করিব না। তৎপরিবর্তে আমি দুইটি কাজ করিব—(১) কবিতার ভাব হইতেই কবি-প্রকৃতি তথা কবি-মানসের পরিচয় করিব; (২) কবিতার রস-নিবেদন ও বাণীরূপ দর্শন করিব।"

কবিতার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা আলোচনার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা—যাকে আধুনিক সমালোচনার ভাষায় বলা হয় Practical Criticism—রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় এই প্রথম দেখা দিল। এই প্রথম কবিতার মাধ্যমে কবি-প্রকৃতি, কবি-কল্পনা ও কাব্য-কলার পরিচয়-দানের চেষ্টা করা হলো। কবিতা যখন কেবলমাত্র ভাব অথবা রূপ নয়, ভাব ও রূপের মিলন, তখন কাব্য-সমালোচনায় সেই ভাব ও রূপের আলোচনা যুগপৎ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোহিতলাল নিজে কবি ব'লেই এমন আলোচনা অতি সহজেই করতে পেরেছেন। তিনি সঞ্চয়িতার বিন্যাস অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির এক একটিকে নিয়ে তাদের সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিয়েই তাদের কবিতাগুলিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, এবং শেষে এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মারফৎ প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা ও

কাব্য-কলার যেসব সাধারণ নিদর্শন ফুটে উঠেছে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ আলোচনা যে কত মনোজ্ঞ এবং প্রকৃত কাব্য-রস-সংবেদ্য তার পরিচয় গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে।

লেখক একস্থানে বলেছেন, "কিন্তু কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপাদান ভাষা; কবিদৃষ্টির মৌলিক ভঙ্গি অনুরূপ ভাষার অপেক্ষা রাখে; এই ভাষা প্রত্যেক বড় কবিকে নিজেই গড়িয়া লইতে হয়। আমরা রবীন্দ্র-কাব্যের অভিনব কবি-মানস ও ভাব-কল্পনার পরিচয় করিয়াছি, কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ঐকালে ইতিমধ্যেই বাংলা গীতিকাব্যে একটি নূতন ভাষার আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ ভাষা কবিতার ভাষা—সাধারণ সাহিত্যকর্মের ভাষা নয়—সে এক স্বতন্ত্র বস্তু। কথাটা বিলাতী, অর্থাৎ আধুনিক কাব্যশাস্ত্রে পুরানো হইলেও, আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় এখনও বিচারযোগ্য হয় নাই।"[১] আমাদের সাহিত্য-সমালোচনার এই ত্রুটি মোহিতলালের স্বচ্ছদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তাই রবীন্দ্র-কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্র-কাব্যের ভাষার আলোচনাও তিনি করেছেন। তিনি Bradley-র কথা স্মরণ করেছেন যাঁর মতে "Poetry is an art of language, and the born poet of whatever size, is a person who has a peculiar gift for translating his experiences—what ever he sees, hears, feels, imagines—into metrical language,—a special necessity in his nature to do this, and a unique joy in doing it well."

কবিতার ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাও স্মরণ করেছেন, যেখানে কবি বলেছেন, "কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো

১ প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিবার চেষ্টা করে।···কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষের যে কথা দিয়া কবিতা লিখিতে হয়, সে কথার যে মানে আছে। এই জন্যই তো···কবিকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে যাহাতে কথার ভাবটা বড়ো হইয়া কথার অর্থটাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবটা তত্ত্বও নহে, বিজ্ঞানও নহে, কোনপ্রকার কাজের জিনিসও নহে, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মতো অন্তরের চেহারা মাত্র।" [জীবন-স্মৃতি, পৃ. ১৪৯-৫০।] লেখক এর পর মন্তব্য করেছেন, "ঐ শেষের কথাটি এবং ঐ উপমা যেমন সুন্দর, তেমনই সার্থক হইয়াছে। তবু তাঁহারাই কাব্যপাঠ করিবার সময়ে কত তত্ত্ব, কত ism-এর দোহাই দিতে হয়!"[১]

কবিতার ভাষার সঙ্গে ছন্দের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সেই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "ছন্দের অভিনবত্ব বা ধ্বনিবৈচিত্র্যই কাব্যসৃষ্টির দিক দিয়া মূল্যবান নহে ; ছন্দের ঐ ধ্বনিও—ভাষার মত—ভাবের যথাযথ প্রতিরূপ হওয়া চাই। কবি যে কোন-এক ছন্দকে কবিতার বাহন করেন তাহা সেই ছন্দেরই খাতিরে নয়—কবিতার সুগভীর প্রয়োজনে। এইজন্য কাব্যরস আস্বাদনের যেমন, কাব্যরস-বিচারেও তেমনই—ছন্দকে সেই সেই রসের অত্যাবশ্যক উপাদানরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে, তাহারও রস আস্বাদন করিতে হইবে। নতুবা, কবিতার ছন্দকে ছুতার-মিস্ত্রীর মাপকাঠি দিয়া মাপিয়া তাহার একটা গণিত-তত্ত্ব নিরূপণ করিলে—কাব্য-সরস্বতীও যেমন, কবিও তেমনই নিগৃহীত হন ; আশ্চর্য নয় যে, সেই সকল পণ্ডিতের প্রায় কাহারও কিছুমাত্র কাব্যরসবোধ নাই।···ছন্দকে যে ভাষা হইতে পৃথক করা যায় না তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে না, বা বুঝিতে চায় না।

১ প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯১।

অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যে যে ঐরূপ করা যায়, বা উহা পৃথক হইয়াই আছে, তাহা একটু দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারি। সেখানে কবিরা ভাবের উপযোগী ছন্দ নয়—আদৌ একটা যে-কোন ছন্দ সুবিধামত বাছিয়া তাহারই উপরে কথাগুলিকে সাজাইয়া দিয়া থাকেন; ভাবের সঙ্গে ভাষারও যেমন অন্তরঙ্গ যোগ থাকে না, ছন্দও তেমনই ভাবকে ছাপাইয়া কবিতার একটা অতিরিক্ত ভূষণের মত, শ্রুতিমাত্র সচেতন পাঠকের কর্ণতোষণ করে। কবির কাব্য-প্রেরণা মৌলিক বা নিজস্ব নয় বলিয়া তাহার কোন ছন্দোবৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয় না।···

"দ্বিতীয়তঃ, ঐ ছন্দও কেবল একটা মাপযন্ত্র নয়, তাহাকেও কবিতা-বিশেষের ভাব ও ভাষার বিশিষ্ট সুরে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে হয়; অর্থাৎ, তাহার সেই সাধারণ ছাঁদটিও কতক পরিমাণে কবিতার রঙে রঞ্জিত হইয়া যায় তাহাতেই ছন্দের সুরবৈচিত্র্য ঘটে; তাহার সেই কাঠামোখানা যেন কবিতার মধ্যে ডুবিয়া থাকে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মানসী'তেই আছে, যথা—

উরসে পরি যূথির হার
বসনে মাথা ঢাকি'
বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে
গন্ধটুকু সন্ধ্যা বায়ে
রেখার মত রাখি'। [অপেক্ষা]

এবং

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।

অন্ধকারে, সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে,
নৃত্যময় চিত্ত হ'তে
মত্ত হাসি টুটে। [দুরন্ত আশা]

—দুইটি কবিতার ছন্দ একই ; কিন্তু ধ্বনি ও সুর কত ভিন্ন ! ছন্দ-শাস্ত্রীদের ছন্দ-পাটিগণিতে এই রহস্য ধরা দিবে না। এখানে ছন্দের ছন্দত্ব কাব্যের রসরূপে বিলীন হইয়াছে, কোন মাপকাঠিতে ঐ রস মাপা যাইবে না। ভাবের সঙ্গে যেমন ভাষার সাযুজ্য, তেমনই সর্বত্র ঐ দুয়ের সহিত ছন্দেরও সাযুজ্য চাই বলিয়া, কোন বাঁধা-ছন্দ কবির কবিতা-বিশেষের প্রেরণায় আবির্ভূত হয়, তখন তাহার সেই সাধারণ ভঙ্গিটিও একটা নূতন সুরের সঙ্গতি রক্ষা করে। অতএব প্রতি ছন্দের যে বাঁধা মাপ আছে, তাহা ভাষার প্রলেপে নূতন নূতন ধ্বনি-রস সৃষ্টি করে—কবির হাতে ছন্দের যাদুশক্তির পরীক্ষা হইয়া থাকে। 'মানসী'তে তাহাও হইয়াছে।"[১]

মোহিতলালের এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হল এই যে এখানে রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনা রবীন্দ্র-কাব্যপাঠের মাধ্যমেই ঘটেছে। এবং কবিতা পাঠকালে লেখক কেবলমাত্র কবিতার বিষয়বস্তু বা তত্ত্ব বিশ্লেষণেই নিজেকে সীমিত রাখেন নি, তিনি প্রকৃত রসিকের দৃষ্টিতে কবিতার ভাব-কল্পনা, এবং তার সঙ্গে যে রূপকর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে, তার বিচার ক'রে রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণগুলির পরিচয় সাধন ও মূল্যায়ন করেছেন। বিশুদ্ধ কাব্য-সমালোচনার এমন সফল প্রয়াস এই প্রথম। দুঃখ এই যে মোহিতলাল তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে যেতে পারেন নি। তাঁর এ আলোচনা শুধু 'চৈতালি' পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। যদি তাঁর আরব্ধ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারতেন তাহলে এ যুগের রবীন্দ্র-কাব্য সমালোচনা এক অপূর্ব মহিমায় পূর্ণ হয়ে উঠত।

---

১ প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৮-৭৯।

মোহিতলালের যে দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সমালোচনায়। এই কারণে বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনায় একটি মূল্যবান সংযোজন। এ গ্রন্থের প্রকাশকাল যদিও ১৩৬২ সাল, গ্রন্থের অন্তর্গত রচনাগুলি বেশ কিছু কাল পূর্বেই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল গল্পগুচ্ছ, গোরা, শেষের কবিতা, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, দুই বোন, মালঞ্চ, ও চার অধ্যায়। কিন্তু গতানুগতিক সমালোচনার মতো এ গ্রন্থে নেই শুধু কাহিনী-ব্যাখ্যা ও চরিত্র-চিত্রণ পরিচয়, কিম্বা কাহিনী-নিহিত কোনো তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। এ সমালোচনায় মনে রাখা হয়েছে যে সাহিত্যের আলোচনায় ভাব এবং রূপ দুটোর মূল্য সমান। তাই দেখি গল্পগুচ্ছের মূল্যায়নে লেখক গল্পগুচ্ছের রচনারীতির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। এই আলোচনা গল্পগুচ্ছের আবেদন কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছে তা বোঝা যাবে একটি উদ্ধৃতি থেকে।—" 'গল্পগুচ্ছে' বিশেষণ ও উপমা সুপ্রচুর, কিন্তু তাদের একটিও অনর্থক নয় ; বিশেষণগুলি অর্জুনের তীরের মতো লক্ষ্যভেদী, উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সাদৃশ্য একাঙ্গ নয়, বহুমুখী। 'ছুটি' গল্পের ফটিক যখন কলকাতায় এলো তখন তার 'অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা'-র কথা তার বার-বার মনে পড়তে লাগলো—'কেবল একটা আন্তরিক "মা মা" ক্রন্দন সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হ'তে লাগলো। তারপর তার 'রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক' কিছুতেই ভাবতে পারলে না যে পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কারো কাছে সে সেবা পেতে পারে। ফটিকের উদ্দেশ্যে এখানে একটি-দুটি নয়, আটটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু একটিও বেশি হয় নি, কিংবা

কোনোটিই অন্য কোনো-একটির আংশিক পুনরুক্তি নয়, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও প্রয়োজনীয়, সবগুলি একত্র হ'লে তবেই বক্তব্য সুসম্পূর্ণ হয়। বিশেষণগুলি যেন হৃদয়াবেগে দ্রব, তাদের ভিতর দিয়েই ফটিকের মনের অবস্থা করুণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, লেখককে আলাদা ক'রে কিছু বলতে হয় নি। 'শাস্তি'র চন্দরা যখন লাস্যময়ী যুবতী তখন সে 'ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়', আবার সে যখন পুলিশ বেষ্টিত হ'য়ে মৃত্যু-অভিসারে বেরিয়েছে তখন সে 'নিরীহ চঞ্চল ক্ষুদ্র কৌতুকপ্রিয় গ্রাম-বধূ'। শেষের চারটি বিশেষণে ঘটনাটির হৃদয়-বিদারকতা পরিস্ফুট হ'লো।...'দুরাশা'র নবাবপুত্রী যখন তার উপাস্য হিন্দু কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পর সংজ্ঞা ফিরে পেলো, তখন 'সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র ব্রাহ্মণের পদতলে' দূর থেকে সে প্রণাম করলো। ব্রাহ্মণের ব্যবহার এতই অমানুষিক বা অতি-মানুষিক, নায়িকার মনোভাব এখানে এতই বিচিত্র যে এই পাঁচটি বিশেষণের পাঁচটি শিখা না-জ্বাললে ঘটনাটি ভালো ক'রে আলোকিত হ'তে পারতো না।...ছোটো ভাই বংশীর প্রতি 'হালদার গোষ্ঠী'র বনোয়ারির অবজ্ঞা যে কত গভীর তা কি আমরা এমন ক'রে বুঝতে পারতুম, যদি না বংশীকে 'সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষ' ব'লে অভিহিত করা হতো। এই বিশেষণ-বিন্যাসে শুধু বংশীর চরিত্র আঁকা হয়েছে তা নয়, বনোয়ারির মনোভাবও ব্যক্ত করা হ'লো; 'গল্পগুচ্ছে'র বিশেষণে প্রায়ই এই রকমের স্বচ্ছতা দেখা যায়, যে বলে এবং যার উদ্দেশে বলা হয় দু-জনের পক্ষেই আয়নার মতো কাজ করে।"[১]

রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের কারুকলার দিকটা মোটেই আলোচিত

---

১ পৃ. ৭৮-৮০।

হয় না। লেখক তাঁর এই গ্রন্থে সেই দিকটার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। 'চতুরঙ্গ ও ঘরে-বাইরে' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "কথাসাহিত্যে কারুকলার ক্ষেত্রে বঙ্কিম যেখানে পৌঁছেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন ছোটোগল্পে—সেটা অনিবার্য ছিলো, কেননা বাংলা ছোটোগল্প রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। কিন্তু উপন্যাসের সংগঠনে তিনি বহুকাল পর্যন্ত পুরোনোকে নিয়েই তৃপ্ত ছিলেন, নতুন পরীক্ষার কথা ভাবেন নি। 'চতুরঙ্গ' তাঁর প্রথম বই, যেখানে উপন্যাসের পুরোনো পদ্ধতি আর তাঁর যথেষ্ট বা উপযোগী বলে মনে হলো না, নতুন পথ নিতে হলো। তারপর 'ঘরে-বাইরে'।

"অবশ্য 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'কে জোড়া-বই বলে ভাবলে ভুল হবে; বিষয়বস্তুতে ও উদ্দেশ্যে এরা স্বতন্ত্র। তাছাড়া ভাষার দিক থেকেও মিল নেই। 'চতুরঙ্গ' সাধুভাষায় রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস, 'ঘরে-বাইরে' চলতিভাষায় প্রথম। কিন্তু এই অ-মিলের মধ্যেও একটি মিল প্রচ্ছন্ন রয়েছে; চতুরঙ্গের সাধুভাষায় চলতি-ভাষার অনেক গুণই বর্তমান, ঘরে-বাইরের চলতিভাষা অনেকাংশেই সাধুভাষা।"[১]

এই প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন যে ঘরে-বাইরের চলতিভাষা শুধু সবুজ-পত্রের প্রভাবে জন্ম নেয় নি;—"এই বিপ্লবের বীজ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের মধ্যে প্রথম থেকেই বহন ক'রে আসছেন, অনিবার্য ছিলো তাঁর হাতে এই নতুন ভাষার জন্ম—'সবুজপত্র' শুধু নিমিত্তের মতো কাজ করেছে, এনে দিয়েছে প্রয়োজনীয় অব্যবহিত উপলক্ষ্যটি। 'ঘরে-বাইরে' চলতি ভাষায় তাঁর প্রথম উপন্যাস, কিন্তু—বলা বাহুল্য—কোনোমতেই

১ পৃ. ১১২-৩।

প্রথম রচনা বা গ্রন্থ নয়। এর আগে লেখা হয়ে গেছে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি', 'ছিন্নপত্র', 'শান্তিনিকেতন-পর্যায়', 'গোরা'র সংলাপের অংশ, হাস্যরচনা ও কৌতুক-নাট্যগুলি, 'অচলায়তন' পর্যন্ত নাটক। অর্থাৎ, এই ভাষার সঙ্গে বহু ব্যবহার-জনিত অন্তরঙ্গতা তাঁর ইতিপূর্বেই ঘটে গেছে। তবু 'ঘরে-বাইরে'র বৈশিষ্ট্য এই যে, নাটক বা কৌতুক বাদ দিয়ে, এটি চলতি ভাষায় তাঁর প্রথম সরকারি সাহিত্য রচনা, আর সেইজন্য এর ভাষার দিকটাই হঠাৎ যেন উগ্র হয়ে চোখে পড়ে—যে-ধরনের উগ্রতা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কুললক্ষণ নয়।"[১]

'শেষের কবিতা' সম্পর্কে লেখক যা লিখেছেন তা থেকে জানা যায় এই গ্রন্থ তৎকালীন সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন-প্রত্যাশী তরুণদের মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময়কার অভিজ্ঞতা জানিয়ে লেখক লিখছেন, "শেষের কবিতার আবির্ভাবের সময় আমি ছিলাম কলেজের ছাত্র এবং বাংলা সাহিত্যে নবাগত। বাংলা সাহিত্যের একটি সন্ধিক্ষণ তখন, 'কল্লোল' কেন্দ্র ক'রে হাওয়া-বদল ঘটেছে, আর তা-ই নিয়ে মুখর হয়ে উঠছে সমালোচনা। আমরা কোমর বেঁধে লেগেছি, বিরুদ্ধ দলেরও প্রচণ্ড উৎসাহ। তারুণ্যের সেই সংঘাতের দিনে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আর মেনে নিতে পারছি না আমরা; আমাদের আকাঙ্খা ছুটেছে তীক্ষ্ণতার দিকে, তীব্রতার দিকে, তার প্রভাবে তখন রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বড্ড বেশি মৃদু বলে ঘোষণা করতে আমরা কুণ্ঠিত হই নি। ঠিক এই রকম সময়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি নতুন উপন্যাস বিভিন্ন মাসিক-পত্রে পর-পর দেখা দিলো। কোনো গম্ভীর রাগিণীর আলাপের মতো 'যোগাযোগে'র আরম্ভ, তাতে সাড়া দিতে একটু দেরি হলো

১ পৃ. ১১৭।

আমাদের; কিন্তু শেষের কবিতার প্রথম কিস্তি বেরোনোমাত্র বিকিয়ে যেতে হলো। মাসে-মাসে এই আশ্চর্য নতুন রচনাটি পড়তে-পড়তে আমাদের মনে হলো যেন একটা বন্ধ দুয়ার, যা আমাদের আনাড়ি হাতের আঘাতে কোনো উত্তর দেয়নি, তা এক জাদুকরের স্পর্শে হঠাৎ খুলে গেলো—দেখা গেলো আমাদেরই অনেক স্বপ্নের চোখ-ধাঁধানো মূর্তি। আমরা যা-কিছু চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন—কী সহজে, কী সম্পূর্ণ ক'রে, কী সুন্দর ভঙ্গিতে।···অবাক হয়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক' মূর্তি—আমরা আধুনিক বলতে যা ভাবছিলাম ঠিক তা নয়, কিন্তু তারই কোনো সার্থক রূপান্তর যেন আমাদের কল্পিত রবীন্দ্র-যুগের সীমানা এক ধাক্কায় অনেক দূরে স'রে গেলো; যেটাকে আমরা 'রবীন্দ্র-যুগ' আখ্যা দিয়েছিলাম, সেটা যে নিজেই গতিশীল এবং পরিবর্তমান, তা বুঝতে পেরে অনেক ধারনা বদলে গেলো আমাদের। বার-বার যিনি নব-জাত, প্রায় সত্তর বছরে আবার তাঁর এক নূতন জন্ম।"[১]

পরিশেষে লেখক যা লিখেছেন তাতে অনেকেরই কৌতূহল জাগাবে, হয়ত বা প্রতিবাদও। কিন্তু বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। লেখক লিখেছেন, "···একথা বললে কি বেশি বলা হয় যে শেষের কবিতার বিষয়-নির্বাচনে, রীতিগঠনে, কথ্যভাষার সচ্ছল ব্যবহারে, এমন কি ইংরেজি-ঘেঁষা বাক্যবন্ধে ('সে একটা মূর্ছা, যে-মূর্ছা কোনদিনই আর ভাঙবে না')—'কল্লোলে'র অর্বাচীনতারই প্রভাব পড়েছিলো রবীন্দ্রনাথে? কোনো সন্দেহ নেই, সেই সময়কার তর্কময় সাহিত্যিক আবহাওয়া থেকেই প্রথম পরিচ্ছদটির জন্ম;··· ঐতিহাসিকের কাছে এই গ্রন্থ বিশেষ অর্থপর্ণ এই কারণে যে

---

১ পৃ. ১২৫-৬।

কল্লোলের তরুণরা যার জন্য চেষ্টা করছিলো, এখানে রবীন্দ্রনাথ সেটাকে বিদ্রূপও করলেন, আবার কার্যত তার সার্থকতাও নিলেন স্বীকার ক'রে ; অংশত সৃষ্টি করলেন ঠিক তা-ই যা সেই তরুণদের সচেতন বা অচেতন লক্ষ্য ছিলো।"[১]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে এই দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল বিশ্বপতি চৌধুরীর 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ।'[২] কিছু নূতন চিন্তা ও দৃষ্টির পরিচয় আছে এ আলোচনায়। প্রথমেই লেখক দেখিয়েছেন যে, উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা এতখানি বিপরীতধর্মী যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারার সন্ধান আমরা আদৌ পাই না। এবং দুজনের ভাবধারার পার্থক্যের ফলে দুজনের উপন্যাসের প্রকৃতিও বিভিন্ন রূপ পেয়েছে। লেখকের ভাষায়, "...বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আদর্শ চরিত্রগুলি দেশ ও জাতির স্বার্থ ও ধ্যানধারণার সহিত নিজেদের নিবিড়ভাবে জড়িত করিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া উঠিয়াছে। দেশের চিন্তা, জাতির চিন্তা এই সকল আদর্শ চরিত্রকে চিরদিন সচল ও কর্মব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। জাতি ও দেশপ্রীতি তাঁহাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে শুধু অন্তর্মুখী আত্মবিচারে পরিণত হইতে না দিয়া বহির্মুখী কর্মপ্রচেষ্টায় রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে।

"তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আদর্শ চরিত্রের প্রাদুর্ভাবে কর্ম ও ঘটনা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আদর্শ চরিত্রের যতই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ততই তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে।

"বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ক্রমবিবর্তন কর্ম হইতে বৃহত্তর কর্মে,

---

১ পৃ ১৪৩-৪৪।

২ প্রকাশকাল, ১৩৫৪। পৃ. ১১৫।

আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিবর্তন কর্ম হইতে কর্মমুক্ত আত্ম-বিচারে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি উপন্যাস—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম-এ ধর্ম ও আদর্শের কথা যতই থাকুক না কেন, কর্মের দিক হইতে, ঘটনা-বৈচিত্র্যের দিক হইতে উপন্যাসগুলি আরও সজাগ এবং সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। আর রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের উপন্যাসগুলির মধ্যে যতই আদর্শ চরিত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, উপন্যাসগুলি ততই কর্ম ও ঘটনামুক্ত হইয়া তত্ত্বধর্মী চিন্তা বা ভাবধর্মী কবিত্বের লীলাস্থল হইয়া উঠিয়াছে।”[১]

অতঃপর লেখক স্বতন্ত্রভাবে উপন্যাসগুলিকে একে একে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, এবং দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বা দৃষ্টি-ভঙ্গী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, বিবিধ চরিত্র ও ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে সে চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ক'রে শরীরী হয়ে উঠেছে। এই আলোচনার দুটি জায়গায় লেখক যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই আমাদের চমকিত করে। রাজর্ষি উপন্যাসে লেখক রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প লেখার স্বাভাবিক ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছেন।—“রাজর্ষি উপন্যাসটির মধ্যে দুইটি সুন্দর ছোটগল্প লেখকের অজ্ঞাতসারে কখন এক সময় আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি গল্প জমিয়া উঠিয়াছে গুজ্জরপাড়া নামক এক নগণ্য পল্লীর ততোধিক নগণ্য জমিদার পীতাম্বরকে কেন্দ্র করিয়া; আর একটি গল্প জমিয়া উঠিয়াছে বিজয়গড় নামক এক অখ্যাত দুর্গের বৃদ্ধ সৈনিক খড়্গাসিংহকে অবলম্বন করিয়া।”[২] এই গল্প দুটির কাহিনী ও শিল্পরূপ লেখক রবীন্দ্রনাথের ভাষা বজায় রেখে সংক্ষেপে পরিবেশন করেছেন।[৩] তারপর মন্তব্য করেছেন, “রাজর্ষির অন্তর্গত

১ পৃ. ৯। পৃ. ২৫।

৩ পৃ. ২৬-৩৪

এই দুইটি ছোটগল্পকে রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে ছোটগল্পের বীজের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অতঃপর তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও সৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত করিতে দেখা যায়। তাই আমরা দেখিতে পাই, রাজর্ষি রচনার পর দীর্ঘ ষোল বৎসরের মধ্যে তিনি আর কোন উপন্যাস রচনা করেন নাই। এই সুদীর্ঘকাল তিনি কেবল গল্পের পর গল্প রচনা করিয়া চলিয়াছেন।"[১]

রাজর্ষি উপন্যাসের ফলশ্রুতি সম্পর্কে লেখকের সুচিন্তিত অভিমত হল এই ;—"উপন্যাস হিসেবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে রাজর্ষির বিশেষ স্থান না থাকিলেও, ছোটগল্পের জন্মদাতা হিসেবে এই উপন্যাসখানির যথেষ্ট মূল্য আছে। গুজ্জরপাড়ার পীতাম্বর এবং বিজয়গড়ের খুড়াসাহেবের ভিতর দিয়া মানব-চিত্তের সূক্ষ্ম বেদনার স্থানটিতে এমন করিয়া ঘা দেওয়া সহজ শক্তির কাজ নয়। এখানে মনস্তত্ত্বের কষ্টসাধ্য বিশ্লেষণের ঘোরপ্যাঁচ নাই, বক্তৃতা নাই, অসম্ভব পরিস্থিতি খাড়া করিয়া তুলিয়া জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস নাই ; আছে কেবল দুইটি সরল, স্বচ্ছ, অনাবৃত চিত্তের সূক্ষ্ম ব্যথার পর্দাটিতে মৃদু অঙ্গুলিসঞ্চালনের চেষ্টা ; যাহা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিকে এত সহজ, সরল অনায়াসগতি করিয়া তুলিয়াছে।"[২]

চোখের বালির পর নৌকাডুবি রচিত হওয়াটা সব সমালোচকের কাছেই খাপছাড়া ঠেকেছে। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-রচনা শক্তির অবরোহণ না হয়ে অবতরণ ঘটেছে ব'লে প্রতীয়মান হয়েছে। একথা স্বীকার ক'রেও লেখক দেখিয়েছেন যে, গোরার পূর্ববর্তী উপন্যাস হিসেবে নৌকাডুবির একটা কালগত স্বাভাবিকতা

---

১ পৃ. ৩৪।

২ পৃ. ৩৫।

আছে। এবং গোরার সঙ্গে নৌকাডুবির যোগসূত্র কোথায় এবং কতখানি লেখক তা সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর এই আলোচনা থেকে জানা যায় যে নৌকাডুবি গোরার পূর্বাভাস।

কবির জীবনচরিত মিলিয়ে তাঁর কাব্যের আলোচনার প্রয়াস যে সংকীর্ণ এবং বিভ্রান্ত—এ বিষয়ে স্পষ্ট সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় ক্ষুদিরাম দাস প্রণীত 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়'[১] গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রকাব্যপাঠে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে তাঁর রচনায় প্রারম্ভ থেকে একটি ক্রম-পরিণাম ঘটেছে এবং তা তাঁর কবি-স্বভাবেরই পরিণাম। পরিণামমুখী গতিশীল কবিস্বভাব অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যাত্রা ক'রে চলেছে যতক্ষণ না তার দৈবনির্দিষ্ট পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উগ্র কবিস্বভাবের বশবর্তী বলেই এই কবির চিত্তে কোনো লৌকিক ভাবনা, বেদনা স্থায়ী ও গভীরভাবে দাগ কাটতে পারে নি। কবিমানস আসক্তি-বিহীন, নির্মম, উদাসীন। ঠিক এই জন্যেই কোনো শাস্ত্র, তত্ত্ব, বা পূর্বনির্দিষ্ট মতবাদও কবির চিত্তকে প্রভাবিত করতে পারে নি।···

"উপরিউক্ত কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত মিলিয়ে তাঁর সৃষ্টির রহস্য সম্যক অনুধাবন করা সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করেছি এবং তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টিগুলির কোনোটিকেই অতি সাময়িক রঙে অনুরঞ্জিত ক'রে গ্রহণ করতে পারি নি।···কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কবি ক্ষীণভাবে কোনো ঘটনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন সত্য, কিন্তু এর আশ্রয়ে যে সুদূর কল্পলোকে ধাবিত হয়েছেন তাতে ঘটনার স্মৃতি কোনো রেখাপাত করতে পারে নি এবং সাময়িকতা শাশ্বতভাবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। মোটকথা, কবিজীবন ও তাৎকালিক ঘটনা

১ প্রকাশকাল. ১৩৬০। পৃ. ৪৯৫।

কবিমানসকে জানার দিক দিয়ে কোথাও সহায়তা করলেও তাদের সীমা সম্পর্কে যেন অবহিত হতে পারি এবং এ কথা না ভুলে যাই যে রবীন্দ্ররহস্যলোকের দীপবর্তিকা সেই গোপনচারী কবি স্বয়ং।"[১]

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে এই কথায়—"কবি-প্রতিভার স্বরূপ অনুধাবন করাই কবিকে যথার্থ দেখা এবং তা দেখতে হলে কবিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে দেখা চলবে না, পূর্বনির্দিষ্ট কোনো সংস্কারের মলিন দর্পণেও দেখলে চলবে না, এবং তাঁর চলতি পথের কোনো একটা বিশেষত্বকে সমগ্র করে দেখলে খণ্ডিত দেখা হবে।"[২]

গ্রন্থের অনেক স্থানে লেখকের চিন্তাশীলতা ও সাহিত্যরসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে চিত্রাঙ্গদার ভাষাভঙ্গী প্রসঙ্গ, উপনিষদের সঙ্গে কবিমানসের সম্পর্ক বিচার ও রবীন্দ্রনাথের সংস্কার-মুক্ত কবিস্বভাবের মহিমা খ্যাপন, এবং বলাকায় বের্গসঁর প্রভাব সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদের বিচার অংশটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

চিত্রাঙ্গদার ভাষাভঙ্গী প্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃতির সঙ্গে দেখিয়েছেন অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনের মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলমের আক্ষরিক অনুসরণ যথেষ্ট রয়েছে।[৩] উপনিষদের সঙ্গে কবিমানসের সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "...উপনিষদ কোনো পরিস্ফুট দার্শনিক মতবাদ নিয়ে রচিত হয়নি।...যাবতীয় দর্শনের বীজ-রূপ উপনিষদের সঙ্গে সেই উপনিষদের উপর নির্ভরশীল কোনো একটি দার্শনিক মতের দাতা-গ্রহীতারূপ সম্পর্ক স্থাপন অনুচিত। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দ্বারা প্রভাবান্বিত এমন কথা অত্যন্ত ব্যাপক কথা মাত্র, এবং তাঁর কাব্যের বিশেষ আলোচনায় এমন

১ পৃ. ১২-১৩।

২ পৃ. ৯২।

৩ পৃ. ১৩৯-১৪২

ব্যাপক উক্তিও অযৌক্তিক। কারণ, তখনই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে উপনিষদের পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা উক্তির মধ্যে এবং তা নিয়ে গঠিত নানা মতবাদের মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত?"[১] লেখকের বিচারে "উপনিষদের মন্ত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বকীয়-ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, যেমন হয়েছে পূর্বেকার বিভিন্ন মনীষীদের দ্বারা।…সেগুলির স্বকীয় উপলব্ধি অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেগুলিকে স্বকীয় উপলব্ধির সমর্থক হিসাবেই অন্তরে গ্রহণ করেছেন।…পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কতকগুলি বিশেষ মন্ত্র কতকগুলি বিশেষ অর্থেই কবির প্রিয়, উপনিষদের সব বচন নয় এবং পূর্বসূরিদের অর্থে নয়।"[২] বলাকায় বের্গসঁর প্রভাব সম্পর্কে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন, "বের্গসঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল কেবল-মাত্র পরিবর্তন-তত্ত্বেই আবদ্ধ নয়। সৃষ্টির প্রকার, প্রণালী, মানুষের মহিমা, জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মের যোগ, ব্যক্তিগত জীবনের গতিশীল বিকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উভয়ের ব্যাপক সাদৃশ্য রয়েছে। এবং কেবল বলাকা পর্যায়েই নয়, তার পূর্ব পূর্ব পর্যায়ের বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্যেও দার্শনিকের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সেইজন্য আমরা কবির পরিবর্তন-বাদের বিষয়টি বের্গসঁ-এর প্রভাব-জাত বলে মেনে নিতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় উপলব্ধির মূল্যেই ধীরে ধীরে এই জীবন-দর্শনে এসে পৌঁছেচেন এই সমীচীন ধারণাই পোষণ করেছি।… কেবল বলাকাতেই বের্গসঁর প্রভাব নির্দেশ করলে যেমন কবি-প্রতিভার অনন্য-পরতন্ত্র ঐক্যমূলক বিকাশের ধারণায় কুঠার-আঘাত করা হয় তেমনি উভয়ের জীবন-দর্শনের গভীরতর ঐক্যের উপলব্ধি থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। এই কারণে আমরা মনে করি যে উভয়

১ পৃ. ২৬২।
২ পৃ. ২৬১।

দার্শনিকই স্বকীয় বিশিষ্ট উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রায় এক ধারণায় এসে পৌঁছেছেন। একজন প্রজ্ঞাময় মননের দ্বারা, আর একজন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে আনন্দচৈতন্যময় লোকে উত্তীর্ণ হয়ে।"[১]

সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনা ক'রে লেখক তাঁর সর্বশেষ যে সিদ্ধান্ত নির্দেশ করেছেন তা হল এই ;—"রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ কবিসত্তা তার কবিস্বভাব বজায় রেখেও ধীরে ধীরে দার্শনিক সত্তায় লীন হয়ে গেছে। রবীন্দ্র-কাব্যপাঠে এর কোন্‌টি বাদ দিয়ে কোন্‌টি পাঠক গ্রহণ করবেন, অথবা দুইটি একত্র গৃহীত হওয়া সম্ভব কিনা তার বিচার করবে পাঠকের মানস-প্রকৃতি, কোনো নির্ধারিত তুলাদণ্ডে নয়···।"[২]

রবীন্দ্র-সমালোচনায় পূর্বসূরীদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার বা তাকে খণ্ডন করার প্রচেষ্টা আজও তেমন দেখা দেয় নি। অথচ এমন প্রচেষ্টার প্রয়োজন সমালোচনার ক্ষেত্রে সর্বদাই আছে। পুনর্বিচারের দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টির নব মূল্যায়ন হয়। এইরূপ একটা প্রচেষ্টার প্রেরণা আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত 'রবীন্দ্র-মানস' পুস্তকে।[৩] আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী 'লেখকের নিবেদন'-এ স্পষ্ট হয়েছে।—"রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি হইলেও তাঁহার অনুভূতিগুলির উৎস এই দুই শতাব্দীর ভিতরে সীমাবদ্ধ নহে এবং য়ুরোপের ভাবধারার সঙ্গে ইহাদের সহধর্মিতাও নাই বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধ রহিয়াছে। অন্য কারণ ছাড়াও কেবল এই কারণে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে পাথেয় করিয়া রবীন্দ্রসাহিত্য পরিক্রমায় অগ্রসর

১ পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

২ পৃ. ৪৭৯।

৩ প্রকাশকাল, ১৩৫৯। পৃ. ১৬৬।

হইলে রবীন্দ্রপ্রতিভার ভুল ব্যাখ্যার যে আশঙ্কা থাকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই গ্রন্থে দিয়াছি।”[১] অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের কয়েকটি সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার, এবং প্রমথনাথ বিশীর একটি মৌল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের মূল ধারা নয় এবং সেই কারণে ঐ কাব্যকে আমল না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়—বিশী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তকে লেখক মনে করেন রবীন্দ্র-মানস, রবীন্দ্র-প্রতিভাকে একেবারে না বোঝার লক্ষণ।

সুবোধ সেনগুপ্ত শেলীর Ode to the West Wind এবং রবীন্দ্রনাথের ‘বর্ষশেষ’ কবিতাটির তুলনামূলক আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ‘বর্ষশেষ’ কবিতা শেলীর কবিতাটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। লেখক এই সিদ্ধান্ত বিশদভাবে পুনর্বিচার করেছেন এবং দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন বর্ষশেষ কবিতার কাব্যোৎকর্ষ কত উচ্চ। সুবোধ সেনগুপ্তের সমালোচনার একটা মৌল ত্রুটি সম্পর্কে লেখক বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে ছবি ফুটাইবার চেষ্টা নাই। কিন্তু কবিতাটির নাম ‘বর্ষশেষ’ ; পশ্চিমবায়ু বা কালবৈশাখী নহে ; নামের মধ্যে যে দুইটি কবিতার আকাশ পাতাল ব্যবধানের ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় লক্ষ্য করেন নাই। শেলী বসিয়াছেন West Wind-এর বর্ণনা দিতে, আর রবীন্দ্রনাথ বসিয়াছেন বর্ষশেষ যে বাণী লইয়া আসিয়াছে তাহার কথা বলিতে। দুইটি কবিতার লক্ষ্যই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একটির সঙ্গে আর একটির ভাবগত, লক্ষ্যগত কোনো ঐক্যই নাই…।”[২]

---

১ পৃ. ৵ -৶০।

২ পৃ. ৯২।

এই দশকে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য অথবা কাব্য ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্য ও কাব্যের কতকগুলি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। অমিয়কুমার সেন আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির প্রভাব সম্পর্কে। রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি-প্রেমের বৈচিত্র্য ও গভীরতা কতখানি তারই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে তাঁর 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।[১] গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ মূলত প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে তাঁর কবিপ্রতিভার মূল উপাদানটি নিহিত আছে। তাঁর কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে এই উপাদানটি কীভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে বর্তমান গ্রন্থে তাই দেখাতে চেষ্টা করেছি। প্রকৃতি-প্রেম রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের শুধু একটি বিশেষ লক্ষণমাত্র নয়, এটা তাঁর কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং প্রকৃতির কবিরূপে তাঁর বিশিষ্টতা দেখাতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁর বিচিত্র প্রতিভার অন্যান্য দিক্‌গুলির প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচনা থেকে শেষলেখা পর্যন্ত সমস্ত কাব্যগ্রন্থ-গুলির কালানুক্রমিক আলোচনার দ্বারা লেখক পরিস্ফুট করেছেন তাঁর সিদ্ধান্ত, দেখিয়েছেন কীভাবে প্রকৃতি-প্রেম কবিপ্রতিভার মূল উপাদান, কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমগ্র আলোচনায় চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, যুক্তির সারবত্তা ও কাব্যরসশিক্ষার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কেন সন্ধ্যাসংগীতে কবির কাব্যজীবনের প্রকৃত সূচনা এর উত্তর লেখক কবির প্রকৃতি-প্রেমের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খুঁজেছেন।—"বাংলা-দেশের শান্ত নদীর অবিরাম গতির মধ্যে কবি আপনার মনের অনুচ্ছলিত গতিধর্মকে খুঁজে পেয়েছেন, আর দিগন্তবিস্তৃত উদার

১ প্রকাশকাল, ১৩৫৪। পৃ. ২৪৮ [বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা]।

আকাশে পেয়েছেন মনের নিরবচ্ছিন্ন অবকাশের প্রশান্তিকে। এই দুটিই তাঁর কাব্যজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। নদী আর আকাশের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা প্রায় সহজাত। সন্ধ্যা-সংগীত রচনাকালেই কবি নদীতীর আর আকাশের শান্ত অবকাশের মধ্যে সর্বপ্রথম আপনাকে আবিষ্কার করেছিলেন।...সন্ধ্যাসংগীত রচনাকালেই তিনি তাঁর কবিধর্মের প্রতীক দুইটি প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে আপনার মনকে নিবিষ্ট করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে গঙ্গার পরিবর্তে পদ্মানদীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তাঁর কাব্যজীবনের মূল অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিক্ থেকে বিচার করলে সন্ধ্যাসংগীতে তাঁর কাব্যজীবনের প্রকৃত সূচনার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে।"[১]

রবীন্দ্রকাব্যধারায় গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালি যে প্রক্ষিপ্ত নয় এ কথাও লেখক কবির প্রকৃতি-প্রেমের ধারার মাধ্যমে বিচার করেছেন। তাঁর বিচারে, "সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতি কাব্যে প্রকৃতি সাহচর্যে কবি প্রেম সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অনুভূতি লাভ করেছিলেন; সেই প্রেম সৌন্দর্য ও মাধুর্যের রসস্বরূপ দেবতা যিনি, গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য এবং গীতালি তাঁরই সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা এবং পরিতৃপ্তির কাব্য।...প্রেম-সৌন্দর্য-আনন্দের প্রকাশ থেকে প্রেম-সৌন্দর্য ও আনন্দ-স্বরূপে পৌঁছোবার চেষ্টার মধ্যে অস্বাভাবিকতা এবং আকস্মিকতা নেই। বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যের মূলপ্রেরণা প্রকৃতি এই কাব্যগুলিতে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও অধ্যাত্ম অনুভূতি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল হয়ে প্রকৃতি-প্রেমের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারেনি। এমন কি অনেক কবিতায় প্রকৃতি-প্রেমের অনুভূতিই প্রবল, অধ্যাত্ম অনুভূতি তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থেকে

---

১ পৃ. ৭২।

মৃদু সৌরভের মতো সমস্ত কবিতাটির উপরে গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।"[১]

সমগ্র আলোচনার পর লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত হল, "ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে কবিপ্রতিভার মূল অবলম্বন হল প্রকৃতি, মানবজীবন এবং ভগবৎ-ভক্তি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যতীর্থ পরিক্রমার পথে পথে আমরা দেখেছি এই তিনটি ধারার সমন্বয়ে তাঁর কবিজীবনের বিশ্বাস এবং সাফল্যের বিশেষ ক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর মনে মানবজীবন সম্বন্ধে সচেতনতা এবং ভগবানের স্পর্শ এসেছে প্রকৃতির মধ্যস্থতায়। ব্যক্তিগত প্রেমের সৌরভও তাঁর কাছে প্রকৃতির দেহসৌরভের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ প্রকৃতিরই কবি। আয়তনের দিক্ থেকে যেমন, গভীরতায়ও তেমনি ; প্রকৃতিই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণা।"[২]

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরসের দিকটার বিশদ আলোচনা করেছেন রবীন্দ্র-ভবনের গবেষক সরোজকুমার বসু।[৩] যথেষ্ট মুনশীয়ানার সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রসাহিত্যে কতখানি ব্যঙ্গ, কৌতুক, ও অন্যান্য হাস্যরস বিদ্যমান, এবং রবীন্দ্র-হাস্যরসসৃষ্টির উপাদান কি কি। এ বিচার করতে গিয়ে আবশ্যকীয়ভাবে তিনি প্রাক্-রবীন্দ্র-যুগের হাস্যরস-আদর্শের আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় একথা প্রস্ফুট হয়েছে যে, রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে উচ্চাঙ্গের, যার আবেদন বিশুদ্ধ, বিমল—এক কথায়, যথার্থ রস।

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস সম্পর্কে সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় যে

১ পৃ. ১৪১।

২ পৃ. ২২৩।

৩ রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস, ১৩৫৭। পৃ. ১০০।

বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন, লেখক সে সমালোচনার পুনর্বিচার করেছেন, এবং পূর্বসূরীর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেছেন। বিরুদ্ধ সমালোচনার বক্তব্য ছিল এই যে রবীন্দ্রসাহিত্যের হাস্যরস হল কথার মারপ্যাঁচ, Wit-এর আধিক্য, এবং এ হাস্যরস মূলত ক্রটিপূর্ণ কারণ গীতিকবিতার সঙ্গে রসিকতার বিরোধ ঘটে। লেখক এই তিনপ্রকার অভিযোগ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। তাঁর মতে, "বিচার করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির ন্যায় তাঁর হাস্যরস-রচনাগুলিও বুদ্ধির ঝিকিমিকি ও সহৃদয়তার স্পর্শে ভাবে ও অর্থে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাক্যের বিচিত্র ব্যবহার এখানে ভাবকে আচ্ছন্ন না করে, বরং আরো অর্থসমৃদ্ধ করে তুলেছে।"[১]

সুবোধ সেনগুপ্ত Wit-কে শুধু কথার মারপ্যাঁচ-জাত হাস্যরস বুঝেছেন, এবং সেই হেতু তাকে অপকৃষ্ট হাস্যরস বলেছেন। লেখকের মতে, "যে সংকীর্ণ বিচার পদ্ধতি Wit-কে 'অপকৃষ্ট হাস্যরস' বলে অভিহিত করে তা অবলম্বন করে রসবিচার করতে গেলে বিচার-বিভ্রাটই ঘটে থাকে। প্রকৃষ্ট হাস্যরস মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় দুটোকে জড়িয়েই উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। শুধু হৃদয়কে নিয়ে যে একপ্রকার আবেগপ্রধান অগভীর হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় তাতে আমাদের সাময়িক মানসিক আলোড়ন ঘটলেও এর কোন স্থায়ী ছাপ আমাদের মনে পড়তে পারে না। বুদ্ধি দিয়ে সংযত ও দৃঢ়বদ্ধ না করলে নিছক উচ্ছ্বাসের আবেগ-সর্বস্ব ভিত্তি স্থায়িত্ব দাবি করতে পারে না। যে সৃষ্টি হৃদয়কে আলোড়িত করে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিকেও নাড়া দিয়ে যায়, যাতে আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিও পরিতৃপ্ত হয়, তাকেই প্রকৃষ্ট রসসৃষ্টির স্থায়ী মর্যাদা দেওয়া যায়।"[২]

---

১ পৃ. ৯৫। ২ পৃ. ৯৭।

তৃতীয় অভিযোগের উত্তরে লেখক বলেছেন, "গীতিকবিতার সঙ্গে রসিকতার বিরোধের যে কারণ সমালোচক দেখিয়েছেন, বিচার করলে দেখা যাবে যে তা অর্থহীন। আত্মগত অনুভূতির যে গভীরতা গীতিকবিতার মূলে থাকে, সত্যকার হাস্যরসস্রষ্টার পক্ষেও তার প্রয়োজন আছে। জগৎ ও জীবনের আপাতকঠোর বাস্তবতার মধ্যে যে অসংগতি ও অযৌক্তিকতা আমাদের চোখে পড়ে না, তাহাই হাস্যরসিকের রসসৃষ্টির প্রধান উপাদান। অনুভূতির গভীরতা না থাকলে একে পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যায় না, এবং এগুলিকে নিয়ে সার্থক হাস্যরসসৃষ্টিও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাভাবিক গীতিধর্মপ্রবণতা তাকে প্রকৃষ্ট হাস্যরসস্রষ্টা হতে বাধা না দিয়ে বরং সহযোগিতাই করছে।"[১]

ক্ষিতিমোহন সেন-এর 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'[২] বলাকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা। ১৯১১ সালে কবি স্বয়ং নিজের কাব্যের যে আলোচনা করেন, তাকে ভিত্তি ক'রেই অজিতকুমার লেখেন তাঁর 'কাব্য-পরিক্রমা'। কবির আলোচনার ধারাতেই অজিতকুমার উদ্বুদ্ধ হন, কিন্তু তবু তাঁর গ্রন্থ স্বকীয় মনস্বিতা ও রসবিচারক্ষমতায় অপূর্ব হয়ে উঠেছে। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর গ্রন্থে নিজের কথা কিছু বলেন নি, তিনি শুধু কবির কথা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ তিনি জানিয়েছেন, "বলাকার যে-সব আলোচনা কবির মুখে শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল সেইগুলিই যথাসাধ্য ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তবে সবগুলির আলোচনা একই সময়ে ধারাবাহিকভাবে হয় নাই। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর

১ পৃ. ৯৮।

২ প্রকাশকাল, ১৩৫৯। পৃ. ২১৮।

উত্তর বিভাগে সাহিত্যের ক্লাসে ‘বলাকা’ সম্বন্ধে কবির একটি আলোচনা কিছুদিন ধরিয়া চলে। শ্রীমান্ প্রদ্যোতকুমার সেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তখন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় সেইসব আলোচনা মুদ্রিত করেন। শ্রোতাদের মধ্যে অবাঙালী কেহ কেহ থাকায়, কবি মাঝে মাঝে দুই একটি ইংরেজী শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। বুঝিতে সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া তাহাও আমরা স্থানে স্থানে যথাসাধ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

“ইহা ছাড়াও তাহার পরে তাঁহার কাছে ছিলাম বলিয়া প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরিয়া নানা জনের সঙ্গে বলাকা সম্বন্ধে তাঁহার যে-সব আলোচনা শুনিয়াছি, তাহাই একত্র করিয়া এখন সকলের কাছে উপস্থিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি।

“একই বিষয়ে নানা সময়ের আলোচনা একসঙ্গে উপস্থিত করিতে গিয়া কোথাও কোথাও পুনরুক্তি আসিয়া পড়িয়াছে। একই কথা হয়তো একাধিকবার তিনি বলিয়াছেন। অথচ এমন সুন্দরভাবে সেগুলি নানাপ্রসঙ্গে বলা যে, কোনোটিকেই বাদ দেওয়া চলে না। এই দোষটা এই ক্ষেত্রে সহিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। এই অসুবিধা সত্ত্বেও একই কবিতা সম্বন্ধে বা বিষয় সম্বন্ধে নানা সময়ের আলোচনা একত্র করিয়া এখানে উপস্থিত করা হইল। তাহাতে যদি রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীদের ‘বলাকা’র কবিতা বুঝিবার পক্ষে কিছুমাত্র সুবিধা হয়, তবেই আমার এই চেষ্টাকে সার্থক জ্ঞান করিব।”[১]

এ গ্রন্থে বলাকা কাব্যের জন্মকথা, তার ছন্দ, প্রায় প্রতি কবিতার প্রেরণা-উৎস, এবং পরিশেষে প্রত্যেক কবিতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বক্তব্য যা কিছু সবই রবীন্দ্রনাথের। কবি বলে

---

১ পৃ. ৭-৮।

যাচ্ছেন এইভাবেই লেখা। এ গ্রন্থপাঠে শুধু যে বলাকা সম্বন্ধেই জানা যায় তা নয়, কবির কাব্য-প্রেরণা ও মানসপ্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক সত্য লাভ করা যায়। কবির কাব্যজীবন সম্পর্কে কবির নিজের কথার মহামূল্য আকর হল এই গ্রন্থ। শুধু মনে হয়, এ গ্রন্থ যদি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হত, এবং কবির জবানীতে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা যদি কবি স্বয়ং দেখে যেতে পারতেন, তাহলে গ্রন্থের মূল্য আরও বৃদ্ধি পেত—যা কবির কথা ব'লে অনুলিখিত হয়েছে, তা যে কবির যথার্থ উক্তি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ কিছুমাত্র থাকত না।

বাংলাসাহিত্যের আদিকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করার গুরু দায়িত্ব বহন করছেন সুকুমার সেন মহাশয়। এই ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ খণ্ড লিখিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-বিবরণে রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে স্থান দেওয়ার যে প্রয়োজন ছিল তা সিদ্ধ করার প্রথম সম্মান সুকুমার সেনই অর্জন করেছেন।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্যের সব বিভাগগুলিই আলোচিত হয়েছে। কবিতা, নাট্য, ছোটগল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান সবেরই আলোচনা আছে। লেখকের তথ্যসংগ্রাহী দৃষ্টি স্বভাবতই রচনার তথ্যগত বিবরণের প্রতি যথেষ্ট নিবদ্ধ ; কিন্তু যেখানে তাঁর দৃষ্টি রচনার ভেতরে প্রবেশ করেছে, সেখানে তাঁর আসল উদ্দেশ্য সেই কেবল ভাবব্যাখ্যা। মাঝে মাঝে লেখকের নিজস্ব চিন্তাশীলতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ; যেমন, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য। এই বক্তব্যের কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল।—"অনেকদিন হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে এই অভিযোগ চলিয়া আসিয়াছে যে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি 'বস্তুতন্ত্রতাবিহীন' অর্থাৎ বাস্তবনিরপেক্ষ।…তাঁহার ছোটগল্প

সম্বন্ধে একথা একেবারে মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কিছুতেই কল্পনাবিলাসের রঙীন ফানুষ নয় ; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অপরোক্ষ অনুভূতির অপূর্ব সমবায়ে কবির মানসে যে গভীরতর সত্যসৃষ্টির সুধারস সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারি এক প্রকাশ এই ছোট গল্পগুলিতে।...

"নিরবচ্ছিন্ন অবকাশপূর্ণ প্রকৃতির স্নিগ্ধশ্যাম ক্রোড়ে কুটীরনীড়ে হোক অথবা জনাবিল নগরকারার ইটকাঠের বায়ুরুদ্ধ কোটরে হোক, যে চিরন্তন মানব-জীবনস্রোত নিতান্ত ঘরোয়া ক্ষুদ্র তুচ্ছ দুঃখসুখের ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদ্‌-ভঙ্গে অনুচ্ছ্বসিত নিরলসগতিতে একটানা চলিয়াছে, যেখানে চমক্‌প্রদ বৈচিত্র্যও নাই এবং মহত্ত্বের উত্তুঙ্গতা অথবা নীচতার অতলতাও নাই, সেই বাঙ্গালা-দেশী সনাতন জীবন গল্পগুলিতে অপূর্ব বেদনা ও সহানুভূতিমণ্ডিত হইয়া শিল্পগরিষ্ঠ প্রতি-বিম্বন পাইয়াছে।...রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প এই হিসাবে পরিপূর্ণ বাস্তব যে ইহাতে কোন টাইপনিষ্ঠ নয়, নিতান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ মানবত্বটুকু মূর্ত হইয়াছে। তবুও রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্পে এই বাস্তবতাই চরম নয়। ইহার পিছনে এমন একটা কিছু আছে যাহার জন্য গল্পগুলিতে অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্যের স্পর্শ লাগিয়াছে। এই গল্পগুলির মধ্যে চোখে-দেখা মানুষের সুখদুঃখময় যে জীবনখণ্ড আবহমান প্রাণপ্রবাহের ভঙ্গ-তরঙ্গমাত্র, তাহারি গভীর আনন্দস্রোতে মানবজীবনের ক্ষণিক ভালবাসা-ভাললাগা ও আপাত তুচ্ছতা-ব্যর্থতা-বেদনা সবই একটি যেন অলৌকিক সার্থকতায় পৌঁছিয়াছে, মানব-জীবনের অসার্থকতার ব্যথা বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে, মানব-প্রেমের দহন বিশ্বচৈতন্যের আনন্দরসে নির্বাপিত হইয়াছে।...

"রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পের কাহিনীতে যে ব্যর্থতার করুণ সুর গুঞ্জরিত হইয়াছে অথবা তাহার উপরে যে ব্যথিত বেদনার ছায়া পতিত হইয়াছে তাহা সাধারণ অর্থে ট্রাজিক বা নিষ্করুণ নয়। অজ্ঞাত, অখ্যাত নিতান্ত সাধারণ মানুষের ব্যর্থতা-বেদনার 'সাত

সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া' যেখানে বিশ্বব্যাপী সমবেদনা অপেক্ষা করিয়া আছে সেখানে পৌঁছিয়াই যেন কাহিনী যথার্থ বিরাম লাভ করিয়াছে। হিউম্যানিটি বা বিশ্বমানবতার গভীর সমবেদনাজাত আনন্দবোধই এই সুবৃহৎ চরিতার্থতা।...তাঁহার ছোট-গল্পে—সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেখানে তাহারা কথা কহিয়াছে, লোকসমাজে যাহারা একপ্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে, পৃথিবীতে যাহারা একান্ত অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখি তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিসর্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সেই নব-দ্বৈপায়ন, যিনি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে মহাকাব্যের নায়ক ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জুনের যে অখ্যাত অজ্ঞাত আত্মীয় স্বজাতি আছেন—সেই আত্মীয়তা আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া সাহিত্যশিল্পকে উচ্চতর ভূমিতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।"[১]

লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন, "এই বইয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য- ও শিল্প-সৃষ্টির সাধ্যানুসারে সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া হইল।" কিন্তু এই সামগ্রিক বিবরণ শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা ভাববাদী বিবরণে পর্যবসিত দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সৃষ্টির বিবরণ সুকুমারবাবু দিয়েছেন এমন কথা বলা যায় না, কারণ রবীন্দ্রসাহিত্যের শিল্পগত কোনো আলোচনা এ গ্রন্থে কিছুই ফুটে ওঠে নি। তাছাড়া সামগ্রিক বিবরণ বলতে লেখক কি বুঝেছেন তাও স্পষ্ট হয় নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সামগ্রিক বিবরণ ও সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবরণ কি একই কথা? যাই হোক, সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের কাছে রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা ঐতিহাসিক বিবরণ বা আলোচনা আশা করা

১ ১৩৫৯ সং, পৃ. ২০২-৩।

খুবই স্বাভাবিক দাবি ছিল, কিন্তু সে প্রত্যাশা মেটে নি। তাঁর এ গ্রন্থ আর পাঁচটা রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থের মতোই একটা পরিচয়-গ্রন্থ হয়েছে, কিন্তু বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড হয় নি। অথচ গোটা বাংলাসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য-বিচার ও মূল্যায়ন সুকুমারবাবুই করতে পারতেন, কারণ তাঁর হাতেই এমন আলোচনার মালমসলা তৈরি ছিল। আমাদের এখনো ভবিষ্যতের উপরেই ভরসা রাখতে হবে। বাংলাসাহিত্যের এমন একজন ইতিহাসকারের প্রতীক্ষায় থাকব যিনি বাংলাসাহিত্যের পরিচয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত যোগসূত্র নিরূপণ করতে পারবেন।

উপসংহার

রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা-ধারার যে অনুস্মৃতি আমরা করলাম তাতে এইটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে এ ধারা মোটামুটি তিনটি খাতে প্রবাহিত। প্রথম খাতে এ ধারার প্রবাহ অতি স্বচ্ছ—সপ্রশংস, অনুরাগধর্মী ও স্নেহপরবশ সমালোচনার সমুদ্‌ভাসে উজ্জ্বল। 'কড়ি ও কোমল'-এর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্র-সমালোচনার এই রূপটিই বজায় ছিল।

কড়ি ও কোমল-এর কাল থেকেই শুরু হয় এ ধারার দ্বিতীয় খাত। এবং ১৩৪০ সাল পর্যন্ত এই খাতে যে প্রবাহ চলে, তা রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে প্রতিকূল ও অনুকূল সমালোচনার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে আবর্তিত, নূতন ও পুরাতন আদর্শের বিপরীতমুখী তরঙ্গের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ ও আবিল।

১৩৪০ সালের পর থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে গভীর আলোচনার প্রাচুর্ভাব দেখা দেয়। এ আলোচনার প্রয়াসের পেছনে দেখতে পাই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি সমালোচকগণের সুগভীর শ্রদ্ধা। পূর্বে যাঁরা ছিলেন প্রবীণ সমালোচক, সাহিত্যরসশিক্ষার কর্ণধার, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্যকে মুরুব্বিয়ানার দৃষ্টিতে দেখতেন, ফলে তাঁদের মুরুব্বিয়ানা-জনিত রবীন্দ্র-সমালোচনার বিরুদ্ধে যেসব তরুণ রবীন্দ্রভক্তগণ লেখনী ধারণ করতেন তাঁদের লেখায় প্রতিবাদের সুরটাই মুখ্য হয়ে উঠত। দুই পক্ষের বাদানুবাদের ধুলো উড়ত, সমালোচনার আসল কাজ পড়ত চাপা। কিন্তু রবীন্দ্র-সমালোচনার তৃতীয় পর্বে মুরুব্বিয়ানা ও বাদানুবাদ প্রায় অনুপস্থিত। পরিবর্তে দেখা দিয়েছে শ্রদ্ধাশীল ও অনুসন্ধিৎসু চিত্তে রবীন্দ্রসাহিত্যের সম্যক আলোচনা, ব্যাখ্যা ও বিচারগত প্রকৃত সমালোচনার উৎসাহ ও অনুশীলন। এই খাতেই রবীন্দ্র-সমালোচনা-প্রবাহ আজ স্বচ্ছ ও মুক্তস্রোত হয়ে বইছে।

কড়ি ও কোমল-এর কাল থেকে রবীন্দ্রকাব্য ও সাহিত্য নিয়ে যে বিরুদ্ধ সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমরা সে সমালোচনার মূল অভিযোগগুলি অনুসরণ করেছি। সে অভিযোগগুলি হল—রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতা, রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্নীতি, এ সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন, এবং অতিরিক্ত বিদেশী ভাবাপন্ন ও খাঁটি বাংলার প্রাণস্পন্দন থেকে বঞ্চিত।

রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ কড়ি ও কোমল-এর পূর্ব থেকেই ওঠে; তবে সে অভিযোগ তেমন জোর গলায় প্রচার করা হয় নি। সন্ধ্যাসংগীত কালের কাব্যজীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি নিজেই বলেছেন, "এখন হইতে কাব্য-সমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটি রব উঠিতেছিল যে, আমি ভাঙা ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁয়া-ধোঁয়া, ছায়া-ছায়া।[১] এই রব যে সত্যি উঠেছিল তা জানা যায় রুদ্রচণ্ড নাটিকা সম্পর্কে 'বান্ধব' পত্রিকায় যে সমালোচনা বের হয় তা পাঠ করলে। কিন্তু এই অভিযোগের পেছনে সমালোচকদের ভ্রান্তি কোথায় ছিল সেকথাও কবি বলে গেছেন, "কথাটা তখন আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিতাগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়। কিন্তু একটা কথা আমি মানিতে পারি না। তাঁহারা আমার কবিতাকে যখন ঝাপসা বলিতেন, তখন সেই সঙ্গে এই খোঁচাটুকুও ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে যোগ করিয়া দিতেন, ওটা যেন একটা ফ্যাসান। যাহার নিজের দৃষ্টি খুব ভালো সে-ব্যক্তি কোনো

১ জীবনস্মৃতি, ১৩৬০ সং, পৃ. ১১৭।

যুবককে চশমা পরিতে দেখিলে অনেক সময়ে রাগ করে এবং মনে করে, ও বুঝি চশমাটাকে অলংকাররূপে ব্যবহার করিতেছে। বেচারা চোখে কম দেখে এ অপবাদটা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু কম দেখার ভান করে এটা কিছু বেশি হইয়া পড়ে।"[১]

রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্টতা একটা ফ্যাসান অনুপন্থী—এই বোধ অতি তীব্র হয়ে প্রকাশ পায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদের 'মিঠেকড়ায়'। তিনি যেন ফ্যাসানকে ধ্বংস করতেই তাঁর শ্লেষব্যঙ্গের অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তাঁর রসদৃষ্টি যদি স্বচ্ছ থাকত তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, যে কাব্যকে তিনি ফ্যাসান ও অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে করেছিলেন, আসলে তা নূতন সৃষ্টির প্রয়াস যার পেছনে ছিল অপরিমেয় আন্তরিকতা ; ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে বঙ্গবাণীর নবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিকতা।

আসলে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে নব্য বাংলা কাব্য রচিত হত তাতে শব্দের একাধিক ব্যঞ্জনা থাকত না, কাব্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি মিলে একটা নির্দিষ্ট অর্থবলয় সৃষ্টি করত যা বুদ্ধিবিচার দিয়ে সহজেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনা যেত। কাব্যের Classical রূপটা মূলত এই—অর্থাৎ শব্দের বাচ্যার্থ নিয়ে Classical কাব্যের কারবার। কিন্তু যে কাব্যে শব্দের ব্যঙ্গ্যার্থেরই ভিয়েন হয়, সে কাব্য Classical রূপের পরিপন্থী এবং সে কাব্যই প্রকৃতপক্ষে Romantic। এই বিশুদ্ধ Romantic কাব্যের সৃষ্টি সার্থকভাবে প্রথম দেখা দিতে শুরু করল রবীন্দ্রনাথের লেখায়। রবীন্দ্রকাব্যের কথাগুলি পাঠকচিত্তে নিক্ষিপ্ত হল যেমন পুকুরে ঢিল পড়ে—সেই রকম। এবং পুকুরে ঢিল পড়লে যেমন একাধিক বৃত্তাকারে ঊর্মিকম্পন জেগে ওঠে, তেমনি রবীন্দ্রকাব্যের শব্দ পাঠক-

১ জীবনস্মৃতি, পৃ. ১১৭।

চিত্তে একাধিক অর্থবলয় সৃষ্টি করে। কিন্তু সেদিনকার বাঙালি পাঠকের কাছে কাব্যপাঠের এ অভিজ্ঞতা প্রথম দেখা দিল। ইতিপূর্বে তাঁদের কাছে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ যেভাবে পতিত হত তা অনেকটা স্থলভূমিতে ঢিল পড়ার মত—একটি বিশেষ অর্থবলয়ের গণ্ডীতে বদ্ধ। একই কাব্যে একাধিক অর্থ-অনুভবে অনভ্যস্থ সেদিনের সমালোচক তাই রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতা দোষ দেখেছিলেন।

একাধিক অর্থ-ব্যঞ্জনাযুক্ত শব্দ-ব্যবহারের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল সোনার তরী কবিতা। এ কবিতার শব্দসমষ্টি যে কেবলমাত্র একটি বিশেষ অর্থের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয় তা কবিতাটির প্রথমপাঠেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এবং এই কারণেই রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকগণ এ কবিতার নানা তত্ত্ববহুল গুরুগম্ভীর অর্থ করেছিলেন—যা দর্শন ও ধর্মের কোঠায় গিয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁরা এইসব অর্থ ব্যাখ্যা করবার সময় এমন মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন যেন তাঁদের এক একটি তত্ত্বব্যাখ্যার মধ্যেই কবিতাটির প্রকৃত কাব্যমূল্য নিহিত। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, কিম্বা জানতেন না যে, কাব্যের মূল্য তত্ত্বারোপের ওপর তথা কাব্য-বিচার তত্ত্বপ্রেক্ষার ওপর সামান্যই নির্ভর করে। তাছাড়া, কাব্যের অর্থ বলতে যে একটা বিশেষ তত্ত্বই বোঝাবে এমনও কোনো কথা নেই।

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতা সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেন, তাঁর বক্তব্যের সুবিধার জন্যে তিনি সোনার তরী কবিতাকেই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেন। যে কবিতা নিয়ে এত অর্থের ছড়াছড়ি তার বাচ্যার্থে কত অসঙ্গতি তাই দেখাতে তিনি সচেষ্ট হলেন। তিনি সোনার তরী ও সোনার তরী ঘটিত ব্যাখ্যার যে প্যারডি করেছিলেন তার একটা মূল্য ছিল। সে মূল্য হল এই যে, সে প্যারডি রবীন্দ্র-কাব্যপাঠককে কাব্যপাঠ সম্বন্ধে একটা ঔচিত্যবোধের প্রতি সচেতন করতে চেয়েছিল।—কাব্যপাঠ কালে কাব্যের কথাকে

কচলে কচলে তত্ত্বব্যাখ্যা করতে গেলে নেবু কচলানোর দশাই ঘটে। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালও সোনার তরীর অসঙ্গতি দেখাতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলেন যে, কবিতাটি কোনো একটি বিশেষ ঘটনার বিবৃতিমাত্র নয়, ঘটনাটি একটি রসঘন অনুভবের প্রতীক। ঘটনার বিবরণ হলে, সে বিবরণের খুঁটিনাটির অসঙ্গতি বিচার সঙ্গত হত, কিন্তু ঘটনা সেখানে প্রতীকমাত্র, সেখানে ঘটনাবিবৃতির ছোটখাট অসঙ্গতি প্রতীককে ক্ষুণ্ণ করেছে কিনা সেটাই বিচার্য। দ্বিজেন্দ্রলাল সে চেষ্টা করেন নি, ফলে তাঁর সে কাব্য-সমালোচনা প্রকৃত কাব্য-বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে সেদিনের অন্যান্য অভিযোগগুলি, যথা দুর্নীতি, বস্তুতন্ত্রহীনতা, বিদেশীভাবাপন্নতা তথা বাঙালিত্বের অভাব—এগুলি সবই সাহিত্য-বিচারের অঙ্গ করা যেতে পারে, কিন্তু এগুলির প্রকৃত অর্থ ও স্বরূপ না জেনে সাহিত্য-কৃতির মূল্য নির্ধারণ করা চলে না। কিন্তু সেদিন এই ব্যাপারই ঘটেছিল। নিজেদের রুচি ও দাবীর ঠুলি পরে তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করেছিলেন, এবং তাঁদের ইচ্ছাপূর্তি না ঘটাতে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেছিলেন। যাঁরা দুর্নীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন তাঁরা সাহিত্য-নীতির খোঁজ রাখেন নি; যাঁরা বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ এনেছিলেন তাঁরা দেখেন নি তাঁদের নিজেদের সমালোচনাই কতখানি বস্তুতন্ত্রহীন—সাহিত্য বিচার করতে গিয়ে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও উপাদানের বিচারকেই মুখ্য ক'রে ধরেছিলেন। আর যাঁরা বিদেশী-ভাবাপন্নতার জিগির তুলেছিলেন তাঁরা ভুলেছিলেন যে সাহিত্যের সত্যিকার বিদেশীভাবাপন্নতা হল রসের দেশে সাহিত্যের না-থাকা।

তবে এসব অভিযোগের একটা মূল্য ছিল এই যে, এই অভিযোগগুলি সাহিত্য-সমালোচনার মানদণ্ড সম্পর্কে বাদানুবাদ

সৃষ্টি করেছিল, এবং সে মানদণ্ড কি, সে বিষয়ে এই বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ স্বচ্ছদৃষ্টি গঠিত হবার সুযোগদান করেছিল।

অবশ্য এই স্বচ্ছদৃষ্টি গঠিত করার কাজটা মুখ্যত রবীন্দ্রনাথই ক'রে গেছেন। তিনি শুধু রসসৃষ্টি ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, রসশিক্ষা দানও করেছেন যথেষ্ট। সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধীয় তাঁর প্রবন্ধগুলি এ বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করছে। সাহিত্য পাঠকের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার উল্লেখ ক'রে কবি বলেছেন, "কাব্যের একটা প্রধান গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতস বাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতস-বাজি।"[১] কিন্তু যাঁরা কাব্যের মধ্যে তত্ত্ব চান তাঁদের উদ্দেশে কবি বলেছেন, "কবিতা হইতে তত্ত্ব বাহির না করিয়া যাহারা সন্তুষ্ট না হয় তাহাদিগকে বলা যাইতে পারে তত্ত্ব তুমি দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পার কিন্তু কাব্যরসই কবিতার বিশেষত্ব।"[২]

আতসবাজিতে আগুন ধরলে আলোর লীলা দেখা যায়, তেমনি সাহিত্য-সমালোচনা হওয়া উচিত সাহিত্য-ব্যাখ্যার লীলা। সাহিত্য-ব্যাখ্যা কি? এর একটা উত্তর পাওয়া গেল প্রমথ চৌধুরীর কাছে। তিনি জানালেন, "কোন্ কাব্যে কি আছে তাই আবিষ্কার করা এবং প্রকাশ করাই হচ্ছে সমালোচনার শুধু মুখ্য নয়,—একমাত্র উদ্দেশ্য।"[৩] রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার সূত্র দিলেন, "সাহিত্যে

---

১ পঞ্চভূত: কাব্যের তাৎপর্য।

২ সাধনা, চৈত্র, ১২৯৮, পৃ. ৩৮৫।

৩ সবুজ পত্র, ১৩২১, পৃ. ৭১১।

সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে।...সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হ'তে পারে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।"[১]

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকৃত সমালোচনা অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' দিয়ে শুরু হয়। এতেই প্রথম পাওয়া গেল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রয়াস। তাছাড়া কোনো জীবিত লেখক সম্পর্কে সমালোচনা-গ্রন্থরচনার সূত্রপাতও বাংলা-সাহিত্যে এই প্রথম। এর আগে কোনো জীবিত লেখক নিয়ে এ ধরনের প্রয়াস দেখা দেয় নি। এই নূতন প্রয়াস সম্বন্ধে অজিতকুমার সচেতন হয়েই তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে দেশের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তাঁর ধারণার পার্থক্য কতখানি। তিনি লিখলেন, "সাহিত্য-সমালোচনা বলিতে আমাদের দেশের প্রাকৃতজনের সংস্কার এইরূপ যে, রচনামাত্রকে ভাল এবং মন্দ এই দুইটা মোটা ভাগে বিভক্ত করিয়া বাটখারার দুই পাল্লায় চাপাইয়া তৌল করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তির সাহিত্যকে এমন খণ্ডভাবে দেখাকে আমি সত্য দেখা বলিয়া মনে করি না। বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে, সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উভয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। অপূর্ণতা অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট

১ সাহিত্যের পথে, পৃ. ১০২-৩।

পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়—সেইজন্য কবির বা সাহিত্যিকের রচনার মন্দ মানে অপরিণামের মন্দ এবং ভাল মানে পরিণতির ভাল। কবির বা সাহিত্যিকের সেই পরিণতির আদর্শের মানদণ্ডেই তাঁহার রচনার ভালমন্দকে মাপিতে হইবে, তা বই ভাল এবং মন্দকে প্রত্যেকের আপন আপন সংস্কারানুসারে দুই টুক্‌রা করিয়া নিক্তির মাপে ওজন করিলে চলিবে না।”

অজিতকুমার তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থ যে উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছিলেন তা স্পষ্ট ক’রে ব্যক্ত করেছিলেন।—“কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে তাঁহার এই ভিতরকার পরিণতির আদর্শের সূত্রটিকেই আমি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।”

কিন্তু অজিতকুমারের এই প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের সাহিত্যসাধনার ভেতর দিয়ে কবির যে ভাবজীবন গড়ে উঠেছিল তার একটা ইতিহাস ও ব্যাখ্যা কবি স্বয়ং শান্তিনিকেতনে ১৩১৭ সালের মাঝামাঝি তথাকার শিক্ষকদের সভায় পাঠ করেন। সেই ভাষণ থেকেই অজিতকুমার তাঁর লেখার প্রেরণা ও আদর্শ পান। কবির জীবনীকার জানিয়েছেন, “ ‘রাজা’ রচনার পর কবির সাহিত্যিক রচনা কিছুকাল চোখে পড়ে না। তিনি কয়েকমাস হইতে ‘জীবনস্মৃতি’র খসড়াটি আশ্রমের অধ্যাপকদের নিকট পড়িয়া শুনাইতেছেন এবং নিজ কাব্য লইয়া ধারাবাহিক আলোচনা করিতেছেন। কবির এই আলোচনা কেন্দ্র করিয়া অজিতকুমার নিজ প্রতিভাবলে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দিয়া তাঁহার ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামে পুস্তিকাটি লিখিয়া ফেলেন; উহা কবির পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবে আশ্রম-বাসীদের সম্মুখে পঠিত হয়।”[১] এর বহু আগেও কবি জানিয়েছিলেন কবিকর্মকে সমগ্রভাবে দেখার প্রয়োজন কেন।—“অনেক ‘সময়

---

১ রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-৯।

কবিতা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় ; কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে স্ফুটতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্মকথাটি পাঠকের নিকটে সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত সেইরূপ বৃহৎভাবে পরিচয় হইয়া গেলে, তখন, প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে।”[১] অজিতকুমারের রসশিক্ষা ছিল গভীর, সাহিত্য-বোধ অতি তীক্ষ্ণ, এবং পাণ্ডিত্য বহু-বিস্তৃত। এইসব গুণ তাঁর সমালোচনাকে মহিমান্বিত করেছিল, যার মূল্য আজও বহুধা স্বীকৃত।

প্রকৃতপক্ষে অজিতকুমারের ‘রবীন্দ্রনাথ’ হল পরবর্তী রবীন্দ্র-সমালোচনার গঙ্গোত্রী। যে ধারায় রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাখ্যা অজিতকুমার করেছিলেন, সেই ধারাই পরবর্তী সকল রবীন্দ্র-সমালোচকের লেখাতে প্রবাহিত হয়েছে। সেই একইভাবে কবির ভাব-জীবনের ব্যাখ্যা, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকে একটা তত্ত্বের মধ্যে বিধৃত করার প্রচেষ্টা! রবীন্দ্র-মানস নিয়েই আমাদের সমালোচকদের যত গবেষণা, এবং কবির জীবনী মিলিয়ে কবির সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করাকে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার চূড়ান্ত সাধনা বলে জ্ঞান করা হচ্ছে। এই একদেশদর্শী সমালোচনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে সাহিত্যের অধ্যাপকদের কৃপায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাসাহিত্যের পঠন-পাঠনে রবীন্দ্রসাহিত্য অন্তর্ভুক্ত, অতএব ছাত্রছাত্রীদের মনে রবীন্দ্রসাহিত্য বোধোদয়কল্পে অধ্যাপকগণ রবীন্দ্র-টীকা রচনায় প্রবল অধ্যবসায়ের পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা শুধু অজিতকুমারকে অনুসরণ করা এবং ছাত্রোপযোগী রবীন্দ্রকাব্যের ভাববস্তু চর্বিতচর্বণভাবে ব্যাখ্যা করা। সে ভাবব্যাখ্যাও আবার শুধু তত্ত্বগত, কাব্য-কল্পনাগত

১ কাব্য গ্রন্থাবলী, ১৩০৩। ভূমিকা।

নয়। আমাদের অধ্যাপকদের লেখা সমালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই নিজেও একদা বলেছেন, "এখানকার অধ্যাপকদের লেখা সমালোচনা পড়েছি ; বাঁধা মতের পণ্য নিয়ে ছাত্র পড়াতে তাঁদের মন অভ্যস্ত, ইস্কুল মাস্টারির গণ্ডী তাঁরা পেরোতে পারেন নি। য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের রচিত আলোচনা তো পড়েছ, তার মধ্যে মতামতের চেয়ে বড়ো জিনিষ হচ্চে তার শক্তি, তার অনুপ্রেরণা।"[১]

অজিতকুমার যে সময় 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি লিখেছিলেন সে সময় তার একটা কালানুগত প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তখন বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশের ধূয়া উঠেছিল ; সমালোচনার নামে যা চলছিল তা হল এই—অমুক লেখাটি আমি বুঝেছি অতএব তা ভালো, অমুক লেখাটি বুঝি নি অতএব তা কিছু না, সাহিত্যে অপাংক্তেয়। এবং সেদিন যাঁরা বাংলাসাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে দিক্‌পাল হিসেবে বিরাজ করছিলেন তাঁদের লেখনী মারফৎ এমন কথা প্রচারিত হচ্ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য নিতান্তই একটা ফ্যাশন, লঘু কল্পনাবিলাস ; তাতে নেই গভীর ভাব ও মহত্ত্ব।

এই ধরনের রবীন্দ্র-সমালোচনায় প্রতিবাদ হিসেবেই 'রবীন্দ্রনাথ' লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি যে একটা ফ্যাশান নয়, খেয়ালখুশি মতো কথার জাল বোনা নয়, তাই জানবার জন্যেই কবির ভাবজীবনের ব্যাখ্যা করা হল অমন নিপুণভাবে, দেখানো হল কবির মানসলোক কত গভীর ভাব ও তত্ত্বে পরিপ্লুত, যার প্রতিফলন নানা বৈচিত্র্যে ফুটে উঠেছে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে। এ গ্রন্থে তাই সাহিত্য-ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভাব ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যারই প্রাধান্য।

---

১ ১৩৩৭ সালে শ্রীশ্যামাদাস লাহিড়ীকে লিখিত পত্র। শারদীয়া দেশ, ১৩৬৫, পৃ. ১০।

অথচ সাহিত্যসৃষ্টিকে প্রকৃত রসগতভাবে বিচার করা, রসানুভূতির নিরীখে তার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করার কাজ অজিতকুমারের পক্ষে যে কতখানি সহজ ছিল তার নিদর্শন পাই তাঁর কাব্যপরিক্রমা পুস্তকে। এই গ্রন্থে রাজা, ডাকঘর, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, গীতাঞ্জলি ইত্যাদির যে আলোচনা আছে তাতে পাওয়া যায় প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনার একটা আদর্শ। ভাব ও রূপ মিলিয়ে সাহিত্যের যে রসমূর্তি, তারই ব্যাখ্যা ও পরিচয় আছে এই গ্রন্থে।

কিন্তু রবীন্দ্র-সমালোচনার দুর্ভাগ্য যে পরবর্তী সমালোচকগণ অজিতকুমারের 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে পাঠ নিয়েছেন যতটা 'কাব্য-পরিক্রমা'-কে অবহেলা করেছেন প্রায় ততটা। ফলে, 'কাব্য-পরিক্রমা'র রীতিমত অনুশীলনে যে রসশিক্ষা গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল, তা নষ্ট হয়েছে। সকলেই মেতেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে ও অন্যান্য লেখায় কেবল নির্জলা তত্ত্ব অন্বেষণ করতে। তাঁদের সকলের লেখাতেই সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ববোধ, তাঁর কাব্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব, প্রকৃতি-তত্ত্ব, তাঁর ধর্মাদর্শ, ভূমাবোধ, প্রেম ও নারী সম্বন্ধীয় দর্শন ইত্যাদি। অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে আমাদের সমালোচকগণ রবীন্দ্র-দর্শনের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছেন।

এই কারণেই আমাদের রবীন্দ্র-সমালোচনা আজও এত অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যে দু'একজন কিছু কথা বলেছেন, তাঁদের সে কথার মধ্যে এই ক্রটি দূরীকরণ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ নির্দেশ নেই। একদা মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন, "এতকাল পরে এ যুগেও কেহ কেহ যে-ভাবে কাব্য জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাকে কাব্য-পরিমিতি কেন, কাব্য-জ্যামিতি বলাও চলে; সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্র অনুসারে তাঁহারা যে-ভাবে

রবীন্দ্র-কাব্যের রস-প্রমাণে যত্নবান হইয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, শুধুই রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়, সকল আধুনিক সাহিত্যের রসাস্বাদে তাঁহারা এখনো পরাঙ্মুখ।"[১] কিন্তু এ কথায় অভিযোগের সুর যতটা, ততটা সে-অভিযোগের ব্যাখ্যা নেই। সংস্কৃত অলঙ্কার-সূত্র অনুসারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের তথা আধুনিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা বা রসবিচার চলে না কেন, এর কোনো কারণ দেখান নি মোহিতলাল।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-সমালোচনার ত্রুটির মূলে সমালোচকদের মনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মহত্ত্বচেতনাকে দেখেছেন। তাঁর মতে, "অজিতকুমারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাতা, তাঁরা সকলেই তাঁর মর্ত্যরূপের পরিচয় পেয়েছিলেন। কেউ-কেউ ঘনিষ্ঠ-ভাবে। এটা সুবিধে, কিন্তু অসুবিধেও, বোধহয় অসুবিধেই বেশি। তিনি যে কত বড়ো শুধু কবিত্বে নয়, ব্যক্তিত্বেও—সে-কথা চেষ্টা করেও ভুলে থাকা বর্তমান কালের লেখকের পক্ষে দুঃসাধ্য, আর এই আনুক্ষণিক মহত্ত্বচেতনা জীবনী রচনার বিঘ্ন, সমালোচনার অন্তরায়।"[২] এ-কথা বিশেষ মেজাজের কথা, যুক্তির নয়। মহত্ত্ব-চেতনা যদি সমালোচনার অন্তরায় হয়, তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আজও পর্যন্ত শেকস্‌পীয়র সম্বন্ধে সমালোচকদের মনে যে আনুক্ষণিক মহত্ত্ব-চেতনার অস্তিত্ব দেখা গেছে তাতে শেকস্‌পীয়র-সমালোচনারও দুর্ভোগ ঘটা উচিৎ ছিল। কিন্তু ইতিহাস কি সে-কথা বলে? রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁদের মনে বিশেষ কোনোই মহত্ত্ববোধ ছিল না, কৈ, তাঁদের রবীন্দ্র-সমালোচনাও তো মূল্যবান হল না।

ধূর্জটী মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "সমগ্রতার সাধনাই যদি রবীন্দ্রনাথের সাধনা হয়, তবে তাঁকে বোঝবার ও বোঝাবার, অর্থাৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যের

১ জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৃ. ১২১।

২ সাহিত্যচর্চা, ১৩৬১, পৃ. ১৬২।

সমালোচনা ঐ সমগ্র-সাধনার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। নচেৎ আমরা রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভায় দিশাহারা হয়ে যাব এবং তাঁর সৃষ্টির তাৎপর্য গল্প, নভেল, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, স্বদেশ-প্রেম, সঙ্গীত, শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মপ্রবৃত্তির তালিকায় পরিণত হবে—যা এতদিন ধ'রে হয়ে আসছে ও আজও হচ্ছে।"[১] এখানেও কথাটা স্পষ্ট হয় নি; কারণ, প্রশ্ন আসে, সাহিত্য-সমালোচনা কীভাবে সামগ্র্য-সাধনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? অবশ্য ধূর্জটীপ্রসাদ নিজের কথাকে খানিক স্পষ্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, "…কেবল কবিতার সাহিত্যিক বিচার চলবে না, যেখানে কবিতা সঙ্গীতের কোলে মূর্চ্ছিত হচ্ছে তার সন্ধান দিতে হবে; কেবল সামাজিক বিচারও অসম্পূর্ণ, যেখানে সমাজ কবিকে, ঐতিহ্য কবিতার রূপ ও বিষয়কে মুক্ত হবার সুযোগ দিচ্ছে তার ঠিকানাও জানা চাই। এই ভাবে দেখলে খণ্ডবোধের দোষ বিনষ্ট হয় এবং সমগ্রবোধের আভাস ফিরে আসে, অথবা জন্মায়।"[২] অর্থাৎ, লেখকের মতে, সাহিত্য-সমালোচনা খণ্ডিত দৃষ্টিতে হলে সাহিত্যের প্রতি সুবিচার হয় না, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে। যদিও একথা বিশেষ ব্যাখ্যাত হয় নি তবু একথা মূল্যবান।

আসলে, সাহিত্য-সমালোচনা যখন প্রকৃত রস-সমীক্ষা করে তখনি তা আত্ম-প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণ। সাহিত্যের সত্য যেমন শুধু উপকরণ নয়, অর্থাৎ ভাষা, ভাববস্তু, লেখকের জীবনী কিংবা তাঁর মানস-লোকের ইতিহাসমাত্র নয়,—তার সত্য হল এইসব বিবিধ বস্তু দ্বারা সৃষ্ট রসমূর্তি, তেমনি সমালোচনার সত্য হল সাহিত্যের এই

১ বক্তব্য, ১৩৬৪, পৃ. ১০৩-৪।
২ ঐ পৃ. ১০৯।

রসমূর্তির ব্যাখ্যা ও বিচার। সাহিত্য-সমালোচনার সামগ্র্য-সাধনা হল রস-সমীক্ষার সাধনা।

রসের ব্যাখ্যা ও বিচার করতে গেলে যেসব উপাদান নিয়ে সেই রসের সৃষ্টি, তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও প্রয়োজন। বস্তুত, এইসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর ক'রেই রসবিচার গড়ে ওঠে। অতএব সাহিত্য-সমালোচনায় ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও অন্যান্য বিদ্যা সবই থাকতে পারে, কারণ সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও তার প্রকাশ এইসব জিনিসের সঙ্গেই সংযোগ রাখে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচক তাঁর মুখ্য কর্তব্য যেন বিস্মৃত না হন, তাঁকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে এইসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গৌণভাবে আসল-উদ্দেশ্যকে পূরণ করছে মাত্র, যে উদ্দেশ্য হল রস-সমীক্ষা।

রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা এযাবৎ যা হয়েছে তার প্রধানতম ত্রুটি হল এই যে, এ-সমালোচনা প্রকৃত রস-সমীক্ষার ওপর নিজেকে অতি অল্পই প্রতিষ্ঠিত করেছে। রবীন্দ্র-মানস অনুসন্ধান রবীন্দ্রসাহিত্যের রস-সমীক্ষা নয়, রস-সমীক্ষার সাহায্যকারী একটা উপাদান মাত্র। তেমনি জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির ধারণা এবং সেই ধারণা-ধৃত কবিমনের ভাবধারার সন্ধান নেওয়াটাও কবির সাহিত্যসৃষ্টির রসমূর্তি বিচার করার অন্যতম উপাদান বা সহায়ক। আমাদের সমালোচকগণ আজ অবধি এই দু'একটি উপাদান অবলম্বন ক'রে উনবিংশ শতাব্দীয় প্রচেষ্টা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের ওপর কিছু Bio-critical গ্রন্থ লিখেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থ লেখা পরিশ্রমসাপেক্ষ হলেও বিশেষ ক্ষমতার মুখাপেক্ষী নয় এবং এমন রচনার জন্যে সাহিত্য রস-বোধ বিশেষ না থাকলেও চলে। কিছু কবির জীবনী-তথ্য, কিছু কবির ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যা, তাঁর রচনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ ও উৎস-সন্ধান, আর কিছু রচনার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা ও কবির রচনা

সমালোচকের মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে তার খানিক ব্যক্তিগত বিবরণ—এই মিলিয়ে রচিত হয়েছে খানকয়েক রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, পরিক্রমা, নির্ঝর ও প্রবাহ।

সুতরাং বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা এখনো শুরুই হয় নি। এমন সমালোচনার সাহায্যকারী কিছু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে মাত্র। ইংরেজিতে যাকে Practical Criticism বলে, কিংবা নব্য সমালোচনা—New Criticism-এর যে ধারা দেখা দিয়েছে, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এখনো তার কোনো নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় নি, সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে এমন সমালোচনার প্রবর্তনা সম্ভব হয় নি। একমাত্র মোহিতলালই এ জাতীয় সমালোচনার নির্জন দীপশিখা।

তবে এটা হতাশার সুর নয়; রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তারই উল্লেখ করা হল, এবং এ-সমালোচনার সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি কোথায় প্রসঙ্গত তার খতিয়ান করা গেল। রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা দেশে আজ যেভাবে প্রসার লাভ করছে, তাতে নিশ্চয়ই আশা করব যে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা অচিরেই দেখা দেবে, যে-সমালোচনার উদ্দেশ্য হবে রস-সমীক্ষা এবং যার ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয় ও আস্বাদন গভীরতর ও বৃহত্তরভাবে প্রসারিত হবে এবং মূল্যায়িত হবে।

ভ্রমসংশোধন: ৫২ পৃষ্ঠার সাত লাইনে 'মোহিতচন্দ্র'-র স্থানে 'সত্যেন্দ্রপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়' পড়তে হবে।

রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থপঞ্জী

এ গ্রন্থপঞ্জী কালানুক্রমিক। যে-সব পুস্তক-পুস্তিকা পূর্ণাঙ্গরূপে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কিত তাদেরকেই এই গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে 'দেশ' পত্রিকায় (২৩শে বৈশাখ, ১৩৬২) প্রকাশিত শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত 'রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থপঞ্জী' স্মরণ করা অত্যাবশ্যক।

১৩১৯	অজিতকুমার চক্রবর্তী	রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ১০৫।
১৩২০	[বিনয়কুমার সরকার]	রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী। পৃ. ১৫০।
১৩২১ [?]	ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব। পৃ. ২২।
”	উপেন্দ্রকুমার কর	"গীতাঞ্জলি"-সমালোচনা (প্রতিবাদ)। পৃ. ১০৪।
”	একরামদ্দীন	রবীন্দ্র-প্রতিভা। পৃ. ১২৯।
১৩২২	অজিতকুমার চক্রবর্তী	কাব্যপরিক্রমা। পৃ. ১২৩।
১৩২৩	অমরেন্দ্রনাথ রায়	রবিয়ানা। পৃ. ৮৭।
১৩২৯	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের ছন্দ। পৃ. ৮৭।
”	রাধাচরণ দাস	কবির স্বপ্ন [খেয়া কাব্যের আলোচনা] (দ্বিতীয় সং, ১৩৫৭)। পৃ. ৩৬।
১৩৩৩	ভোলানাথ সেন	রক্তকরবীর মর্মকথা। পৃ. ৫৩।
১৩৩৪	কাজী আবদুল ওদুদ	রবীন্দ্রকাব্য পাঠ। পৃ. ১২৮।
১৩৩৬	শিবকৃষ্ণ দত্ত	রবীন্দ্র-সাধনা। পৃ. ১২৪।
১৩৩৭	প্রেসিডেন্সি কলেজ রবীন্দ্র-পরিষদ	কবি-পরিচিতি। পৃ. ২০৪।
”	বিশ্বপতি চৌধুরী	কাব্যে রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ২১৮।
১৩৩৮	নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম	কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার রূপ ও রস। পৃ. ১১১।

১৩৩৮	প্রবোধচন্দ্র সেন	বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান। পৃ. ২৮।
”	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ১০৫।
”	রবীন্দ্র-পরিচয় সভা	জয়ন্তী-উৎসর্গ। পৃ. ৪৯৯।
১৩৩৯	ননীলাল ভট্টাচার্য	রবীন্দ্রনাথের কাব্য। পৃ. ৪০।
”	যোগেশচন্দ্র বর্মণরায়	কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। পৃ. ২০৪।
১৩৪০-৪৩	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক। ২ খণ্ড। (বহু পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং, ১৩৫৩-৫৯। ৩ খণ্ড)
১৩৪০	প্রিয়লাল দাস	রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ২১৭। [পুস্তকের অন্তর্গত রচনাগুলি ১৩২০-১৩৩০ সালের মধ্যে লিখিত]
১৩৪১	সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ৩১৯।
”	সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	রবি-দীপিতা। পৃ. ২৪৮।
১৩৪২	গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত	সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ১০৫।
১৩৪৩	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ৯৬
১৩৪৪-৪৬	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রবি-রশ্মি। ২ খণ্ড।
১৩৪৫	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র। পৃ. ৭৪।
১৩৪৬	প্রমথনাথ বিশী	রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ। পৃ. ২৭০। (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং, ১৩৫৫-৫৬। ২ খণ্ড)
	শচীন সেন	রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়। পৃ. ২৪৫।
১৩৪৮	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রকথা। পৃ. ৪৮২।

[১৩৪৮]	দক্ষিণারঞ্জন বসু	শতাব্দীর সূর্য। পৃ. ১৯২।
”	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ২০৭।
”	নীহাররঞ্জন রায়	রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা। পৃ. ৪৭৯। (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং, ১৩৫১। ২ খণ্ড)
”	সরসীলাল সরকার	রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা। পৃ. ১২৮।
”	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ৮৯।
১৩৪৯	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচিতি। পৃ. ১৩৪।
”	নলিনীকান্ত গুপ্ত	রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ১২৮।
১৩৫০	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য	প্রভাত রবি। পৃ. ২৪৬।
”	রাইচরণ চক্রবর্তী	কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ৪০।
১৩৫১	রেণু মিত্র	রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে। পৃ. ১০৪।
১৩৫২	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ১৮৪।
”	প্রবোধচন্দ্র সেন	ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ২১৫।
১৩৫৩	প্রমথনাথ বিশী	রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর। পৃ. ১১০।
১৩৫৪	অমিয়কুমার সেন	প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ২৪৪।
”	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা প্রথম খণ্ড, কাব্য। পৃ. ২১৬।
[”]	বিশ্বপতি চৌধুরী	কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ১১৫।
১৩৫৫ ৫৮	খগেন্দ্রনাথ বসু	রবীন্দ্রকাব্য। পৃ. ৬৩।

১৩৫৫-৫৮	প্রমথনাথ বিশী	রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ। ২ খণ্ড।
”	সুধীরচন্দ্র কর	জনগণের রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ১৫২।
১৩৫৬	অশোক সেন	রবীন্দ্রনাথ। ২ খণ্ড।
”	”	কল্পনা (রবীন্দ্রনাথ)। পৃ. ৫৮।
”	প্রবাসজীবন চৌধুরী	রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ। পৃ. ৮২।
”	মোহিতলাল মজুমদার	রবি-প্রদক্ষিণ। পৃ. ১৯১।
”	যতীন্দ্রমোহন বাগচী	রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। পৃ. ১০৭।
১৩৫৭	সরোজকুমার বসু	রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস। পৃ. ১০৫।
”	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রদর্শন। পৃ. ৮২।
১৩৫৮	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	কবিগুরু। পৃ. ১৭৪।
১৩৫৯	ক্ষিতিমোহন সেন	বলাকাকাব্য পরিক্রমা। পৃ. ২১৮।
”	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী	রবীন্দ্র-মানস। পৃ. ১৬৬।
”	তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিগুরুর রক্তকরবী। পৃ. ১৫০।
১৩৫৯-৬০	মোহিতলাল মজুমদার	কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য। ২ খণ্ড
”	রামকানাই দেবশর্মা	রবীন্দ্র-গীতা। ২ খণ্ড [গীতাঞ্জলির ব্যাখ্যা]
১৩৫৯	সুকুমার সেন	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ৩৯০।
১৩৬০	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা। পৃ. ৬৭১।
”	কনক বন্দ্যোপাধ্যায়	রবি-পরিক্রমা। পৃ. ১৩২।
”	ক্ষুদিরাম দাস	রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়। পৃ. ৪৭৯।

নির্দেশিকা

অ

অক্ষয়কুমার বড়াল—১৭৩
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৪০
অক্ষয়চন্দ্র সরকার—৬, ২২, ২৩ (পা-টী), ২৪
'অচলায়তন'—৭৫-৭৬, ৮৩-৮৫, ১২১, ২৫৯, ২৭৩
অজিতকুমার চক্রবর্তী—৬১, ৭৫, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১৩৬-১৩৯, ১৫১, ১৬০, ২৪১, ২৬৩, ২৬৪, ২৯৯-৩০৩, ৩০৪
অতুলচন্দ্র গুপ্ত—১৮১
'অনাদৃত'—৩৫, ৩৭
'অবকাশরঞ্জনী'—১৪৯
'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'—২৭৯
অমরেন্দ্রনাথ রায়—৮২, ১৪৬-১৪৭
অমিত্রাক্ষর ছন্দ—১০
অমিয়কুমার সেন—২৮৩-২৮৫
'অমৃতবাজার পত্রিকা'—৪
অয়কেন—(Eucken)—১২৫, ১২৭, ১২৮
'অর্চনা'—৮২, ১৩৪

আ

'আত্মপরিচয়'—৫
আদিত্য ওহদেদার—৬০
'আধুনিক কাব্যের প্রকৃতি'—১৩৬
'আনন্দ-বিদায়'—১০৬
আবদুল ওদুদ—১৬৪, ১৬৮-১৬৯
'আমার জীবন'—৬
আমিয়েলের জার্ণাল (Amiel's Journal)—৯৫
'আর্যদর্শন'—১২, ১৩
'আর্যাবর্ত'—৮৪, ৮৫

ই

'ইন্দিরা'—৯৯
ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—১৮৩
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—১১৫
ইয়েটস্ (W. B. Yeats)—১১০-১

ঈ

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২৮
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—৭

উ

উপনিষদ—২৭৯
'উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ'—১৮২
উপেন্দ্রনাথ কর—১৪০
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—২৬২-২৬৪
'উমা'—৫৯

ঋ

'ঋষি রবীন্দ্রনাথ'—১১৬-১১৮

এ

এক্রামদ্দীন—১৩৯-১৪০
'এবার ফিরাও মোরে'—৩৭, ১৫৫, ২৩৭
'এষার কবি'—১৭৩

ও

ওয়ার্ডস্বার্থ (Wordsworth)—৮৮, ১০৬

ক

'কড়ি ও কোমল'—২১, ২১৬
'কণিকা'—৪০-৪১
'কথা'—৪৭-৪৮
'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ'—১০০, ১৫৪, ২৭৫
'কবিকঙ্কণ'—২৩, ২৪
'কবিকাহিনী'—৭-৯, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫
'কবি-পরিচিতি'—১৭৪
'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য'—২৬৪
'কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব'—১১৫
কমলা (রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা)—১৯
'করুণা'—১৯
'কল্লোল'—১৫১-১৫৩, ২৫১, ২৭৩, ২৭৪
'কাকাতুয়া দেবশর্ম্মা'—২৬
কাদম্বরী দেবী—৫, ১৭
কাদম্বিনী দেবী—১
'কাব্য-গ্রন্থাবলী'—৫২
'কাব্যপরিক্রমা'—১৩৬, ২৪২, ৩০৩
'কাব্য, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট'—২২-২৪,
'কাব্যি-সমালোচনা'—২২
'কাব্যে গন্ধ'—৮২
'কাব্যে নীতি'—৬৭
'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ'—১৬৯-১৭৪
'কাব্যের প্রকাশ'—৬১
কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়—৫
কার্দুচি (Carducci)—২০৮
কার্পেন্টার (Edward Carpenter) —১৩৮, ২২৫
কার্লাইল (Carlyle)—১২৫
'কালিকলম'—১৫১, ২৫১
কালিদাস—১১৯, ১৭৭, ২০৮, ২০৯, ২৩২, ২৫৪
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩১
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—২৪-২৭
কালীপ্রসন্ন ঘোষ—৭, ৯, ১০
কালীবর বেদান্তবাগীশ—৫
কাশীরাম দাস—২৪
'কাহিনী'—৪৭
কীটস্ (Keats)—২০৯, ২১০, ২৩২,
'কুমারসম্ভব'—১১৯
'কুহুধ্বনি'—৪২
কৃত্তিবাস—২৪
'কৃষ্ণকান্তের উইল'—১৬৬
'ক্ষণিকা'—১০৩-১০৫
'ক্ষণিকের গান'—৫১
ক্ষিতিমোহন সেন—১৮০, ২৮৭
ক্ষুদিরাম দাস—২৭৮-২৮১

খ

'খেয়া'—১৬০

গ

গর্কি (Gorky)—২৪৬
'গল্পগুচ্ছ'—১৯৩, ২৪৫-২৪৭, ২৭০-২৭১, ২৯০-২৯১
গিরিজা মুখোপাধ্যায়—১৭৮
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—২৮
'গীতগোবিন্দ'—১০৭
'গীতাঞ্জলি'—১১০, ১১৫, ১৩৭-১৩৮, ১৪০-১৪৪, ১৫৪, ১৬০, ১৭১, ২৩১, ২৩৬, ২৮৪
'গীতালি'—১১৮, ১৭১
'গীতিমাল্য'—১৩৭, ১৩৮, ১৬০, ১৬০, ১৭১
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১
গুর্মঁ (Rémy de Gourmont)—১০৪

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩
'গৃহ-প্রবেশ'—১৬৪
গোবিন্দদাস—১৪৫
গোবিন্দবাবু—৪
'গোরা'—৭৩-৭৪, ৮১, ৮৪, ১০২, ১২৬, ২৭৩, ২৭৮
গ্যয়টে (Goethe)—৮৮

ঘ

'ঘরে-বাইরে'—১২৯-১৩৫, ১৫৩, ২৭২

চ

চণ্ডীদাস—১০৭, ১৪৫, ১৫৩
'চতুরঙ্গ'—১৮৩, ২৭২
চন্দ্রনাথ বসু—২১
'চন্দ্রশেখর'—৫৮
'চরিত-চিত্র—রবীন্দ্রনাথ'—৭৭
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৬৪, ১৬৭-১৬৮, ১৮৭, ২২১-২২৪
'চিত্রা'—৩৮, ৫৭, ৮৯
চিত্রাঙ্গদা—৩১-৩২, ৩৬, ৬৮-৭২, ১০৫, ১৭৫, ১৭৭-১৭৮, ২৪৪, ২৭৯
চেখভ (Chekhov)—২৪৬
'চোখের বালি'—৫২, ৫৮-৬০, ১০১, ১৫৯, ১৬৬, ২৭৭
'চোখের বালি ও উমা'—৬০
'চৈতালি'—৩৮-৪০, ৮৯, ১০৫, ২০০, ২৩৫-২৩৬, ২৬৯

ছ

ছন্দ—১০, ১৮, ৩০-৩১, ৪২-৪৬, ১৪৪-১৪৬, ২৬৭-২৬৮
'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'—৪৬
ছলিক—২১৭
'ছিন্নপত্র'—৯৩, ৯৫, ২৭৩

জ

জয়দেব—১৫৩
'জয়ন্তী-উৎসর্গ'— ১৭৯, ১৯১
জারভিনাস (Gervinus)—১৭৬
'জীবন-দেবতা'—৯৬
'জীবন-স্মৃতি'—১, ১০-১১, ১৯, ২১, ৭৬-৭৭, ৮২, ৯৩, ২৬৭, ২৯৪, ২৯৫, ৩০০
'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'—৪
জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়—১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী—২৮১-২৮২
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—৫, ১৭, ১৮

ঝ

'ঝুলন'—৩৫, ৩৭

ট

টম্প্‌সন (Edward Thompson) ১৩৮, ১৭৫
টলস্টয় (Tolstoy)—৪৬, ১১৫
'টীকাটিপ্পনি'—১২৯
টেইন (Taine)—১৭৬

ড

'ডাকঘর'—৯০-৯৩, ১২১, ১২৬, ২৩৯, ২৫৯
ডিকেন্স (Dickens)—৪৬

ত

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'—৪
'তপতী'—২৫৯
তুলসীদাস—১১৯

থ

থ্যাকারে (Thackeray)—৪৬

দ

'দাসী'—৩৮
দেবকুমার রায়চৌধুরী—৬৫
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৬
দেবেন্দ্রনাথ সেন—২৬
'দেশ'—৩০২
'দেশনায়ক'—১৮১
'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা'—৪
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—২৭
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৫, ১৫
'দ্বিজেন্দ্রলাল'—৬৫
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৬১-৭২, ১০৬-১১০, ২৯৬

ধ

'ধর্মসঙ্গীত'—১৩৭
ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—১৬৪,২৪৯-২৫১, ৩০৪-৩০৫

ন

'নটীর পূজা'—১৬৪
নবগোপাল মিত্র—৩
'নবজীবন'—২২
নবপুরাণসৃষ্টি (myth-making)—২০৯
'নববর্ষা'—৫১
নবীনচন্দ্র সেন—৫, ১২, ১৩, ২৮, ১৪৪, ১৪৯
'নব্য কবিতা'—৯৮-৯৯
নরেন্দ্রনাথ শেঠ—১৮৬
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—১৪৯, ১৫৪-১৫৫, ১৫৮, ১৮৩
নলিনীকান্ত গুপ্ত—১৮৮
'নষ্টনীড়'—১০২
'নারায়ণ'—১৪৫, ১৪৮, ১৫১, ১৭৩
নিত্যকৃষ্ণ বসু—৩০-৩২, ৩৪-৩৮
নিধুবাবু—১২০
'নিষ্ঠা'—৭৪
নীহাররঞ্জন রায়—১৬০, ২৪০-২৪৫, ২৫৩
'নূতন বৌঠান' (কাদম্বরী দেবী)—৫, ১৭
'নেশনাল মেলা'—৬
'নৈবেদ্য'—১১৫, ১৫৪
নোবেল-পুরস্কার—১১৩, ১৪৭
'নৌকাডুবি'—১০১-১০২, ২৭৭
'ন্যাশানাল পেপার'—৩

প

'পঞ্চভূত'—২৯৮
'পথ ও পাওয়া'—১৮১
'পরিচয়'—২৪৫
'পলাতকা'—১৬০, ২২৮
'পলাশীর যুদ্ধ'—১২
'পসারিণী'—৫১
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—৫৯
'পূরবী'—১৬০-১৬১
'প্রতিভা'—১০০, ১০২
প্রতিভা (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা)-১৩
'প্রতীক্ষা'—৩৫
'প্রদীপ'—৪০-৪১, ৪৭
প্রদ্যোতকুমার সেন—২৮৮
প্রফুল্লচন্দ্র রায়—১৮১

'প্রবাসী'—৬৫, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯৫, ৯৭, ১৩৩, ১৩৬, ১৪৯, ১৬০, ১৬৭, ১৬৯, ২৫৩
প্রবোধচন্দ্র সেন—৪৬, ১৮৩
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ব্যারিস্টার ও সাহিত্যিক)—৪০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্র-জীবনীকার)—৩৮, ১৯৭-২০০
প্রমথ চৌধুরী—১০৭-১০৮, ১২৭-১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৪৮, ১৭৫-১৭৮, ২৩১, ২৯৮
প্রমথনাথ বসু—১৯
প্রমথনাথ বিশী—২২৯-২৩৮, ২৫৩-২৬২, ২৮২
'প্রয়াস'—২৯
'প্রলাপ'—৪
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ—২৫৩
প্রিয়নাথ সেন—১১, ১৯, ৩২, ৬৯-৭২, ১৭৬
'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি'—৬৯
প্রিয়লাল দাস—১৭৩

ফ

'ফাল্গুনী'—১৬৯, ২১৬, ২১৭, ২৫৯
ফেক্‌নার (Fechner)—৯৬
ফ্রয়েড (Freud)—২২৫, ২২৬

ব

'বক্তব্য'—৩০৫
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৩, ১৪ ১৯-২০, ২১, ২৭, ২৮, ৯৯, ১৬৫, ২২৮, ২৭৫
'বঙ্গদর্শন'—৭, ১৪ (পা-টী), ৫৮, ৬১, ৭৭
'বঙ্গবাণী'—১৫৮, ১৬৫
'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ'—১৬৫
'বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা'—৫৫
'বঙ্গীয় সমালোচক (কাব্য)'—২৭
'বনফুল'—৪, ২৫৩, ২৫৪
'বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য'—১৪৮
'বর্ষশেষ'—২০৯, ২১১, ২৮২
বলরাম দাস—২৩-২৪
'বলাকা'—১৬০, ১৭৮-১৭৯, ২১৬, ২১৮-২১৯, ২৮০
'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'—২৮৭
'বলাকার যুগ'—১৭৮
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—১৪৪
বসুধা চক্রবর্তী—২৪৮
'বসুন্ধরা'—৩৪-৩৬
'বাউল রবীন্দ্রনাথ'—১১৮
'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথ'—১৮৩
'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—২৫ (পা-টী)
'বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান—প্রেমের নূতন রূপ'—১৮৪
'বাঙ্গলার কথার আভিজাত্য'—১৫৪
'বান্ধব'—৭, ১২, ২৯৪
বায়রণ (Byron)—১০৬, ২৫০
বার্গসঁ (Bergson)—৯৬, ১৭৭, ২৮০
'বাল্মীকি-প্রতিভা'—১৩-১৪,
'বাল্মীকির জয়'—১৪
'বাস্তব'—১২২-১২৪
'বিচিত্রা'—১৫৭, ১৬২
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—২২৫-২২৯
'বিজয়া'—১৪৩
'বিদায় অভিশাপ'—৩৬, ২৪৪
'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'—১৩

বিদ্যাপতি—১০৭, ১৪৫, ১৫৩
বিনয়কুমার সরকার—১৯১, ২০১
বিনয় ঘোষ—২৪৯
'বিনয় সরকারের বৈঠকে'—২০১,২০২
বিপিনচন্দ্র পাল—৭৭-৮০, ৮৯, ১১৯, ১৪৮
বিশ্বপতি চৌধুরী—১৬৯-১৭৪, ১৮৫, ২৭৫-২৭৮
বিশ্বভারতী—১৮০
'বিষবৃক্ষ'—৫৮, ১৬৬
'বিসর্জন'—১২১, ১৩৯, ২৫৮-২৫৯
বিহারীলাল গোস্বামী—৪২
বিহারীলাল চক্রবর্তী—৫, ১২, ১৭, ১৮, ২৮, ১৭৩, ২৫৪
বীরচন্দ্র মাণিক্য—১০
'বীরভূমি'—১৩৯
'বুদ্ধচরিত'—১০৭
বুদ্ধদেব বসু—২০২, ২০৩, ২৭০-২৭৫, ৩০৪
'বৃত্রসংহার'—১২
'বৌঠাকুরাণীর হাট'—১৯-২০, ১০১, ১৫৩
ব্রাউনিং (Browning)—৮৮, ১০৬, ১৩৮, ২২৫
ব্রাড্‌লে (Bradley)—২৬৬
ব্লেক (Blake)—১৩৮

ভ

'ভগ্নহৃদয়'—১০-১২, ২৫৩
ভবানী ভট্টাচার্য—১৫৪
'ভারতী'—৭, ১৪, ১৫, ১৯, ২২, ৪২, ৪৩, ৯০, ১১৫
ভারতচন্দ্র—১০৭, ১৪৪, ১৪৫
'ভারতবর্ষ'—১৩১
'ভিক্টোরিয়া যুগে বাংলা সাহিত্য'—৯৯
'ভুলভাঙা'—৪২
ভোলানাথ সেনগুপ্ত—১৬৩
'ভ্রষ্টলগ্ন'—৫০

ম

মধুসূদন দত্ত (মাইকেল)—১৯, ২৮, ২৫৪
'মহুয়া'—২১৯-২২১
'মানস-সুন্দরী'—২৩৪
'মানসী'—২৮-২৯, ৩২-৩৩, ৪২, ৫৭, ৮৯, ২৬৮
'মানসী ও মর্মবাণী'—১৪৪
'মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ'—২৪৮
'মালঞ্চ'—২২৫-২২৭
'মিঠেকড়া'—২৪-২৬
মিল্‌টন (Milton)—৭
'মেঘদূত'—১১৯
মোহিতচন্দ্র সেন—৫২-৫৪, ৩০৭
মোহিতলাল মজুমদার—১৯১-১৯৫, ২৫১, ২৬৪-২৬৯, ২৭০, ৩০৩-৩০৪, ৩০৭
'ম্যান্ এণ্ড সুপারম্যান্'—২২৫

য

যতীন্দ্রমোহন সিংহ—১৩৫
যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১১৬
যদুনাথ সরকার—৬৫
'যাত্রীর ডায়ারি'—১৫৬
'যুগলাঙ্গুরীয়'—৯৯
'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'—১৩-১৫, ১৬, ২৭৩
'যোগাযোগ'—১৬৭-১৬৮, ২৭৩
'যৌবনমূর্তি রবীন্দ্রনাথ'—১৯১

'সাহিত্যের ধর্ম'—১৫৫
'সাহিত্যের পথে'—২৯৯
'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা'—১৩৫
সুকুমার সেন—২৫, ২৮৯-২৯২
সুখরঞ্জন রায়—১০০, ১০২
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—১৮৩, ২০৪-২১৪
২৮২, ২৮৫
'সুরমা'—১৪০, ১৪২
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—১৭৪, ২১৪-২২১
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—১৩৩
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—৭৩, ৮১
'সোনার তরী'—৩৪, ৩৭, ৩৮, ৬২-৬৬,
৮৯, ১৫৯, ১৮৫-১৮৬, ২২২-২২৪,
২৩৪, ২৯৬
'সোমপ্রকাশ'—২৭
সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—২ (পা-টী)
স্টাইল (Style)—১০৩-৪
স্টার থিয়েটার—১০৭
'স্বদেশ'—১৮১
'স্বদেশী-সমাজ'—১৮১

হ

হরপ্রসাদ মিত্র—২৪৫
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—১৩, ১৪
হরিশচন্দ্র মিত্র—৭
হারাণচন্দ্র রক্ষিত—৯৯
হাস্যরস—২১২-২১৩
'হিতবাদী'—৪৬
'হিন্দু পেট্রিয়ট্'—১৬
'হিন্দুমেলার উপহার'—৪
হুইট্‌ম্যান (Whitman)—১৩৮
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৭, ১২, ১৩,
২৮, ১৪৪, ২৫৪
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৩ (পা-টী)
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—৩৮, ৮৪